নির্বাচিত ভৌতিক গল্প

পরিবেশক

দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

নির্বাচিত ভৌতিক গল্প

প্রকাশ : ১৩৭১

প্রকাশক :
সমীরণ চৌধুরী
কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন (প্রাঃ) লিমিটেড
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

বর্ণসংস্থাপন :
ইউনিভার্শাল ট্রেডিং কর্পোরেশন
৪/১এ, যদু মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
মদন সরকার
অলংকরণ :
বিশু ঘোষ

'কলেজস্ট্রীট' পত্রিকার কোনও এক শারদ সংখ্যা অলৌকিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সংখ্যাটির আজও অনেকে খোঁজ করেন। সেই সংকলনের কিছু ভৌতিক গল্প এবং বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত আরও কিছু গল্প নিয়ে এই 'নির্বাচিত ভৌতিক গল্প' সংকলন।

প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানের যুগে অবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে মাতামাতি কেন?

উত্তরটা এই সংকলনেই স্থান পাওয়া প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্পের মুখবন্ধ থেকে তুলে ধরছি—

"বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। .... ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত—সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপটিক বা অ্যাগনস্টিক কারুরই অভাব নেই।

সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই। ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হটতে হয় একেবারে প্যালিয়োলিথিক আদিম যুগে। অশরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের সঙ্গে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।

তবু সবকিছু বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব তর্কের মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। এমন কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—যাদের উত্তর মেলে না। তার মানে এই নয় যে কোনদিন তাদের উত্তর একেবারেই পাওয়া যাবে না। হয়তো বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি একদা সবকিছুর নিঃশেষ সমাধান করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে।"

আর যুগ যুগ ধরে শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই সব ভৌতিক গল্পগুলি সাহিত্যিক ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। মনে হয় ভূত-থাকবে না কিন্তু ভবিষ্যতে ভৌতিক গল্প থাকবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিষয় নিয়ে চর্চা আগের মত এখনও সমানভাবে চলছে।

আর সাহিত্য প্রেমিকদের কাছে সেই রস ভান্ডারের কিঞ্চিত তুলে ধরতে পারলেই আমরা সার্থক।

আমাদের আশা পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হব। ❑

সূচীপত্র



অকুতোভয়তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ফরাসী দেশে দেশুলিয়ে নামে এক সদ্বংশ-সম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন, এবং সর্বপ্রকার লোকের নিকট বিলক্ষণ আদরণীয় হয়েন।

একদা তিনি লুসিবেলের কৌন্ট ও কৌন্টেসের (১) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের বাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, কৌন্ট ও কৌন্টেস তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্যা করিয়া কহিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন। কিন্তু একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কহিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না ; ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি এরূপ নহে ; এই বাটীতে যত লোক আছে দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্বদাই বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ সাহস করিয়া রজনীতে এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেশুলিয়র কহিলেন, অদ্য আমি এই গৃহেই রজনী যাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ বিরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয় পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কৌন্ট মহাশয় তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া

কহিলেন, আমরা কোন ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না ; প্রভূত কৌতূহল বশতঃ এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে ; কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবেক না, অধিক কি আপনকার প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব, আমি আপনকার এই অসমসাহসিক অধ্যবসায় কোন মতে অনুমোদন করিতে পারি না।

এই রূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশুলিয়র কোন ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কৌন্টেসও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প করে ও ভূতের উপদ্রব বর্ণনা করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কার জনিত ; দুর্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কারবশতঃ কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে কৌন্ট ও কৌন্টেস ভয় ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া যথোচিত বিনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না ; অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর দেশুলিয়র এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদ পরিহার পূর্বক পল্যাঙ্কে আরোহণ করিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন, পল্যাঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতি জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢ়রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে তদীয় আদেশানুরূপ কার্য সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলে পর তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদঘাটিত ও পদসঞ্চারধ্বনি আরব্ধ হইল। শ্রবণমাত্র দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া ভয় পাইয়া থাকে সে এই। পরে তিনি অবিচলিত চিত্তে ও অসঙ্কুচিত স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি যে হও না কেন আমি তোমায় স্পষ্ট কহিতেছি, কিছুতেই আমি ভয় পাইব না ; বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে আজ তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোন কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না ; যদি আমায় ভয় দেখাইয়া তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয় তুমি কদাচ কৃতকার্য হইতে পারিবে না ; আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, আমি শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় ঐ রূপ কহিলেন, তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পল্যাঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্য-ধ্বংস হয় তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু দেশুলিয়র-এর মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই সন্দেহ হইল, বাটীর কোন ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে কি জন্যে এখানে আসিয়াছ বল ; তুমি

কখনই এরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। উহা কোনও উত্তর দিল না ; প্রশান্ত ভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা জ্বলন্ত বাতীর নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে, বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

অবশেষে সেই রাত্রিচর পল্যাঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ এখনই আমি অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারিব ; এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক পল্যাঙ্কের পাদদেশে হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি বলপূর্বক সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং যাবৎরাত্রিশেষ ও সূর্যোদয় না হয় ছাড়িবেন না স্থির করিলেন ; কিন্তু কাহার কর্ণ ধরিলেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এইভাবে অবস্থিত হইয়া তিনি রজনীর অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপ নির্ণয় হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণ ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের ঐরূপে পর্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ; অনন্তর সেই কুক্কুরের কর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে কৌন্ট ও কৌন্টেস শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনী যাপন কবিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষয়ের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তোরত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া দেশুলিয়রের প্রাণত্যাগ হইয়াছে অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্ন হইবামাত্র তাঁহারা শয়নাগর হইতে বহির্গত হইয়া বিষণ্ণ বদনে অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ করিয়াও কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া উভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া দেশুলিয়র মশারীর অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমনপূর্বক প্রাতঃকর্তব্য নমস্কার সম্ভাষণাদি করিয়া সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দন্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লহৃদয় দেখিয়া তাঁহাদের কলেবরে প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিনি অবিকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের হৃদকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে দেশুলিয়র কৌন্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ বিষয়ে আপনার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে সেই ভ্রম ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ; আর আপনার অলীক অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ঐ দেখুন সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক তিনি ঐ কুক্কুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রি বৃত্তান্তের শেষ ভাগের বর্ণনা করিলেন।

সবিশেষে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর দেশুলিয়র পুনরায় কৌন্টকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাবাদৃশ্য ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে, দেখুন এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল ; গত রাত্রিতে আমার কি বিপদ ঘটে এই দুর্ভাবনায় আপনারা কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণের নির্ণয় করিতে না পারে উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন অথচ, কুক্কুরে কিরূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত দ্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, উহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কিছু বলপূর্বক ধাক্কা মারিলেই কপাট খুলিয়া যায়।

এইরূপে গৃহপ্রবেশ অনায়াসসাধ্য হওয়াতে কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া পল্যাঙ্কে আরোহণপূর্বক তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিও পল্যাঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল, বোধহয় দেশুলিয়ার বলপূর্বক কর্ণ ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কৌন্ট ও কৌন্টেস এইরূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষজাতির মধ্যেও সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ❑





ভূতের বাড়ী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ টম্ সাহেব ॥

টম্ সাহেব বলিতেছেন,—

সম্প্রতি একজন পুরাতন বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখ টম্, এ লন্ডন নগরে একখানি ভূতের বাড়ী আছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"বটে! সত্য বলিতেছ না তামাসা করিতেছ? তুমি পণ্ডিত লোক, ভূতে তোমার বিশ্বাস নাই।"

আমার বন্ধু বলিলেন,—"না ভাই, না, তামাসা নয়। সেই বাটী আমি ভাড়া লইয়াছিলাম। তিন দিনের অধিক তাহাতে বাস করিতে পারি নাই। বিশেষ কিছু যে ভয়ানক দেখিয়াছি তাহা নহে। তবে কিরূপ শব্দ হয়, মনের সর্বদাই কেমন একটা আতঙ্ক হয়। কিন্তু সেই বাটিতে একজন বৃদ্ধা বাস করে। কি করিয়া সে থাকে, তা জানি না। বৃদ্ধা বলিল, "কোন ভাড়াটিয়াই সে বাড়িতে দুই দিনের অধিক বাস করিতে পারে না।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভূতের বাড়ী। এত দিনের পর বুঝি আমার সাধ মিটিল। ভূত কিরূপ, দেখিতে চিরকাল আমার মনে একান্ত বাসনা। সেই সাধ মিটাইবার জন্য আমি শ্মশানে-শ্মশানে, বনে-জঙ্গলে ঘোর নিশীথে কত ঘুরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভূত দেখা আমার কপালে কখনও ঘটে নাই। আজ কি ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন? দেখা, যাউক, কি হয়।

বন্ধুর নিকট সে বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলাম। বাটীর নিকট গিয়া দেখিলাম তালা বন্ধ। প্রতিবেশীগণের নিকট শুনিলাম যে, যে বাটিতে বৃদ্ধা বাস করিত, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রিকালে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই পর্যন্ত সে বাড়ী মনুষ্য দূরে থাকুক, কাক-পক্ষী কেহ প্রবেশ করে না, সে বাড়ীতে নেংটি ইঁদুর কি বড় ইঁদুর কোন ইঁদুর বাস করে না। আমার আরও কৌতূহল জন্মিল। প্রতিবেশিদিগের নিকট হইতে গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ধনবান লোক।

ভূতের বাড়ী ভাড়া লইব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—"বাড়ীর যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। আমি এতোদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছি। আমার খুড়ো মহাশয় ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। কবে হইতে বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয় তাহা আমি বলিতে পারি না। সপরিবারে নিজে আমি ঐ বাড়িতে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। দুই দিনের পর প্রাণ ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। আপনি যদি সে বাটীতে কিছুদিন বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাড়ার টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘর হইতে আপনাকে কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, আমি চাবি লইয়া আসিলাম। আমার একজন ডানপিটে বীরপুরুষ চাকর ছিল। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানা কিছুই সে মানিত না। মনে তাহার অপরিমিত সাহস, দেহে তাহার অসীম বল। তাহাকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন হে, তুমি আমার সহিত সে বাড়িতে রাত্রি যাপন করিবে?"

চাকর উত্তর করিল, "ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে? আমি ভূতের বাবা। দেখি কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়। ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। ভূত মানি আর নাই মানি, তবু যেন স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে প্রাণটা কেমন ছেঁক ছেঁক করে, গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। একজন সঙ্গী থাকিলে মনে অনেকটা সাহস হয়। চাকরের হাতে চাবি দিয়া আমি বলিলাম, "তুমি তবে সেই বাড়ীতে যাও ঘর-দ্বার পরিষ্কার রাখ, বিছানা ঠিক করিয়া রাখ। আমার পিস্তল ও ছোরা লইয়া যাও, তোমার নিজেরও পিস্তল ও ছোরা ছাড়িও না। সন্ধ্যাবেলা আমি সে স্থানে যাইব।"

সন্ধ্যার সময় আমি সে বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চাকর দ্বার খুলিয়া দিল। চাকরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হে, সব ভাল তো?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সব ভাল।" এই কথা বলিয়া চাকর আর একটু ঈষৎ হাসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিছু দেখিয়াছ, না কি?"

—সে উত্তর করিল—"আজ্ঞে না, কিছু দেখি নাই, তবে আমার কানের কাছে কে যেন ফুশ্ ফুশ্ করিয়া কথা কহিতেছিল। এরূপ শব্দ বার বার শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তোমার ভয় হইয়াছে নাকি?"

চাকর হাসিয়া বলিল,—"ভয়? আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতাপুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশমাত্র মনে উদয় হইবে না।"

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভূতের খেলা ॥

চাকরের সহিত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে আমার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি অতি বিক্রমশীল, ভীরুতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। আপনা অপেক্ষা দ্বিগুণ দেহবিশিষ্ট বড় বড় ডালকুত্তাকে তাড়া করিয়া তাহাদের ঘাড় ধরিত। কোনও একটি নূতন বাড়ীতে যাইলে প্রথমেই সে কোথায় ইঁদুর আছে, কোথায় আরসোলা আছে, তাহার জন্য গলি-খুঁজি এ কোণ সে কোণ শুনিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ সেই কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য হইলাম। প্রথমতঃ সে সেই বাড়ীর ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। অনেক আদর করিয়া ভুলাইয়া যদিবা প্রবেশ করাইলাম, কিন্তু ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। পদদ্বয়ের ভিতর লাঙ্গুল রাখিয়া কুন্ডলী হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা পায়ে পায়ে জড়াইতে লাগিল। লম্ফ-ঝম্প নাই, শব্দ নাই, ইঁদুর অনুসন্ধান নাই। আজ সে নীরব, আজ তার কিছুই নাই। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা এ ঘর সে ঘর বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকান্ড অট্টালিকা, একতলা, দোতলা, তেতালায় কত যে কামরা, তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরেরর ভিতর ভূতের দৌরাত্ম যাহাকে বলে, তাহার প্রথম সূচনা হইল।

ঘরটি আমার চাকর পরিষ্কার করে নাই। মেঝেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল। কোথাও কিছু নাই হঠাৎ দেখিলাম আমার ঠিক সম্মুখে একটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে কি আশেপাশে আর দাগ নাই, কেবল সেই একটি মাত্র দাগ। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর আমার নিজের পা রাখিলাম। অমনি, ঠিক সেই সময়ে আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি চাকরের গা টিপিলাম, চাকরও আমার গা টিপিল। এইরূপে যতই যাই, আগে আগে ধূলার উপর ততই এক একটি শিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল এক পায়ের চিহ্ন, দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর দাগ পড়িল না।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। সহসা ঘরের অন্য দিক হইতে একখানি চৌকি আকাশপথে উড়িয়া ঠিক আমার সম্মুখে পড়িল। আমি বলিলাম,—"বাঃ! মন্দ কথা নয়!"

ক্রমে দেখিলাম সেই চৌকির উপর যেন কি বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। কুকুরটি ভয়বিহ্বল হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ করিতে লাগিল। চাকর তাহাকে শান্ত করিতে গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া কুকুরকে সান্ত্বনা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি আমার পিঠে কিল মারিলেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না, কি হইয়াছে?"

চাকর বলিল,—"আমার পিঠে কে ভয়ানক একটা কিল মারিল।"

আমি বলিলাম,—"এ সব কাণ্ড কারখানা বোধ হয় বদমায়েশ লোকের। কি করিয়া করিতেছে, ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হইক, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

এক্ষণে এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়নঘর এই তলায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তলায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া চাকর বলিল,— "এ কি হইল? এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এইমাত্র ইহার চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।" আমি দ্বার টানিয়া দেখিলাম, ভিতর হইতে কে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে, আশ্চর্য! দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা দুইজনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। একপ্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘর ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। একপ্রকার ভৌতিক ত্রাসে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সে আশঙ্কা যে কি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। নরজীবনের প্রতিকূল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ, সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সে ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথম দুই জনে দ্বার টানাটানি করিয়া দেখিলাম। কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার চাকর বলিল, অতি পাতলা তক্তা দিয়া কপাট জোড়াটি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙ্গিয়া ফেলি। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে! দুই লাথিতে নয়, হাজার লাথিতেও সে কপাট ভাঙ্গিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সেই ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খলখল করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সে ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া কেমন একটা নীলবর্ণের আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো, কোথায় যাইতেছে দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের সঙ্গে আগে আগে আলোটি তেতালায় উঠিতে লাগিল। তেতালার উপরে উঠিয়া সামান্য একটা শয়নাগারে প্রবেশ করিল। যে বৃদ্ধা এই বাড়ীতে একাকী বাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর একটি দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম তাহার ভিতর একখানি রেশমের রুমাল রহিয়াছে। রুমালের একধারে দুইখানি চিঠি বাঁধা রহিয়াছে। চিঠি দুইখানি লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার পাশে পাশে যেন আর কে নামিতেছে। কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতেছিলাম না। সহসা খপ্ করিয়া কে আমার হাত ধরিল। আমার হাত হইতে চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কে যেন বারবার চেষ্টা করিল। দৃঢ় মুষ্টি বন্ধ করিয়া আমি তাহার চেষ্টা বিফল করিলাম।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘোর বিভীষিকা ॥

আমার নিজের শয়নাগারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে ঘড়ি, পিস্তল ও ছোরা মেঝের উপর
লাম। নিকটস্থ ছোট একটি ঘরে চাকরকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা রহিল।
র ঘোরতর ভয়ে ভীত হইয়া ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে ত্রাসজনিত
ট রোদনের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম, এক্ষণে
পড়িতে লাগিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন এক পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে
য়াছিল। কিন্তু নামধাম কাহারও ছিল না। ভালবাসার কথা ছাড়া, তাহাতে কোন একটা
ষিকার আভাসও ছিল। যেন কে কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি
করিয়া আমি চৌকির উপর রাখিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীত প্রধান
। অগ্নিস্থানে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। মোট কথা, ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে
াকিত ছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্যপথে চলিয়া যাইতে লাগিল।
হাতে ছোরা অপর হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘড়ি ধরিতে দৌড়িলাম কিন্তু
ং' করিয়া ঘড়ি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

পুনরায় আমি চৌকিতে বসিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘরের ভিতর
গে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। কুকুরটি ভয়ানক কাতর রবে ঘর পরিপূরিত করিল। আমি
াকে থামাইতে যাইলাম। যে কুকুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, আজ সেই কুকুর
াকে কামড়াইতে আসিল। দংশনভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত দিতে সাহস করিলাম না।
চাকর এমন সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর
ত বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, মাথার চুলগুলি সব খাড়া
া উঠিয়াছে, মুখে শীল মাড়িয়া দিয়াছে। "মহাশয় পলায়ন করুন, মহাশয় পলায়ন করুন।
স্থলে আর তিলার্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপ রে, ধরিল রে, মা রে!" এইরূপ
ার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া লাফে লাফে সিঁড়ি
নামিতে লাগিল। তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু ধরিতে
রিতে সে সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশানসদৃশ অট্টালিকার
র আমি এখন একা পড়িলাম।

এখন প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমিও পলায়ন করি।
বন্ধুবান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রূপ করিবে! যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায়
া উপরে উঠিলাম, পুনরায় আমি নিজের শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম। পুনরায় আমি পড়িতে
লাম। আমার হাতে পুস্তক,—সম্মুখে বাতি। পুস্তক ও বাতির মধ্যবর্তী স্থানে, আমার কোলে
গাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই
কে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্বশরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তল লইবার নিমিত্ত
া হাত বাড়াইলাম। হাত অসাড় ও অবশ! হাত উঠিল না। আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম।
অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল
জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম, যদি এখন ভয় করি তা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব। এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য ধরি রহিলাম, বাতি নিভিল না, অগ্নিস্থানে অগ্নি নির্বাণ হইল না, তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হই গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হোক ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকি মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া এক জানালা খুলিয়া দিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সে আলোকে দেখিলাম যে, তালবৃক্ষপ্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে না কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত হরিত, লোহিত—নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াই বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেরূপ হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচ হইতে ঠিক জীবন্ত মানুষের রক্তমাংসে হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে যাইলাম। খপ্ করিয়া চিঠি দুইখানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর একখানি চৌকির উপর একটি যুবতী বসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলাম তাহার পর একজন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। বালকের মূর্তি, বৃদ্ধার মূর্তি, নানাপ্রকা আকার ঘরের ভিতর আবির্ভাব হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। তাহ ব্যতীত আরও যে কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, সে সকল বর্ণনা করিবার আর স্থা নাই।

মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে ঘাড়ে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয় আমি বার বার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া বাঁচিলাম, তাহাই আশ্চর্য কথা।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ শেষ কথা ॥

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা টম্ সাহেবের বিবরণ। প্রভাত হইলে এই সমুদয় উপদ্র থামিল। টম সাহেব তখন এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সে বাটী হইতে কি করিয়া পলাইবেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোনরূপে উঠিয়া কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুর তাহার নিকটে আসিল না। কাছে গিয়া দেখিলেন যে, কুকুরটির গলদেশ ভগ হইয়া গিয়াছে। কুকুর মরিয়া গিয়াছে।

টম্ সাহেবের চাকর সেই অবধি বায়ুগ্রস্ত হইল। ইংলন্ড পরিত্যাগ করিয়া সে অস্ট্রেলিয় দ্বীপে পলায়ন করিল।

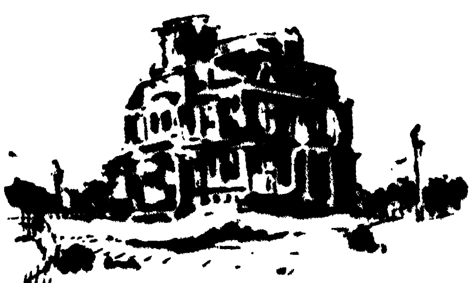
বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া টম্ সাহেব চাবি ফিরাইয়া দিলেন, আর বলিলেন,—"ভূ দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। যথেষ্ট হইয়াছে, সাধ বিলক্ষণ মিটিয়াছে।"

বাড়ীওয়ালা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"মহাশয়, আপনার মত সাহসী পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। আপনার যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাই পরম লাভ।"

তারপর চিঠি দুইখানির কথা শুনিয়া তিনি আরও বলিলেন, "এতদিন ঐ বাড়ীতে যে বৃদ্ধা বাস করিতেছিল, পত্র দুইখানি বোধ হয় তাহার স্বামীর। আমার খুড়া মহাশয়ের জীবনকালে সে ব্যক্তি একবার ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল। বৃদ্ধার স্বামী অতিশয় পাষণ্ড ছিল। বৃদ্ধার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকার লোভে সে বধ করিয়াছে। দিনকতক এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধা ব্যতীত সে বাটীতে এ পর্যন্ত আর কেহ বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মৃত্যুও সেদিন অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিয়া থাকে। সেই অবধি এমন লোক পাই নাই যে, সাহস করিয়া কেহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীটি দেখিতেছি আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।"

টম্ সাহেব উত্তর করিলেন,—"বাড়ীটি আগাগোড়া না ভাঙ্গিয়া একটি কর্ম করিলে হয়। যে ঘরে আমরা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে ঘরে বিকট গন্ধ বাহির হইয়াছিল, কেবল সেই ঘরটি ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয়।"

বাড়ীওয়ালা তাহাই করিলেন। সেই ঘরের মাটির নিচ হইতে নানারূপ অদ্ভুত দ্রব্য বাহির হইল। তাহা কি, সে কথা বলিবার আর স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। বাড়ীওয়ালা সেই সমুদয় দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল। ❑





ভূতের গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমি ভূতের গল্প বড় ভালবাসি। তোমরা পাঁচ জনে মিলিয়া ভূতের গল্প কর, সেখানে পাঁচ ঘন্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা ; একটা শুনিলে আর-একটা শুনিতে ইচ্ছা করে, দুটো শুনিলে একটা কথা কহিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইয়া গেলে একাকী ঘরের বাহিরে যাইতে ইচ্ছে হয় না। তোমাদের মধ্যে আমার মতন কেহ আছে কি না জানি না, বোধ হয় আছে। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। তোমাদের সুবিধার জন্য ইংরেজি নামগুলি বদল করিয়া দিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে শুধু নাম বদলাইলে কাজ চলিবে না। সুতরাং ঠিক যেরূপ পড়িয়াছি প্রায় সেইরূপ অনুবাদ করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।

'স্কটল্যাণ্ডের ম্যাপ্‌টার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধারে ছোট-ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইস্ট, নীচেরটির নাম সাউথ্‌ উইস্ট্‌। এর মাঝামাঝি ছোট-ছোট আর কতগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এ সেকালের কথা, তখন স্টীম্‌ এঞ্জিনও ছিল না টেলিগ্রাফ্‌ও ছিল না ; আমার ঠাকুরদাদা তখন এর একটি দ্বীপে স্কুল মাস্টারি করিতেন।'

'সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজের মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চরান, আর কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে দিন চলার মত কিছু শস্য উৎপাদন করা। সেখানকার মাটি বড় খারাপ ; তারই একটু একটু সকলে ভাগ করিয়া নেয়। আর জমিদারকে খাজনা দেয়। ..... এরা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐরকম কষ্টে থাকিয়া এবং সামান্য খাইয়াও বেশ একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত।'

'এই দ্বীপে এল্যান্ ক্যামেরন নামে একজন লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ি গাঁ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাস্টারমহাশয়ের বড় ভাব, তাঁর কাছে তিনি কত রকমের মজার গল্প বলিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন, আর কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনার লোক ছিল না, সুতরাং তাঁহার বিষয়-সমস্ত বিক্রি হইয়া গেল। তাঁর বাড়িটা কেহ কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া রহিল।'

'এর কয়েক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড্ ম্যাকলীন বলিয়া একটি রাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানালার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতরে এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ত তার চক্ষু স্থির! সেখানে সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠির মত সোজা হইয়া উঠিল, ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।'

'শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐ রকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবার ইচ্ছা থাকে? সে ত মার দৌড়! একেবারে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে। তাঁহার কাছে সব কথা সে বলিল। মাস্টারমহাশয় এ-সব মানেন না , তিনি তাহাকে প্রথমে ঠাট্টা করিলেন ; তারপরে বলিলেন তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোল ঘটিয়াছে ; আরো অনেক কথা বলিলেন— বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত বোকার কার্য।'

'ডনাল্ড কিন্তু ইহাতে বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধি বিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটা বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ-সব বিষয় মীমাংসা করিতে বৃদ্ধরাই মজবুত ; তাঁহারা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।'

'ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাস্টারমহাশয়ের কাছেই খবরের কাগজ আসিত। মাসের মধ্যে একবার করিয়া কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাস্টারমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া নূতন খবর শুনিয়া আসিত। সেদিন তাহাদের পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘরে বড় আগুন করিয়া দশ-বার জন তাহার চারিদিকে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাগজের বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ করিয়া অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের তদারক ও তর্কবিতর্ক করিত। শেষের কথাগুলি সকলেরই একপ্রকার মুখস্থ হইয়াছিল, এবং পড়া শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রায়ই সকলে একসঙ্গে একবার বলিত।'

'এই সকল সভায় রাখাল, কৃষক, গির্জার ছোট পাদরি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামের মুচি ররীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক ; একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা করিয়া না ঘাঁটিয়া সহজে ছাড়িবে না।'

'ডনাল্ড ম্যাকলীনের ঐ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ্ পরে একদিন সকলে এইরূপ সভা করিয়া বসিয়াছে, মাস্টারমহাশয় চেঁচাইয়া তর্জমা করিতেছেন, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল যে, এল্যান্ ক্যামেরনের ছায়া আবার দেখা গিয়াছে। এবারে একজন স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। ঐ রাখাল যে স্থানে যে ভাবে উহাকে দেখিয়াছিল এও ঠিক সেইরকম দেখিয়াছে।'

'এরপর আর পড়া চলে কি করিয়া!' মাস্টারমহাশয় চটিয়া গেলেন এবং ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। ররী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না ; এবারেও মাস্টারমহাশয়ের কথাগুলি মানিতে পারিল না। প্রচন্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতের কথা লইয়া সাধারণভাবে এবং ক্যামেরনের ভূতের বিষয় বিশেষভাবে বিচার চলিতে লাগিল ; আর সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ররীর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল ; সে বলিল—'

'দেখ মাস্টারের পো, যতই কেন বল না, আমি এক জোড়া নতুন বুট হারব, তোমার সাধ্যি নেই আজ দুপুর-রেতে ওখান থেকে গিয়ে দেখে এস।'

'সকলে করতালি দিয়া উঠিল। মাস্টারমহাশয় হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু ররী ছাড়িবে কেন? সে সকলের উপর বিচারের ভার দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাস্টারমহাশয় যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, সে স্থলে তাঁহার উচিত যে নিদেনপক্ষে তিনি যে এ মানেন না তা প্রমাণ করিয়া দেন।'

'মাস্টারমহাশয় দেখিলেন, অস্বীকার করিলে যশের হানি হয়। তিনি বলিলেন, যাব বই কি? কিন্তু আমি গিয়ে ফিরে এলেও, এর চাইতে আর তোমাদের জ্ঞান বাড়বে না।'

ররী—'আচ্ছা দেখা যাউক।'

'মাস্টারমহাশয়—'ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি করব?'

ররী—'ওখানে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে—এল্যান্ ক্যামেরন আছ গো! কোন জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানবো না।'

মাস্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, 'এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান্ সেখানে থাকলে আমার কথার উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।'

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও তা হলে মুচির কাছে যে ও টাকা পেত, সে কথাটা তুল না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলিল, ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

'এইরূপে হাসি-তামাশা চলিতে লাগিল ; ক্রমে মাস্টারমহাশয়ের যাওয়ার সময় হইয়া আসিল।'

'শেষে মুচি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—'বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। তুমি এখন গেলে ভাল হয় ; তাহলেই ঠিক ভূতের সময়টাতে পৌঁছতে পারবে।'

'বেশ করিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইয়া, মাস্টারমহাশয় যষ্টি হস্তে সেই বাড়ির দিকে চলিলেন। মাস্টারের যাইবার সময়ে সকলেই দু-একটি খোঁচা দিয়া দিল, এবং স্থির করিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।'

'রাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালো কালো মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মাস্টার চলিয়া গেলে বলিতে আরম্ভ করিল যে, সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদরি বলিল যে, তিনি হয়ত অর্ধেক পথ

গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আর কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয় হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয়, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব করিল যে, ররী যাইয়া দেখিয়া আসুক।'

'প্রথমে ররী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহার বক্তৃতার পর রাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিল যেন মাস্টার তাহাকে দেখিতে না পায়, তারপর সে বাহির হইল। খুব চলিতে পারিত, এই গুণে শীঘ্রই সে মাস্টারকে দেখিতে পাইল। ররী একটু দূরে দূরে থাকিতে লাগিল—রাস্তাটা একটা জলা জায়গার মধ্য দিয়া ; একটি গাছপালা নাই যে মাস্টার ফিরিয়া চাহিলে তাহার আড়ালে থাকিয়া বাঁচিবে।'

'পরে মাস্টারমহাশয় যখন ঐ বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে আসিল। সেখানে একটা নিচু বেড়া ছিল, তাহার আড়ালে শুইয়া পড়িল।'

'সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহার অন্তরটা গুর গুর করিতে লাগিল। মাস্টার মহাশয় ছিলেন বলিয়া, নইলে সে এতক্ষণ চেঁচাইয়া ফেলিত। কষ্টেসৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে করিয়া দেখিতেছে কি হয়। মনে করিয়াছে মাস্টারমহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা হইয়া গেলেই সে বাহির হইবে।'

'গ্রামের গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র দিয়া চাহিয়া দেখিল যে মাস্টারমহাশয় নির্ভয়ে দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

'মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার করিলেন এবং একটু শুষ্ক স্বরে বলিলেন—

'এল্যান্ ক্যামেরন আছ গো।'—কোন উত্তর নাই।

'দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন, 'এল্যান্ ক্যামেরন আছ গো!'—কোন উত্তর নাই।

'তারপর বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্ধচিৎকার অর্ধ আহ্বানের মত করিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, 'এল্যান—ক্যামেরন আছ—।' তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা নাই।—সটান চম্পট।'

'কি সর্বনাশ! কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার যে এ কি করিয়া ফেলিলেন। ররী বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই। তবে বুঝি ভূত এল। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তার মনে যে ভয় হইয়াছিল, তারই উপযুক্ত ভয়ানক গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারমহাশয়ের পেছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকার শব্দ মাস্টারমহাশয়ের কানে গেল। মুচি দৌড়িতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াও গো মাস্টারমশাই। দাঁড়াও।' মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার শব্দও শুনিতে পাইলেন। আর কি? ঐ এল্যান ক্যামেরন! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়িতে লাগিলেন। ররী বেচারা দেখিল বড় বিপদ! ফেলিয়াই বুঝি গেল। কি করে তারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমহাশয় দেখিলেন পাছেরটা আসিয়া ধরিয়াই ফেলিল। তাঁহার গায়ের বল চলিয়া যাইতে লাগিল।

'অবশেষে মাস্টারমহাশয় যখন দেখিলেন যে আর রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন, এবং খুব শক্ত করে লাঠি ধরিয়া সেই কল্পিত ভূতের দিকে ফিরিলেন এবং আর

মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া যত জোর ছিল একবার সেই কল্পিত ভূতের মস্তকে 'সপাট'—সাংঘাতিক এক ঘা! তারপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।'

'ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামের আলোক না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিয়া ঠান্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘরে গেলেন—যেন বিশেষ একটা কিছু হয় নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি সকলগুলিরই উত্তরে বলিলেন—'

'ঐ আমি যা বলেছিলাম ; ভূতটূত কিছুই ত দেখতে পেলাম না!'

'এরপর মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টারকে তাহারা বলিল যে, সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।'

'আধ ঘন্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল! তারপর আর থাকিতে পারিল না, মুচির অনুপস্থিতির কারণ তাহারা মাস্টারমহাশয়কে বলিয়া ফেলিল। মাস্টারমহাশয় শুনিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। লাফাইয়া উঠিয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন।'

'সকলেরই বিশ্বাস হইল মাস্টারমহাশয়ের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। হৈ চৈ কান্ড! সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহারা মাস্টারকে দাঁড়াইতে বলিতে লাগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। কুকুরেব গোলমালে গাঁয়ের লোক জাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারখানা কি?'

'এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলার মধ্য দিয়ে দৌড়িতেছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে—কেবল পুলিস—ম্যাজিস্ট্রেট—জুরী—ইত্যাদি ভয়ানক বিষয় মনে হইতেছে। তাঁহার লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে।'

'সকলে তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয়ের উত্তর দিবার পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং কোঁকানি মিশ্রিত একপ্রকার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। কতকদূর গিয়া দেখা গেল একটা লোক জলার ধারে বসিয়া আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি। সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টারের উদ্দেশে গালাগালি দিতেছে। তাহার নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।'

* * * * * * *

'শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চন্দ্রের আলোকে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছায়ার আকৃতি দেখিতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত . সেদিন চন্দ্র ছিল না বলিয়াই মাস্টারমহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।' ❑



নিশীথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল।

কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল ; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলোর সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের ধনের মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভান করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না, এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ : সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল ; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল, এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপ একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্ ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল-না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, "যতদিন এই দেহে জীবন আছে—"

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিল। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না ; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের

মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন ; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত ; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম— মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ছলছল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো, কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি এমন কথা বলিবেন না।"

কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে এক গ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টি বদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে।"—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে। ও কে গো।"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, "আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন : আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কে।"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ঃ বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন।"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হ্যাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা

বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন—বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন —

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল ; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত ; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন ; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল ; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল ; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম ; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-গহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার ;পর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর শ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা র্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারিব না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর ;পর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঠাৎ এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া ।কটা হাসি বহিয়া গেল?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, াহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?"

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে ;ত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস াখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া হিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া ;ঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস ইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহু দূর চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন

আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপি ধরিল ; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্য করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষবে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয় অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয় আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপর একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্না রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুজনে দাঁড়াইলাম—মনোরম কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয় উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনে বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠা এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম ; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজ আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে গো।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয় গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয় দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয় গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে ; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয় গেল ; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল ; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই ; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে, পারিতেছে না। অবশেষে যখ একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, '

আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিল তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার। ডাক্তার।" ❑





উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১

সিপাহী-বিদ্রোহ তখন শেষ হইয়াছে। ইংরেজের প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিদ্রোহিগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের ক্রোধবহ্নি তখনও নির্বাপিত হয় নাই। অস্ত্রধারী সিপাহী দেখিলেই ইংরেজ সৈনিকগণ তাহাদিগকে ধরিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেছে, কিংবা গাছে লটকাইয়া সঙ্গীনের আঘাতে উদর-বিদারণ-পূর্বক-নিদারুণ প্রতিশোধ-পিপাসা প্রশমিত করিতেছে।

সিপাহী-বিদ্রোহের বিভীষিকা তখনও দূর হয় নাই। এক একদিন এক-একটা নতুন হুজুগ উঠিয়া রণশ্রান্ত ইংরেজ সৈনিকগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতে লাগিল। এই সকল হুজুগ হয়ত সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু একদিনের হুজুগে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। একদিন সকালে জনরব উঠিল,—ছত্রভঙ্গ সিপাহীরা আবার জোট বাঁধিতেছে, টুপিওয়ালার গোঁফে আগুন লাগাইয়া দিবে, বেরেলী বিদ্রোহী সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এই জনরব প্রচারের পর একদিন বেরেলীর ইংরেজ-দুর্গ হইতে আধ ডজন বন্দুক চুরি গেল। সকলে বুঝিল, ইহা নিরস্ত্র সিপাহীদিগেরই কাজ।

চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতির আদেশে বেরেলী দুর্গ হইতে দলে দলে অশ্বারোহী সৈন্য বন্দুকচোর সিপাহীদিগের সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু চোর ধরা পড়িল না, তথাপি নির্দোষ ব্যক্তিগণ চৌর্যাভিযোগে দণ্ডিত হইতে লাগিল। যিনি ফারয়াদী, তিনিই বিচারক, সাক্ষী ইংরেজসৈন্য ; অপরাধ সপ্রমাণ ও অপরাধীর প্রতি দণ্ডদান উভয়ই সমান উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতে চুরির হ্রাস হইল না। বন্দুকচুরির সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাহা চতুর্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িল, ইংরেজের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। শেষে সেনাপতিগণ মন্ত্রণা করিয়া এক মিলিটারী কমিশন বসাইলেন। তাহার সভ্যসংখ্যা দশজন। কমিশনের সভাপতির প্রতি অপরাধিগণের সরাসরি বিচার করিয়া দন্ডদানের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। এই সভাপতি মহাশয়ের নাম কাপ্তেন থরনটন্।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যভাগে একদিন অপরাহ্নে কাপ্তেন থরনটন্ অশ্বারোহণে বায়ুসেবনার্থে সেনানিবাস হইতে বহির্গত হইবেন, এমন সময় একজন এডজুটান্ট একখানি আদেশপত্র তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য লইয়া আসিল। মিঃ থরনটন্ অশ্বগতি সংযত করিয়া তাঁহার সহকারী এডজুটান্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

"আবদুল গফুর নামক একজন মুসলমান সিপাহীর কোতলের পরওয়ানা। একজন সারজেন্ট তাহাকে পাহাড়ের উপর গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

"আসামীর জবাব কি?"

"কোম্পানীর সৈন্য দেখিয়া সে তাহার হাতের বন্দুক তাড়াতাড়ি পাহাড়ের এক গুহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আসামী বলে, সে তাহার ভাই আবদুল আব্বাসের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে, তাহার কোন কু-মতলব নাই। আবদুল আব্বাস পাঞ্জাবে সওদাগরী করে, আজ কয়েকদিন এদেশে আসিয়াছে। আসামী আবদুল গফুরের এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। সে সরকারের বন্দুক চুরি করিয়া বিদ্রোহীদিগের সাহায্যের জন্য যাইতেছিল। তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।"—এই বলিয়া এডজুটান্ট নীরব হইল।

"ঠিক কথা। বদমায়েসকে গুলি করিয়া পশুর মত হত্যা কর।" কাপ্তেন অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই অকম্পিতহস্তে হত্যার আদেশ লিপিবদ্ধ করিলেন।

অবিলম্বে এই আদেশ নির্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইল।

যাহাদিগের চক্ষুর উপর এই হত্যা ব্যাপার সংসাধিত হইল, তাহাদের মধ্যে আবদুল গফুরের ভ্রাতা আবদুল আব্বাস একজন দর্শক ছিল। নীরবে সে তাহার ভ্রাতার শোচনীয় হত্যা সন্দর্শন করিল। তাহার শোকসন্তাপবিদ্ধ, হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে সবলে বিদলিত করিতে লাগিল, তাহার অশ্রুহীন চক্ষে প্রতিহিংসার অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

আবদুল আব্বাস তাহার ভ্রাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বিধবা ভ্রাতৃবধূ ধরাতলে পড়িয়া অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেছে, শিশুপুত্র দুইটি তাহাদের মায়ের কোলের

কাছে পড়িয়া মাটিতে লুটাইতেছে। আবদুল দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দানের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। গৃহে একটি পিস্তল ঝুলিতেছিল—পিস্তলটি কিছু পুরাতন ও মরিচা ধরা। সেই পিস্তলে কাপ্তেনের প্রাণবধের জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ঠিক এই সময়ে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আবদুল গফুরের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী প্রাচীন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাব দেহে যুবজনোচিত সামর্থ্য বর্তমান। সন্ন্যাসীর নাম কি, তাহা কেহ জানিত না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। মুসলমানেরা তাঁহাকে ফকির বলিয়া ডাকিত, হিন্দুরা বলিত—স্বামীজী। কোম্পানীর নফরেরা তাঁহাকে কোন বিদ্রোহপরায়ণ ক্ষত্রিয়রাজার 'পলিটিক্যাল স্পাই' মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিযাছিল। কিন্তু কোন বিষয়েই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সংসারের সুখদুঃখ ও জাতিভেদের গণ্ডীর অনেক ঊর্ধ্বে তিনি বিচরণ করিতেন।

সন্ন্যাসী একবাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভূম্যবলুণ্ঠিতা বিধবা ও তাহাব রুদ্যমান সন্তানদ্বয়ের দিকে চাহিলেন। তাহার পর আবদুল আব্বাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, প্রতি-হিংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছ?"

আবদুল আব্বাস অবিচলিতভাবে বলিল, "যাহারা আমার নিরপরাধ ভ্রাতাকে অবিচারে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের স্বহস্তে বধ করিয়া ভ্রাতৃশোক নিবারণ করিব। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার।" সে অবিচলিত উৎসাহের সহিত বন্দুক ঘষিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস শান্ত হও। অত্যাচাবের দণ্ডবিধানের কর্তা স্বয়ং ভগবান, তোমরা যাহাকে খোদা বল, তিনিই। প্রতিদিন প্রচুর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তুমি আর সে স্রোতের বৃদ্ধি করিও না। পরমেশ্বর তাঁহার কাজ করিবেন, অনুতাপে পাপীর হৃদয় দগ্ধ হইবে। রক্তপাত করিয়া আর তুমি তাহার অপেক্ষা কি অধিক দণ্ড বিধান করিবে।"

আবদুল আব্বাস দৃঢ়হস্তে বন্দুক চাপিয়া ধরিয়া সন্ন্যাসীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি সংস্থাপন পূর্বক বলিল, "ফকির সাহেব, আপনি হিন্দু তাই হিন্দুর মতো পরামর্শ দিয়াছেন। কাফেরের প্রাণবধেই মুসলমানের পরম পুণ্য, তাহাই মুসলমানের পরম ধর্ম। আমি সেই ধর্ম পালন করিব, আপনি বাধা দিবেন না।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আব্বাস মিঞা, তোমাব এই ক্রোধের জন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের উপর এক ধর্ম আছে তাহা পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমি এই হিন্দু সন্ন্যাসীর অনুরোধ রক্ষা করিলে কখনো কর্তব্যচ্যুত হইবে না। আমি কাহাকেও কখনো অন্যায় অনুরোধ করি নাই।"

আব্বাস মিঞা বন্দুক হাতে করিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আমরা সকলে আপনাকে পীরের ন্যায় মান্য করি, কখনো আপনার অবাধ্য হই নাই, আজও হইব না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ হস্ত শত্রু-শোণিতপাতে বিরত হইবে। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে। কতদিনে এ অন্যায় অত্যাচারের প্রতিফল প্রদত্ত হইবে?"

সন্ন্যাসী একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। সেই স্তব্ধ সান্ধ্য আকাশে নবোদিত তারকার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা

করিলেন। তাহার পর দূরবর্তী বনভূমির দিকে চাহিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিলেন, "এক বৎসরের মধ্যে।"

বন্দুকটা যেখানে ঝুলানো ছিল, কক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্বক আবদুল আব্বাস সেখানেই ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাহিরে দেখিল, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়াছেন।

৩

রাত্রি আটটা। কাপ্তেন থরনটন্ তাঁহার শয়নগৃহের বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। তাঁহার মন আজ চিন্তাপূর্ণ। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইয়াছে, এই যে তিনি ক্ষমতাদর্পে স্তব্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত মনুষ্যবধের আদেশ প্রদান করিতেছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কতদূর সঙ্গত বা বৈধ হইতেছে, তাহা কি কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? কতকগুলি অসহায় দুর্বল মনুষ্যকে ধরিয়া তিনি তাহাদিগের বধের আদেশ দান করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের কতটুকু অপরাধ আছে, তাহারা সত্যই অপরাধী কিনা, তাহার কি কোনদিন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাহার দায়িত্ব বিস্মৃত হইবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তিনি তাঁহার এই ব্যবহারে বৃটিশ রাজমহিমাই যে কলঙ্কিত করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান ও মনুষ্যত্বকে পর্যন্ত অবজ্ঞাত করিতেছেন।—এ সকল চিন্তা আজ প্রথম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। তিনি মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছন্দতা, কিছু কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

একজন দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিক যুবা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে মিলিটারি প্রথায় কাপ্তেন সাহেবকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে গালামোহর করা নীলবর্ণের লেফাফা-মোড়া একখানা পত্র প্রদান করিল। কাপ্তেন থরনটন্ যদি সে সময় একবার তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাহার মুখ মলিন ভীতি বিস্ময়সমাকুল, তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জ্বলন্ত গোলা অগ্নিস্রোতের ন্যায় সবেগে ছুটিয়া আসিতে দেখিলেও তাহার মনের ভাব হয়ত এরূপ হইত না, আজ সহসা তাহার এ ভাব কেন?

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যপাতমাত্র না করিয়া মিঃ থরনটন্ লেফাফার গালা-মোহর ভাঙ্গিয়া পত্রখানি টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিলেন, নীলবর্ণের চিঠির কাগজ, ইংরাজীতে এই কয়টি কথা মাত্র লিখিত।

"১৮৫৮ সালের ১৭ই জুলাই আবদুল গফুর নিহত হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই কাপ্তেন থরনটন্‌কে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এক বৎসর মাত্র বিলম্ব।"

পত্রের নীচে একটা স্বাক্ষর, অতি অস্পষ্ট স্বাক্ষর। তাহা কাহার হস্তাক্ষর, কাপ্তেন সাহেব বহু চেষ্টাতেও তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

কাপ্তেন থরনটন্ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পত্রবাহী পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এই পত্র আনিয়াছে?"

"আবদুল গফুর, একজন মুসলমান সিপাহী।"—ভগ্নস্বরে পদাতিক এই উত্তর দিল।

"অসম্ভব। আবদুল গফুরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"হ্যাঁ খোদাবন্দ, যাহাদের গুলিতে আবদুল গফুরের প্রাণ বাহির হইয়াছে, আমি তাহাদের মধ্যে একজন। তাহার প্রাণদণ্ডের পর যখন তাহার মৃতদেহ পর্বতগুহায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আবদুল গফুর এই কেল্লার ভিতর আসিয়া স্বহস্তে আমাকে এই পত্র দিয়া গিয়াছে।"

কাপ্তেন থরন্টন্ কুসংস্কারান্ধ লোক ছিলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, পদাতিকের নিশ্চয়ই কোনরকম চক্ষের দোষ ঘটিয়াছে। তথাপি একটা অজ্ঞাত ভয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার হৃদয় বিকম্পিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত ও সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত ভাষায় লিখিত পত্রখানি প্রেতলোকের এক অপরিজ্ঞাত রহস্যময় ইঙ্গিতের ন্যায় তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তিনি ইংরেজ গবরমেন্টের একজন সাহসী কাপ্তেন, স্বহস্তে অনেক সিপাহী বধ করিয়াছেন এক সপ্তাহের মধ্যেই এই অপ্রীতিকর পত্রের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন।

কাপ্তেন থরন্টনের স্ত্রী বিবি থরন্টন্ তখন আগ্রায় ছিলেন। ১৬ই আগস্ট রাত্রে কাপ্তেন সাহেব বেরেলী হইতে স্ত্রীকে দেখিবার জন্য আগ্রায় আসিলেন। স্ত্রীর নিকট হইতে এক জরুরি পত্র পাইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ১৭ই আগস্ট প্রভাতে কাপ্তেন সাহেব দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সুখসুপ্তিমগ্ন ছিলেন। পূর্বদিনের পথশ্রমে তাঁহার শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া মশারির বাহিরে আসিতেই, বিবি থরন্টন্ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। পত্রখানি সেই পূর্বের পত্রের মতো নীল লেফাফায় আঁটা। পত্রখানি দেখিয়াই সহসা কাপ্তেনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। কম্পিতহস্তে মেমসাহেবের নিকট হইতে পত্র লইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, পত্রের ভাষা ও নামস্বাক্ষর পূর্বের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে এই পত্রে লেখা আছে, "পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর এগার মাস বিলম্ব।"

কাপ্তেন কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে?"

"সাতটার সময় বাংলোর বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম। একটা দীর্ঘদেহ মুসলমান সিপাহী পত্রখানা আমার হাতে দিয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।"

কে এই সিপাহী? সাহেব শয়নের বস্ত্র পরিবর্তন না করিয়াই কক্ষমধ্যে অধীরভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। বিবি থরন্টন্ সহসা স্বামীর এই প্রকার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার পত্র, কি সংবাদ?"

"কিছু নয়",—বলিয়া কাপ্তেন পত্রখানি শতখণ্ড ছিন্ন করিয়া বাতায়নপথে কক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। একখণ্ড উড়িয়া তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সাহেব সেই কাগজ-টুকরা হাতে করিয়া পুনর্বার বাহিরে ফেলিতে যাইবেন, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। লেখা আছে,—"এগারো মাস।"

কাপ্তেন সাহেবের হৃদয় চিন্তাভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। আজ তাঁহার মনে হইল নিশ্চয় কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনার সহিত এই পত্রের সংস্রব আছে। তিনি বেরেলী হইতে পূর্বরাত্রে হঠাৎ আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার বেরেলী ত্যাগের কথা তাঁহার দুই একটি বিশ্বস্ত বন্ধু ও উর্ধ্বতন কর্মচারী ভিন্ন অন্যের বিদিত ছিল না। তথাপি কে কিরূপে তাঁহার আগ্রা আগমনের সংবাদ পাইয়া এই পত্র পাঠাইল? ইহা কি কেবল মিথ্যা ভয়প্রদর্শন মাত্র? কোনক্রমে তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর হইল না। এক চিন্তার পর আব এক চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তাঁহার ক্ষুধা নিদ্রা দূর হইয়া গেল। হুইস্কির সাহায্যে তিনি এই চিন্তা, এই অজ্ঞাত ভয় নিবারণের চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বৃথা হইল, ঘোর অস্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর কোনো রাজকার্যোপলক্ষে তাঁহাকে দিল্লী যাইতে হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর বাত্রি নয় ঘটিকার সময় দিল্লীর ইংরেজ সেনাপতির গৃহে এক প্রকাণ্ড "ডিনারের" আয়োজন হইযাছে। কাপ্তেন কার্নেল লেফটেনান্ট মেজর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটবড় সকল 'মিলিটারি জিনিয়াস' টেবিল পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। মিলিটাবি কুললক্ষ্মীগণ দেশের টেলসেপ অন্ধকার করিয়া সুপক্ষ প্রজাপতিবৃন্দের ন্যায় যোদ্ধৃবর্গের পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক— "None but the brave deserves the fair"— সুকবি ড্রাইডেনের এই স্মরণীয় উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিতেছেন। ব্রোচ্ ব্রেসলেট নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত, আলোকে পুলকে উদ্ভাসিত, সুন্দরীগণের রূপজ্যোতিঃ সৌরকর-প্রতিফলিত নির্ঝর-ধারার ন্যায় বিচ্ছুরিত হইতেছে। কাপ্তেন থরন্টন্ একটি সুন্দরী যুবতীর স্বাস্থ্যপানের আকাঙক্ষায় গ্লাসটি তুলিয়াছেন, এমন সময় একজন আরদালি টেবিলের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি নীল লেফাফার ভিতর বন্ধ গালা-মোহর করা। পত্রখানি দেখিয়াই সাহেবের হাত হইতে গেলাস পড়িয়া গেল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্বশরীর বাতাহত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। সহসা তিনি ভয়ানক অসুস্থ বোধ করিতেছেন বলিয়া ডিনার টেবিল পরিত্যাগ পূর্বক অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে পত্র খুলিতে সাহস হইল না। অনেক চেষ্টাব পর পত্র খুলিয়া দেখিলেন, সেই এক কথা। নূতনের মধ্যে তাঁহার পরমায়ুর আর একমাস হ্রাস হইযাছে, তাহাই লেখা আছে। পরদিন কাপ্তেন সাহেব দিল্লী ত্যাগ করিলেন। তিনি যেখানেই থাকুন, পর পর কয়েক মাস ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে লাগিল।

৫

কয়েকমাস পর একদিন কাপ্তেন সাহেব দেরাদুনের সন্নিকটবর্তী কোন পার্বত্য অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। দিবাবসানকালে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ একটি ক্ষুদ্রকায়া গিরিতরঙ্গিনী-তীরে সংকীর্ণ পার্বত্যপথের উপর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে একটি মনুষ্যমূর্তি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্তী গিরিগুহাপ্রান্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনীভূত হয় নাই। কাপ্তেন সাহেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন— সেই নিশ্চল নির্বাক দেহ আবদুল গফুরের।

সেই সায়ংকালে নির্জন গিরিনদীতটে অপবিসর পথের উপর ছয়মাস পূর্বে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ সজীব দন্ডায়মান দেখিয়া কাপ্তেন থরনটন্ নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রায় তাঁহাব সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বীরপুরুষ. কাপুরুষেব ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন না। মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার কক্ষস্থিত চর্মনির্মিত কোষ হইতে একটি রিভলভাব আকর্ষণ পূর্বক আগন্তুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলেন। কিন্তু আগন্তুক নিশ্চল। গুলি খাইয়া অক্ষত দেহে সে হা হা করিয়া হাসিয়া যেদিকে পূর্বে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছিল. সেই দিকেই দ্বিতীয় বার তাহার অকম্পিত হস্ত প্রসারিত করিল। তাহার সেই অবজ্ঞাপূর্ণ, জীবনের হর্ষোচ্ছ্বাসবর্জিত, নীরস উচ্চহাস্য সেই মৌন সায়াহ্নের শত গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া ধীবে ধীরে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাহার নির্নিমেষ চক্ষুর তারকাদ্বয় দীপ্তিমান্ অগ্নিগোলকেব ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। সেই অবজ্ঞাব্যঞ্জক, রোষানলপ্রদীপ্ত তীব্র দৃষ্টি মনুষ্যেবও নহে, পশুবও নহে। তাহা উৎপীড়িত, আহত, প্রতিহিংসা-লোলুপ পৈশাচিকতায় পরিপূর্ণ। কাপ্তেন থরনটন্ চক্ষু অবনত করিলেন। তাহার পর চক্ষু তুলিয়া যখন তাহার দিকে পুনর্বার চাহিলেন দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই, অস্তমান অংশুমালীর অন্তিম কিরণরেখার ন্যায় তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। শব্দহীন, গতিহীন ভাবে সে ছায়ামূর্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল? ছায়া না কায়া? কিছুই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। সেই মূর্তি যে স্থান নির্দেশ করিয়াছিল, কাপ্তেন অবসাদশিথিল পদক্ষেপে অত্যন্ত মন্থরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। গুহাপ্রান্তে চাহিয়া দেখিলেন. নীল লেফাফায় মোড়া একখানা পত্র. পূর্বপত্রের ন্যায় গালামোহর করা, সেখানে পড়িয়া আছে। লেফাফার উপরে তাঁহারই শিরোনামা। সাহেবের ললাটে স্থূল ঘর্মবিন্দু সঞ্চিত হইল, বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হইল। তিনি সেই গুহাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর পত্রখানি তুলিয়া লইয়া মোহর ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার মৃদু আলোতে তাহা পাঠ করিলেন। পত্রখানি পূর্ব বারের ন্যায়ই সংক্ষিপ্ত। পত্রে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে, তাঁহার আয়ুঃকাল আর ছয়মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৬

ইহা নিশ্চয়ই যে অনৈসর্গিক ঘটনা, কাপ্তেন সাহেবের অতঃপর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ শতগুণ সংবর্ধিত হইল। তাঁহার মুখ হাস্যহীন, পাংশুবর্ণ। চক্ষু জ্যোতিহীন, কোটরগত। দেহের লাবণ্য নাই, মনের দৃঢ়তা নাই, সংকল্পের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। এক একখানি পত্র কেবল যে তাঁহার পরমায়ু হ্রাসের সংবাদ বহন করিয়া যথানিয়মে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইতে লাগিল তাহা নহে, প্রত্যেক পত্র তাঁহার দেহের শোণিত শোষণ করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কি দিবসে কি নিশীথে, কি আলোকে কি অন্ধকারে, কি জাগরণে কি নিদ্রায়, বিধাতার অসংখ্য কঠোর বিধানের ন্যায়, অনির্দেশ্য হস্তলিখিত সেই সংক্ষিপ্ত পত্র সর্বক্ষণ তিনি তাঁহার হৃদয়পটে মুদ্রিত দেখিতেন।

বেরেলী ক্যান্টনমেন্টের বাহিরে একদিন কাপ্তেন থরনটন্ অশ্বারোহণে প্রাতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে অশ্বচালনা করিয়া অবশেষে অনেক দূরে একটি সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক অনতিদীর্ঘ খালের উপর এই সেতু প্রসারিত।

সংকীর্ণ সেতু। কাপ্তেন সাহেব সেতুর অপর প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন একটি বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নাম—রামহিত তেওয়ারি। মিঃ থরনটন্ রামহিতকে চিনিতেন। তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতকে বিদ্রোহী সন্দেহে সাহেব তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহার আদেশে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, অবশেষে তাহার একমাত্র অবলম্বন ক্ষুদ্র কুটীরে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীতে রামহিত তেওয়ারির আপনার বলিতে আর কেহ নাই, কিছু নাই।

সেই শিরাবহুল জীর্ণ বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, সেই জীবিত কঙ্কাল মিঃ থরনটনের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পরে সাহেবের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কাপ্তেন সাহেব চিনিতে পার কি? আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।"

সাহেব বলিলেন, "অপেক্ষা? আমার কাছে বিদ্রোহীর পিতার কি দরকার থাকিতে পারে? ভিক্ষুক, পথ ছাড়িয়া দে। নতুবা বুকের উপর আমার অশ্বের ক্ষুর বিদ্ধ হইবে।"

"আমি সে ভয়ে ভীত নহি। ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, উৎপীড়কের দমনকর্তা। তোমার দমনের জন্য তাঁহার ন্যায়দন্ড উত্তোলিত রহিয়াছে। সাহেব সাবধান!"

কাপ্তেনের দেহের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে আসিয়া জমা হইল। তিনি বলিলেন, "নিমকহারাম, আমার অপমানে সাহসী হইতেছিস্?"—সাহেব বন্দুক তুলিয়া রামহিতের মস্তক লক্ষ্য করিলেন।

বৃদ্ধ অচঞ্চল। বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র উন্মোচন করিয়া দক্ষিণহস্ত সাহেবের দিকে প্রসারিত করিল। বলিল, "সাহেব, তুমি দীনদুনিয়ার মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তোমার অপমান করি, আমার এমন কি সাধ্য? খাপ্পা হইও না। তোমার নামে একখানি পত্র আছে, লও।"

সেই নীল লেফাফা, গালামোহর করা পত্র। সাহেবের হস্ত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ রামহিত সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া পত্রখানি কাপ্তেনের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মিঃ থরনটন্ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে সেখানে অবস্থান করিলেন। তাঁহার চক্ষুর উপর চরাচর ঘুরিতে লাগিল, প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোক নিবিয়া গেল। দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল। কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন, সেই ভীষণ দৈববাণী। স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—তাঁহার পরমায়ু আর এক মাস।

'মেডিক্যাল লিভ' লইয়া সাহেব পরদিন বিলাতযাত্রা করিলেন। এতদিনে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে, একমাস পরে তাঁহাকে দেহ বিসর্জন করিতে হইবে। দেশত্যাগ করিয়া যদি কোনক্রমে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

৭

মিঃ ম্যাক্ফারসন্ বোম্বের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি কাপ্তেন থরনটনের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাহেব জীর্ণদেহ, উদ্বেগতাড়িত হৃদয় লইয়া বোম্বে নগরে ভগিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। স্নেহময়ী ভগিনী দীর্ঘকাল পরে ভ্রাতার দেহ ও মনের অবস্থা দেখিয়া

অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এ অবস্থায় তুমি কোনক্রমেই জাহাজে উঠিতে পাইবে না, আমার এখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হও, পরে দেশে যাইও।"

কাপ্তেন ভগিনীর অনুরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "এই রৌদ্রদগ্ধ অভিশপ্ত ভারত-বক্ষে আমার সমাধি রচনা না করিয়া তুমি ছাড়িবে না। আর একমাসের মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হইবে।"

"এ বিশ্বাস তোমাব কেন হইল? তোমার মস্তিষ্ক খারাপ হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি সংসারের সকল চিন্তা ছাড়িয়া দাও।"

"চিন্তা আমি ছাড়িয়াছি, কিন্তু সে রাক্ষসী আমাকে ত্যাগ করিবে না। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সে আমার বক্ষে বসিয়া আমার হৃদয়শোণিত শোষণ করিতেছে—আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"—কাপ্তেনের মস্তক সোফার উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মিঃ থরন্টনের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। বিবি ম্যাক্‌ফারসন্ তাঁহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবি থরন্টন্ কিছুই জানিতেন না।

ভ্রাতার সুখশান্তি বিধানের জন্য বিবি ম্যাক্‌ফারসন্ প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমোদ ও আনন্দের মধ্যে সর্বদা তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমোদের প্রবৃত্তি কাপ্তেনের হৃদয়পিঞ্জর পরিত্যাগপূর্বক অন্তর্হিত হইয়াছিল। সহস্র চেষ্টাতেও পিঞ্জরের বিহঙ্গম পিঞ্জরে ফিরিয়া আসিল না।

ভগিনীর আগ্রহে কাপ্তেন থরন্টন্ কোন খ্যাতনামা বিলাতী থিয়েটারে একদিন সায়ংকালে অভিনয় দেখিতে গমন করিলেন। সেদিন মহাকবি সেক্সপীয়বের হ্যামলেট নাটকের অভিনয় ছিল।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে 'বক্‌সের' উপর হইতে কাপ্তেন সাহেব আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আত্মীযবন্ধুগণ নিকটেই ছিলেন। তাঁহারা যুগপৎ উঠিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, কাপ্তেন মূর্ছিত। বহু চেষ্টায় তাঁহার মূর্ছা ভঙ্গ হইল। সাহেব বলিলেন, "তোমরা হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়াছ? আমি দেখিয়াছি সে প্রেতাত্মা হ্যামলেটের পিতা নহে, আবদুল গফুরের প্রেতাত্মা।'

বিবি ম্যাক্‌ফারসন্ ভ্রাতার মস্তকে পাখা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? আবদুল গফুর কে?"

"একজন সিপাহী। বিনা বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছি।"

কাপ্তেন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বিবিধ যন্ত্র-সংযোগে তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কাপ্তেনের 'ব্রেণ ফিবার' হইয়াছে। অনেক দিনের রোগ—অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে।"

তিন দিন সাহেব শয্যাগত রহিলেন।

চতুর্থ দিন সাহেবের অবস্থা অল্প ভালো বোধ হইল। অপরাহ্ণে একখানি ইজিচেয়ারে তিনি বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বাংলোর সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর। সমুদ্রের দিক হইতে মুক্তবায়ুপ্রবাহ আসিয়া ললাটের ঘর্মবিন্দু ধীরে ধীরে অপসারিত করিতেছিল।

নীল-পরিচ্ছদধারী, নীল-উষ্ণীষশোভিত, নীল-পতাকাধারী একজন মুসলমান সৈনিক-পুরুষ সেই বারান্দায় আসিয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাপ্তেন দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। সৈনিকপুরুষ একখানি নীলবর্ণের পত্র বাহির করিয়া সাহেবের স্থির নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর ধরিল। আজ পত্র লেফাফায় আবদ্ধ নহে। খোলা পত্র—অক্ষরগুলি লোহিত কালিতে অঙ্কিত। সাহেব নির্নিমেষ দৃষ্টিতে স্পষ্টাক্ষরে পাঠ করিলেন—

"আজ ১৮৫৯ সালের ১৭ই জুলাই।

সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার পরমায়ু শেষ হইল।"

সাহেব চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে মূর্ছা আর ভঙ্গ হইল না। বিবি ম্যাক্‌ফারসন্ নিকটেই ছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া তীব্রস্বরে সেই মুসলমান সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই?"

"উৎপীড়িতের প্রতিহিংসক।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। ❑





একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমাব নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি.এ. পাশ করিয়া চাকরীব সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। ববাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্ মাস্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—

ইয়ংবেঙ্গল—ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে চোর-ডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি.এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল। নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান-বন্ধনের জন্য সেই জল আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিযা আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ী স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরী হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরী, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও-রূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে! তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—"মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এখানেই থাকবি তো? তোর খাবার জোগাড় করি?"

সে বলিল, "আজ্ঞে না, মা-ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, 'তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে'।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান

করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে ঃ

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণঃ

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার কবিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম--"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমাব উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইযাছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইযাছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি বামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম— "মজুমদাব মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

—"তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমাব প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘন্টা দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ

পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘন্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু, এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?"

আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে।"

গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক্, আজ আর কাজ নেই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তা দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য। ❑



সর্বনাশিনী

পাঁচকড়ি দে

তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় দেখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে নিতান্তই বলবতী ছিল, তাই আমার চিরসহচর প্রাণের বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমি একদিন দার্জিলিং রওনা হইলাম।

আমরা পথে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়েরই মত যে, রেলে গেলে হিমালয় প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। রেল যেন উড়িয়া যায়, এরূপ অবস্থায় রেলে গমন করিলে হিমালয়ের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রকৃত উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য আমরা উভয়েই স্থির করিলাম যে, আমরা শিলিগুড়ি হইতে পদব্রজে দার্জিলিং রওনা হইব।

সকালে শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। যতক্ষণ দার্জিলিং-এর সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়িগুলি দৃষ্টিপথে রহিল, ততক্ষণ স্টেশনে আমরা তাহার বিচিত্রগতি দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে দুই কুলির মস্তকে আমাদের দুইজনের দুই ট্রাঙ্ক চড়াইয়া দিয়া নিজ নিজ হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম।

পথেই দুই একটি বাঙালীর সহিত দেখা হইল। আমরা বাজারেই বাসা লইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা করিতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা যাঁহার বাড়ীতে উঠিলাম, তিনি এখানে শালকাঠের ব্যবসায় করেন।

সেদিন সে রাত্রি আমরা শিলিগুড়িতেই রহিলাম। সকলেই আমাদিগকে বলিলেন, পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইবে, বরং গরুর গাড়ী করিয়া যান। আমরা পদব্রজে যাওয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। প্রকাশ্যে সদর রাস্তা দিয়া যাইব না, তাহাও স্থির। সে রাস্তায় বহু লোক চলাচল করে, বহু গরুর গাড়ি মাল লইয়া সর্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারই পার্শ্ব দিয়া রেল গিয়াছে। সুতরাং এ রাস্তায় হিমাচলের গুরুগাম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধা হইবে না, সুতরাং আমরা সে পথে প্রাণ থাকিতে যাইব না।

যে পথে পাহাড়িয়াগণ চলা-ফিরা করে, সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথ দিয়া আমরা যাইব। তবে পাহাড়ের পথ দুর্গম, তাহাতে আমরা পথ চিনি না, সুতরাং আমাদের একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক।

অর্থে কি না হয়? আমাদের নূতন বন্ধুদিগের অনুগ্রহে আমরা তাহাদের বিশ্বাসী একজন মহাবলবান ভুটিয়া পথপ্রদর্শক পাইলাম। সে তাহার তিনজন বিশ্বাসী কুলি সংগ্রহ করিল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে কুলির মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ভগবানের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রথমে আমাদের অগ্রে—কোমরে দুই খুকরী, হস্তে এক বৃহৎ লগুড়, ভুটিয়া থম্বিমেনা। তৎপশ্চাতে আমরা দুইজন, তৎপশ্চাতে তিনজন কুলি। আমরা মহানন্দা নদীর পোল পার হইয়া মাটিয়াখোলার হাট উত্তীর্ণ হইলাম, তৎপরে নক্সাবারীর পথ ধরিয়া চলিলাম।

পথে এক কাঁইয়ার দোকান পাইয়া তথায় রন্ধন ও ভোজনকার্য সারিয়া লইলাম। এই দুর্গম জঙ্গলেও মাড়োয়ারী মহাত্মাদিগের অভাব নাই, মধ্যে মধ্যেই দোকান, দোকানে প্রায় সর্বদ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। আমাদের হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য বর্ণনা করিবার এখানে উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা এই রূপের শেখর শ্রীযুত হিমালয় মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইতাম। সুতরাং আমরা এ কথার উত্থাপন করিব না।

এই হিমালয়ে এমন প্রায়ই ঘটে যে কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ কুয়াশা উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া যায়। তখন আর কিছুই দেখা যায় না—অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, তাহা অতি দুর্গম,—একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, পড়িলে সহস্রহস্ত নিম্নে আসীন হইতে হয়। একজনের অধিক দুইজনে পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়া কষ্টে উঠিতে হয়। অতিকষ্টে কুয়াশার অন্ধকার ঠেলিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এ দিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়—দারুণ প্রবল শীত, তাহার উপর বৃষ্টি। হিমালয়ে এই বৃষ্টি না থাকিলে বোধ হয় ইহাই ইন্দ্রের অমরাবতী ও নন্দনকানন হইত। একটা মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই আমরা তথায় আজিকার মতো বিশ্রাম করি। নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কুয়াশার ভিতর দিয়া কোন দিকে যাইতেছি তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদে পথপ্রদর্শক বলিতেছিল যে, নিকটেই কাঁইয়ার দোকান ও বস্তি আছে। কিন্তু আমরা এক ঘণ্ট কষ্টে চলিয়াও কোন পল্লী পাইলাম না।

হিমালয়েব সন্ধ্যা আমাদের দেশের মতো সহজ বকমে হয় না। সন্ধ্যা বলিয়া কো ব্যাপাব এখানে নাই। সহসা না বলিয়া কহিয়া অবাধ্য মেয়েব মতো যেন একেবারে তিমিরবসন নিশা হিমালয়কে নিজের কৃষ্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া দেয়। আজ ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অনুভব কবিলাম সহসা চাবিদিক ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। আর কিছু দেখিবার উপায় নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ শব্দ কবিতে করিতে চলিল, আমবা তাহা গলার স্বর অনুসবণ কবিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম। একটু পা পিছলাইলেই গিয়াছি আর কি— ভয়াবহ মৃত্যু। এখন আমবা বুঝিলাম, আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধুগণ হিতবাদী বটেন কিন্তু ---মরণকালেতে রোগী ঔষধ না খায়---গতানুশোচনায় আর ফল কি?

সহসা পথপ্রদর্শক দাঁড়াইল, আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন বুঝিলাম, সে নিজেই অন্ধকাবে পথ হারাইয়াছে---গ্রামের পথে না গিয়া অন্য পথে আসিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের দুর্গমতম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে---কোনদিকে কোথায় যাইবে, স্থির কবিতে পারিতেছে না সে নিজে এ কথা স্বীকাব না করিলেও তাহার গলার স্বরে আমাদেব বেশ উপলব্ধি হইতেছিল

তখন আমাদের হৃদয়ের ভিতর হৃদয় বসিয়া গেল। বুঝিলাম, রাত্রে এই পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলমধ্যেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না—তবে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ না হইলেই এক্ষণে ভগবানের অসীম দয়া।

থম্বিমেনা বলিল, "ফিরিয়া এই পথে একটু নামিয়া গেলেই একটা বস্তি পাইব।"

অগত্যা তাহাই কবা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমরা ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক পদ যাইবামাত্র আমি একটা গড়ানে স্থানে আসিলাম। তাহার পর কি হইল, ঠিক মনে নাই। আমি গড়াইতে গড়াইতে কতদূর চলিলাম, তাহাও মনে নাই। এইমাত্র বুঝিলাম আমার লম্বা কোট দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্রও ঠিক আমার গতি অনুসরণ করিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে। শব্দে বুঝিলাম, গুণবন্ত থম্বিমেনারও সেইরূপ দশা, গড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা কিসে লাগিয়া আমাদের অধঃপতনের গতি বন্ধ হইল। স্পর্শে বুঝিলাম কি একটা কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যে আমাদের বেগ নিরোধ হইয়াছে। পকেটে দেশলাই ও বাতি ছিল, জ্বালিলাম সেই অন্ধকারে দীপালোকেও ভালো দেখা যায় না।

আলোটা উচ্চে তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একখানা কাষ্ঠনির্মিত ঘর। আমরা তিনজনেই সেই গৃহের কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরপার্শ্বে পতিত। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাহা হউক, প্রাণটা যে বাজে খরচ হয় নাই, ইহাই ভালো! সম্ভবতঃ আশ্রয়ও মিলিবে এ গৃহে যেই থাকুক না কেন, এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হইবে না। আমরা আলো ধরিয়া গৃহের দ্বারে আসিলাম। দরজা বন্ধ।

আমি দরজায় আঘাত করিলাম—কেহ উত্তর দিল না। এবার আমি আরও বেশিরকম শব্দ করিয়া সবলে করাঘাত করিলাম, তবুও কেহ উত্তর দিল না। তখন আমি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলাম, কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহির হইতেও অন্ধকার

আমি আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম—প্রবোধ ও থম্বিমেনা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু তৎপরে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিল। থম্বিমেনা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে ছুটিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আমরা উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকার হইতে কেবল একটি ভীতিব্যঞ্জক আর্তরব আমাদের কর্ণে প্রবেশ কবিল, আমরা কেবলমাত্র সেই শব্দের এইমাত্র বুঝিলাম

"শয়তান কা ঔরত।"

প্রবোধ বলিল, "বোধ হয় এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই বাড়ীতে ভূত আছে—পাহাড়ীমাত্রেই ভূত বড় বিশ্বাস করে। যাহাই হউক, খাদে পড়িয়া যে আজ প্রাণটা যায় নাই, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শীতে বুক গুর্-গুর্ করিতেছে। এ আশ্রয়ও ভগবান মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালা যাক। আলো দেখিলে কুলি দুইটা আর গুণবন্ত থম্বিমেনা প্রাণের দায়ে এখানে আবাব ফিরিয়া আসিতে পথ পাইবে না।

আমরা বাহিরে আলো লইয়া কতকগুলা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ কবিলাম, তৎপরে তাহা জ্বালাইয়া গৃহমধ্যে আগুন করিলাম। আগুনে হাত সেঁকিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদের ব্যাগে সর্বদাই আমরা কিছু না কিছু আহার্য রাখিতাম। প্রবোধ তাহাই বাহির করিয়া প্রবলবেগে ভোজন আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, "আগে ঘরটা ভালো করিয়া দেখা যাক্।"

প্রবোধ বলিল, "আগে প্রাণে বাঁচলে ত আর সব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এই পাহাড়ে শীতে আর এই পাহাড়ে রাস্তায় যেন ক্ষুধা হাজার গুণ বাড়িয়া উঠে।" অগত্যা আমরা উভয়ে সেই আগুনেব পাশে বসিয়া কিছু আহার করিয়া লইলাম।

আহার শেষ হইলে উভয়ে বাতি লইয়া ঘরটি ভালো করিয়া দেখিতে চলিলাম, একটি ঘর নহে, পাশাপাশি দুইটি ঘর। গৃহমধ্যে নানাবিধ তৈজসপত্র পড়িয়া আছে। দেখিলেই বোধ হয়, শেষে যাহারা এই বাড়ীতে ছিল, তাহারা যে কারণেই হউক, হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেক জিনিসপত্র পড়িয়া আছে, লইয়া যাইবার সময় হয় নাই—তাড়াতাড়ি যে চলিয়া গিয়াছে, এই ঘরের অবস্থা দেখিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

একটা বাক্সও ঘরেব কোণে পড়িয়া আছে।—দেখিলাম, ডালা খোলা। তুলিয়া দেখি, তাহাব ভিতর অনেকগুলি নানা তারিখের বাংলা চিঠি রহিয়াছে।

এই দুর্গম স্থানে এই নির্জন বাড়ীতে তাহা হইলে পূর্বে কোন বাঙালী বাস করিয়াছিল। কে সে? এত স্থান থেকে এখানে আসিয়াছিল কেন? দারুণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরা বাতিটি সেই বাক্সের উপর রাখিয়া পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। যখন সর্বশেষ পত্রখানির পাঠ শেষ হইল, তখন নিম্ন হইতে সেই অন্ধকার আলোড়িত করিয়া এক হৃদয়বিদারক উচ্চ আর্তনাদ উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এই ভয়াবহ শব্দ আমাদের কানে আসিতে লাগিল। ইহা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা না কোন মানুষের আর্তনাদ, তাহা কেবল ভগবান বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম, ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিতে সাহস করিলাম না।

যে সকল পত্র আমরা পাঠ করিলাম, তাহার প্রথমখানি এই—

প্রথম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

কলিকাতার সেই সোরগোল অশান্তির মধ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন পাহাড়মধ্যে এই স্থানে আমি যে কি শান্তি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আর লোকালয়ে থাকিব না। লোকালয়ে থাকিলে আর আরাম হইতে পারিব না, এইজন্য এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। আমার মস্তিষ্কও যেরূপ উষ্ণ হইয়াছিল—তাহা আর নাই, আমি এখন শান্তচিত্তে চিন্তা করিতে পারিতেছি। আব এই স্থানের ন্যায় চিন্তা করিবার স্থান দ্বিতীয় আর কোথায়?

আমার এই বাড়ী পর্বতের মাঝামাঝি স্থাপিত, পশ্চাতে স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, সম্মুখে একটু আগে একেবারে মহাখাদ, দুই সহস্র হাত নিম্নে একটি নদী রজতসূত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ বাড়ীখানিতে দুইটি মাত্র ঘর। ঘর বলিতে চাও, আর যাহা বলিতে চাও, তাহাই ইহাকে বলা যায়। কতকগুলি শালকাঠ জোড়া দিয়া প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে—চালও ঐ শালকাঠ জোড়া। এখানে শালকাঠের অভাব নাই, চারিদিকেই শালকাঠ—কাটিয়া লইলেই হইল। আমার সঙ্গে চাকর-বাকর নাই, চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা ভুটিয়া বস্তি আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন সকালে রওনা হইয়া আমার দরকারমতো দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরি।

সময় কাটাইবার জন্য একখানা খুব বড় উপন্যাস লিখিতেছি। বোধ হয় তাহাতেই আমি জগদ্বিখ্যাত হইব।

আমি একজন লোক পাইয়াছি। রাত্রে সে কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকিতে চাহে না। তা না থাকুক ক্ষতি নাই। দিনেই সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং আমার স্ত্রীকে পূর্বের ন্যায় খাটিতে হইতেছে না।

এই নির্জন দুর্গম স্থানে থাকিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ হইয়াছিল। আমিই বুঝাইয়া রাখিয়াছি, লোকালয়ে থাকিলে আমার রোগ আরাম হইবার আশা নাই। এই কথা বলায় সে সম্মত হইয়াছে।

রাত্রে সে পার্শ্বের ঘবে নিদ্রা যায়—আমি সম্মুখের ঘরে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই প্রকাণ্ড উপন্যাসখানা লিখি।

তোমার মন্মথ।

দ্বিতীয় পত্র

(দ্বিতীয়পত্রে কেবল সেই উপন্যাসের কথা এবং সেই উপন্যাসেব প্রশংসার ভাগই অধিক।)

তৃতীয় পত্র

প্রিয় সুরেশ,

তোমাকে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি. এইখানা লইয়া তিনখানা হইবে, কিন্তু কোনখানাই এখনও ডাকে দিতে পারি নাই। ডাকঘর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। পত্র তিনখানা ডাকে দিবার জন্য

এখনও কোন লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একটু গুরুতর কারণ আছে। সহজে এ বাড়ীর নিকট কেহ আসিতে চাহে না, অধিক পয়সা দিতে চাহিলেও না। আগে ইহার কারণ জানিতে পারি নাই, একদিন এক বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধ আমাকে এ রহস্যের বর্ণনা করিল। ব্যাপার এই—

সোহো বলিয়া একটা লোক এই কুটীর নির্মাণ করে। সে ভুটিয়াদিগের মধ্যে একজন কবি বলিয়া গণ্য ছিল। সে নির্জনে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্গমস্থলে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছিল। এখানে সে নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত।

সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটস্থ এক ব্যক্তির একটি ভুটিয়া যুবতী সেই নিভৃত-নিবাসী কবির প্রেমে পড়িল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কুটীরে দুইটি ঘব। যখন গভীর রাত্রে পার্শ্বের গৃহে যুবতী স্ত্রী নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে এই যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মৃদুমন্দকণ্ঠে প্রেমালাপ করিত।

একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রী সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এই যুবতীকে এই কুটীরে আসিতে হইলে একটা কাঠের সাঁকো পার হইয়া আসিতে হইত। এই সাঁকোর প্রায় পাঁচশত হাত নিম্নে এক ঝরণা বা ঝোরা। প্রবলবেগে সেই ঝরণা দিয়া জল পড়িত বলিয়া ভুটিয়ারা ইহার নাম "পাগলা ঝোরা" রাখিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে এই ঝরণার উপরের সাঁকো দিয়া সেই যুবতী যাতায়াত করিত।

একদিন সোহো গৃহে না থাকায় তাহার স্ত্রী সুবিধা পাইয়া সেই সাঁকোর কাঠ টাঙ্গি দিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। এমন সামান্যমাত্র সাঁকোর কাঠ পাহাড়ে সংলগ্ন রহিল যে, মনুষ্যভার পড়িলেই তাহা নিশ্চিত পতিত হইবে।

তাহাই ঘটিল। সে রাত্রে, পূর্বের ন্যায় সোহো প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতেছে, সহসা তাহার কণে এক মর্মভেদী আর্তনাদ প্রবেশ করিল। তাহার পরই প্রকাণ্ড কাঠ ও পাথরের শব্দ আসিল, তাহার প্রণয়িনী পাঁচ শত হস্ত নিম্নে পাগলা ঝোরায় বিসর্জিত হইয়াছে।

কে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সোহোর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে একদিন সোহো ও তাহার স্ত্রী উভয়েই গভীর খাদে পতিত হইল।

সোহো তাহার স্ত্রীর গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ভুটিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহে অসীম বল, সোহোর স্ত্রী তাহাকে টানিতে টানিতে খাদের নিকট লইয়া আইসে, তথাপি সোহো তাহার গলা হইতে হাত অপসারিত করিল না। তাহার স্ত্রীর চক্ষু কপালে উঠিল, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে তাহার স্বামীকে ছাড়িল না। উভয়েই দুই সহস্র হাত নিম্নে গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

এতদুর বলিয়া বৃদ্ধ ভুটিয়া বলিল, "সেই পর্যন্ত সোহোর প্রণয়িনী সোহোর বাড়ীতে প্রেত হইয়া আইসে। ভিতরে আলো দেখিলে সে দরজায় আঘাত করে। তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। অনেকে এই বাড়ীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু এ বাড়ীতে যে বাস করে তাহারই মৃত্যু হয়।"

এইজন্যই এই সোহো-প্রণয়িনীর ভূতের জন্য কেহ সাহস করিয়া এখানে আসে না। আমার দ্রব্যাদি হাট হইতে আমাকেই নিজে আনিতে হয়, এই জন্যই এ পর্যন্ত ডাকে পাঠাইতে পারি নাই।

তোমার মন্মথ।

চতুর্থ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

দেশে হইলে এ কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। বোধ হয় অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যেই একথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এই নির্জন দুর্গম স্থানে ভূতের কথা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

রাত্রে—অনেক রাত্রি পর্যন্ত—বসিয়া আমার সেই বিরাট উপন্যাসখানা আমি প্রত্যহ লিখিয়া থাকি, কিন্তু বৃদ্ধ ভুটিয়ার নিকট এই কথা শোনা পর্যন্ত রাত্রে আমার লেখা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি শুনিলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, কিন্তু সত্য গোপন করাও ঠিক নহে, প্রকৃতই সেই দিন হইতে রাত্রে লিখিতে লিখিতে মধ্যে মধ্যে বন্ধ করিয়া আমি কান পাতিয়া শুনিতাম, দরজায় কেহ ঘা মারিতেছে কিনা। যথার্থ-ই কি আমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যেন সোহো-প্রণয়িনী আমার স্কন্দে ভর করিয়াছে! হাসিও না, এই নির্জন দুর্গম লোকশূন্য স্থানে সকলই সম্ভব। তোমার সেখানে যাহা হাস্যজনক, এখানে তাহা ভীতিপ্রদ।

কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমারও যে বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমারই নিজের বিশ্বাস হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে আমি কুটীরের বাহিরে বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভগ্ন সাঁকোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। উঁকি মারিয়া সাঁকোটার নিম্নস্থ পাগলা ঝোরা দেখিতেছিলাম, সহসা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, দূরে সুন্দর বনফুলে সজ্জিত একটি পাহাড়িয়া যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তখন চারিদিক ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। এখানে এ কুটীরের এত নিকটে এ-পর্যন্ত আমি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ জনপ্রাণী দেখিতে পাই নাই। এখান হইতে লোকালয় দুই ক্রোশের নিকটে নহে। রাত্রে এই দুর্গম পথ দিয়া কাহারও গমন করা সম্ভব নহে।

তবে এ তরুণী কে? এ এখনও এখানে কেন? আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠ পরিষ্কারের অব্যক্ত শব্দ করিলাম, তথাপি সে নড়িল না। আমি ডাকিলাম, তবুও সে নড়িল না। এই দুর্গম পর্বতে আমার গলার শব্দ তাহার নিকট পৌঁছিতেছে না ভাবিয়া আমি তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিলাম। তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।—আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম, আমার শিরায় শিরায় যেন কে বরফের প্রবাহ ছাড়িয়া দিল। কেন আমার এ ভাব হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি মনুষ্য নহে,—এই কি সেই সোহো প্রণয়িনী?

তোমার মন্মথ।

পঞ্চম পত্র

(পূর্বোক্ত পত্রের এগার দিন পরে লিখিত।)

প্রিয় সুরেশ,

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সে আসিয়াছে। আমি যেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে পর্বত-মধ্যে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই একদিন আসিবে।

কাল রাত্রে সে আসিয়াছে। আমরা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়া ছিলাম।

তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, আমি উন্মত্ত হইয়াছি—আমার রোগ সারে নাই, এখনও সেই জ্বর আছে, তাই সে জ্বরের প্রকোপে বিকৃতমস্তিষ্কে কল্পনায় আমি প্রেতাত্মা দেখিতেছি।

তুমি বলিবে কেন, আমি নিজেকেই নিজে এ কথা অনেকবার বলিয়াছি, এ সকল সত্য ও সে আসিয়াছে। কি সে? রক্তমাংসের দেহধারিণী নারীমূর্তি অথবা আকাশের প্রাণী—বায়ুমূর্তি—আমার কল্পনার সৃষ্টি? যাহাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। আমার নিকট ইহা কল্পনা নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, মিথ্যা নহে। সত্য—অতি সত্য।

গত রাত্রে সে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে নিদ্রিতা, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত সম্মুখের ঘরে বসিয়া সেই উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। ওই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যহ রাত্রে আমি ইহার প্রতীক্ষা করিয়াছি—দ্বারে তাহার মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছি, ইহার আশায় প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইয়াছি। এখন আমি আমার মনের এ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমি সাঁকোর উপর ইহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি, তিনবার দরজায় আঘাত সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি—তিনবার মাত্র।

ইহাতে আমার কঙ্কালের ভিতর যেন তীক্ষ্ণ তুষারধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে একরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমি সবলে আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছি, তবুও সেই শব্দ, সেই দ্বারে আঘাত—তিনবার মাত্র। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছি।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে গিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—দ্বারে শিকল টানিয়া দিলাম। তৎপরে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ—সেই দ্বারে আঘাত, তিনবার—তিনবার মাত্র।

তখন আমি গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলাম—অতিশীতল বায়ু প্রবলবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার কাগজপত্র কতক উল্টাইয়া, কতক গৃহতলে ছড়াইয়া দিল। রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সে তাহার মস্তক হইতে শাল সরাইয়া স্কন্ধে ফেলিল, কণ্ঠদেশ হইতে একখানা রঙ্গীন রুমাল খুলিয়া পার্শ্বে রাখিল, তাহার পর আমার সম্মুখে আগুনের কাছে আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, তাহার উন্মুক্ত পা দুখানি তখনও শিশিরসিক্ত রহিয়াছে। আমি তাহার সম্মুখে বসিলাম, বিস্ফারিত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া

মৃদু মধুর হাসিল—সে হাসি মধুর, অথচ বিস্ময়কর, যেন ধূর্ততা শঠতা তাহাতে মাখা। সেই হাসিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি তাহাকে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত—সর্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত।

সে কথা কহিল না, নড়িলও না। আমি তাহার কথা শুনিবার কোন আবশ্যকতা মনে করিলাম না। সেই বিলোল চোখ, সেই চপল দৃষ্টি, তাহাই যেন আমার সহিত কত প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি—তাহার চক্ষু আমার চক্ষুর সহিত—আমার চক্ষু তাহার চক্ষুর সহিত পরস্পর সম্মিলিত—সে আনন্দ সে সুখ—সে যে কি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আমি কতক্ষণ এইরূপভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সহসা সে নিজের বুকের কাছে একটা হাত তুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তখনই পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা অতি মৃদু শব্দ কানে আসিল। অমনি সেই অপরিচিতা বামা সত্বর সেই শালখানা তাহার মাথায় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে অতি দ্রুতপদে দরজা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

আমি ভিতরের ঘরের শিকল খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম, কোন শব্দ নাই। তখন আমি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। তাহার পর বোধ হয়, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আমার মনে হইল যে, রমণী রাত্রে রুমালখানি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার চলিয়া যাইবার পরও আমি তথায় রুমালখানি দেখিয়াছিলাম। তাই ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র সেখানা লুকাইয়া রাখিব বলিয়া সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রুমাল তথায় নাই।—আমার স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, আমার চা-এর জল গরম করিতেছে। সে আমার দিকে দুই এক বার চাহিল—আমি তাহাকে এমন করিয়া চাহিতে আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না—রুমালের কথাও কিছু বলিল না।

তাহাতেই আমার মনে হইল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র। কাল রাত্রে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর কিছু নহে, স্বপ্নমাত্র। কিন্তু অপরাহ্ণে আমি একবার বাহির হইতে দেখিলাম, আমার স্ত্রী সেই রুমালখানি হাতে লইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেছে। তাহার মুখ অপর দিকে ছিল, সুতরাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না।—আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রুমালখানা দেখিতেছে।

আমি কতবার মনে করিলাম যে, রুমালখানা আমার স্ত্রীরই। কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই আমার কল্পনা—স্বপ্ন মাত্র। আর তাহা যদি না হয়, তবে কাল রাত্রে যে আসিয়াছিল, সে প্রেতাত্মা নহে—প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক।

কিন্তু মানুষ মানুষে চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে। কাল রাত্রে যে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে রক্তমাংসের কোন জীব নহে—ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

সম্ভবতঃ সে কোন স্ত্রীলোক হইতে পারে। এখান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে কোন বস্তি বা লোকালয় নাই। দিনেই এই পার্বত্যপথে চলা-ফেরা বিপজ্জনক—রাত্রে অসম্ভব। কোন্ স্ত্রীলোক অন্ধকার রাত্রে এই ভয়াবহ কঠিন পর্বত পথে আসিতে সাহস করিবে? তাহাতে ঘোর

অন্ধকার, দারুণ শীত—কোন স্ত্রীলোকের এই দুর্গম স্থানে, এ কুটীরে আগমন একেবারেই অসম্ভব।

আরও কারণ—কেন স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জায় গলিত তুষারস্রোত প্রবাহিত হয়?

যাহাই হউক, সে যেই হউক, সে যদি একবার আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিব। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব সে রক্তমাংসের জীব, না বায়ু—কেবল কল্পনা, কেবল শূন্য, একটা ছায়ামাত্র।

তোমার মন্মথ।

ষষ্ঠ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

এই সকল পত্র কখনও যে তুমি পাইবে, সে আশা আমার নাই। আমি এখান হইতে এ সকল চিঠি তোমাকে পাঠাইব না। তোমার নিকট এ সকল পাগলের পাগলামি, উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। যদি কখনও দেশে ফিরি, তাহা হইলে হয়ত কোনদিন-না-কোনদিন এই সকল পত্র তোমায় দেখাইতে পারি, তাহাও শীঘ্র নহে। যখন আসিয়া এইসব লইয়া হাস্যবিদ্রূপ করিতে পারিব, কেবল সেই সময়েই তোমায় এ সকল পত্র দেখাইব। এখন আমি এগুলি লিখিতেছি, আমার মনের যাতনায়। এগুলি এইরূপে না লিখিলে হয়ত আমাকে চীৎকার করিয়া মনের যাতনা লাঘব করিতে হইত।

সে প্রত্যহ রাত্রে আসে, সেইরকম আগুনের কাছে বসে, সেইরকম আমার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টিবিন্যাস করে—সেই কুহকিনী মৃদুমধুর হাসি হাসে—আমার মস্তিষ্ক ঘোরতররূপে বিচঞ্চল হইয়া উঠে, আমি আত্মহারা হই—আমার অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়।

এখন আমার লেখা সম্পূর্ণ-ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—লিখিবার চেষ্টাও করি না। আমি সাঁকোর উপর তাহার শুভাগমনের পদশব্দ—ঘাসের উপর পদশব্দ—দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া থাকি।

সে আসিলে সেই ভাব—আমি আর কথা কহিতে পারি না—আমি আর আমাতে থাকি না—কোন কথাই আর মনে হয় না—সেও কোন কথা কহে না, কেবল সেইরূপভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ হাসি হাসে।

প্রত্যহ আমি মনে করি, আজ সে আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা কহিব, নিশ্চয়ই তাহাকে স্পর্শ করিব। কিন্তু সে আসিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই, আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কাল রাত্রে যখন আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমার মন তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্ববর্তী কক্ষের গবাক্ষের দিকে চাহিলাম, চাহিবামাত্র বোধ হইল, কে জানালা হইতে সহসা মুখ সরাইয়া লইল। এদিকে নিমেষমধ্যে সে শাল মস্তকে টানিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো লইয়া পার্শ্বের গৃহে গেলাম। দেখিলাম আমার স্ত্রী নিদ্রিতা রহিয়াছে।

তোমার মন্মথ।

সপ্তম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

রাত্রির জন্য আমি ভীত নহি, দিনের জন্যই ভীত। যে স্ত্রীলোককে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া আসিতেছি, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত এখন ঘৃণা করি। সে ঘৃণার ইয়ত্তা নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। তাহার যত্ন শ্রদ্ধা সোহাগ সমস্তই এখন বিষবৎ বোধ হয়। কি জানি, কেন তাহার চোখের দিকে চাহিলে আমি শিহরিয়া উঠি।

সে সকলই দেখিয়াছে, সকলই জানিতে পারিয়াছে, আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি।—তাহাই কি?

অথচ সে আমাকে এখনও ভালোবাসে, যত্ন পূর্ববৎ অনুরাগ পূর্ববৎ—ভক্তি পূর্ববৎ। তথাপি আমার মনে হইতেছে সমস্ত জাল, সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই ছলনা, প্রতারণা—আমরা পরস্পরে প্রণয় ভালোবাসা জানাইতেছি—অথচ সব জাল, সব মিথ্যা, সব ছলনা। আমি জানি-সে সব দেখিয়াছে, সব জানিয়াছে, তাহার চোখ আমাকে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। আমি জানি, সে কেন এই ভীষণ প্রতিহিংসার আয়োজন করিতেছে।

তোমার মন্মথ।

অষ্টম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আজ সকালে হাটে যাইব বলিয়া আমি বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, ক্রমে আমি তাহার দূরবর্তী হইতে লাগিলাম। পরে একবার চাহিয়া দেখি, দূর হইতে আমাব স্ত্রীকে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখাইতেছে। অবশেষে পর্বত বেষ্টন করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমি উঠিতে পড়িতে পড়িতে মহাবেগে ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহের দিকে আসিতে লাগিলাম। পার্বত্যপথ সহজ নহে, কত উঠিয়া পড়িয়া তবে অন্যদিক দিয়া আমার গৃহের নিকট আসিলাম। তথায় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার গৃহপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, আমার স্ত্রী এক টাঙ্গি লইয়া কাঠের সাঁকোর নিকট আসিল। আমি যেখানে ছিলাম, তথা হইতে, সে কি করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দূর হইতেও আমি তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু মনে হইল, সে হাসির ভিতরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

সে গৃহে চলিয়া গেলে আমি আবার হাটের দিকে চলিলাম। হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম, সে আমাকে পূর্বের ন্যায় সমাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

আমি যে তাহার ভয়াবহ কার্য দেখিয়াছি, তাহা ঘুণাক্ষরে তাহাকে জানিতে দিলাম না। তাহার শয়তানী কার্য এইরূপই থাক। সে ভাবিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক রাত্রে সাঁকো পার হইয়া আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসে, তাই সে সাঁকো কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। আজ সে আসিলে অতল খাদ-নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে।

আমি কিছু বলিলাম না। ইহাতে আজ সপ্রমাণ হইবে যে, প্রত্যহ রাত্রে আমার কাছে যে আসে—সে কে। যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে ভগ্নপ্রায় সেতুতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, আর যদি সে প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে—

আমি এ চিন্তা প্রাণ হইতে দূর করিলাম। ভাবিতেও আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

যদি প্রকৃতই মানবী হয়, তাহা হইলে কথা না কহিয়া কেবলই আমার দিকে চাহিয়া থাকে কেন? আমিই বা কেন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? কেন তাহার সম্মুখে আমার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়? নিশ্চয়ই মানবী নহে। আমার স্ত্রী তাহার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। হতভাগিনী প্রতিহিংসার এই ব্যর্থ চেষ্টায় আরও জ্বলিয়া অস্থির হইবে।—বেশ হইবে।

কিন্তু যদি সে প্রেতলোকবাসিনীই হইবে, তবে আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই কেন? কেনই বা তাহার পায়ে স্পষ্ট শিশিরের দাগ দেখিতে পাই—কেনই বা তাহার দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিতে পাই? এ সকল ত প্রেতের চিহ্ন নহে।

রাত্রি হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমাইতেছে। আমি একাগ্রমনে গৃহে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে সে পূর্বের ন্যায় আমার কাছে আসিবে, আর যদি সে যথার্থ-ই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাঁকো হইতে পড়িবার সময়ে আর্তনাদ শুনিতে পাইব! অথবা কোনো প্রেতলোকের অজানিত কুহকজালে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে! সহসা একি—একি এ প্রেতাত্মার বিদ্রূপ!

আমি শুনিয়াছি—আমি সেই ভয়াবহ আর্তনাদ এইমাত্র শুনিয়াছি, হৃদয়ভেদী—গগনভেদী আর্তনাদ আমি শুনিয়াছি।

আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া, অন্ধকাররাশি আলোড়িত করিয়া সেই ভয়ানক আর্তনাদ সাঁকোর নিকট হইতে উত্থিত হইল. সেই গভীর খাদ-মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে আর্তনাদের বর্ণনা নাই—সে আর্তনাদ এখনও আমার কর্ণপথ দিয়া আমার শিরায় শিরায় শোণিতের সহিত ছুটিতেছে।

আমি গৃহ হইতে সবেগে বাহির হইলাম। সাঁকোর নিকটে আসিলাম। শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সাকো আর নাই।

নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর অন্ধকার—সেই গভীর গহ্বর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ—কিছু দেখিবার উপায় নাই!

প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেই প্রবল বাতাসে আমার উচ্চ প্রবল চীৎকার যেন পৈশাচিক হাস্যকল্লোলের ন্যায় বিকট কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি বুঝিতেছি। এতদিন যে উন্মত্ততা ধীরে ধীরে আমাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, আর কোন উপায় নাই—চেষ্টা বৃথা—বৃথা—বৃথা—

আমি কতবার মনে মনে বলিতেছি, এ কেবল আমার বিকৃত অসুস্থ পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র—এ আর্তনাদও আমার কল্পনামাত্র।—না—না—না—ঐ সেই শব্দ! ঐ সেই আর্তনাদ! ঐ সেই মর্মভেদী আর্তনাদ!

প্রতিক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কে যেন গুরুভার লোহার হাতুড়ি দিয়া নির্দয় আঘাত করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি সে আর আমার কাছে আসিবে না।—এই শেষ!

তোমার মন্মথ।

শেষ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আমি একটা বড় খামে সমস্ত পত্রগুলি রাখিয়া তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাইব। যদি কখনও কেহ এইখানে আসে, তাহা হইলে সে হয়ত তোমাকে এই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারে।

আমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী—তোমাকে বুঝাইবার জন্য যাহাকে এখনও আমার স্ত্রী বলিতে হইতেছে,—আমরা উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকি, কেহ কোন কথা কহি না। এ এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন।

যখন কথা কহি, তখন এইরূপভাবে কথা কহি, যেন আমাদের উভয়ের এই প্রথম দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দুই একটা কথা কহি, তাহাও আমাদের পরস্পর মনে ভাব গোপন করিবার জন্য—আমাদের উভয়ের কেহই আর পূর্বের মত নাই। আমি সর্বদাই তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখিতেছি।—সে ইহা গোপন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি ইহা দেখিতেছি। তাহার চেষ্টা বৃথা!

প্রত্যহ রাত্রে নির্জনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, যেন সে পূর্বের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমি সত্বর গিয়া দরজা খুলিয়া দিই, কিন্তু কই, কেহ নাই, কেবল অন্ধকার—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে বাহিরের কতকটা শীতল বাতাস প্রবেশ করে মাত্র—আর কিছুই না।

এই দুর্গম স্থানে বাস করিয়া আমি দানব হইয়াছি। ভালোবাসা ও ঘৃণা দুইই ভয়াবহভাবে আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটাইয়াছে, আমার মস্তকে শত চিতানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমার লেখাপড়া, শিক্ষা, সদ্‌গুণ—সমস্ত এই পাহাড়ের বাতাসে যেন আমার হৃদয় হইতে উড়িয়া গিয়াছে! আমি হিংস্র পশু হইয়াছি।

কবে ইহার—এই স্ত্রীলোকের, যে এক সময়ে আমার স্ত্রী ছিল, তাহার কুসুমকোমল কণ্ঠদেশ আমার এই রোগশীর্ণ কঙ্কালসার কঠিন অঙ্গুলি দ্বারা সবলে পেষণ করিব—তাহার চমৎকার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিবে, তাহার ওষ্ঠাধর উন্মুক্ত হইবে—তাহার আরক্ত জিহ্বা লতাইয়া পড়িবে, কবে তাহার গলা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে, আরও জোরে টিপিতে থাকিব! দেরি নাই—দেরি নাই—দেরি নাই! তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিতে ঠেলিতে এই কুটীর হইতে লইয়া যাইব—এই বন্ধুর কঠিন পাথরের

উপর দিয়া লইয়া যাইব—এই খাদের নিকট আনিব। সে বড় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল বটে! এবার হাসির পালা আমার! হো-হো-হো—

আমি জোর করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া যাইব, ধীরে ধীরে আদর করিয়া—এই খাদের ধারে যখন তাহার পায়ের একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠ পাহাড়ে থাকিবে—সে হেলিয়া পড়িবে, তখন আমি তাহার দিকে অবনত হইয়া তাহার আরক্ত অধর চুম্বন করিব।—তাহার পর নিম্নে—নিম্নে—নিম্নে—কুয়াসার মধ্য দিয়া, লতাপাদপগুল্ম ভেদ করিয়া, পশুপক্ষীকে স্তম্ভিত করিয়া—নিম্নে—নিম্নে—গভীরতর নিম্নে—দুইজনে একত্রে যাইব—যাইব—যাইব—যাই—যতক্ষণ না তাহার সহিত মিলিত হই—"

(এই পত্র অসম্পূর্ণ।)

এই শেষ পত্র—এই ভয়াবহ পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া আমি প্রবোধের মুখের দিকে চাহিলাম, সেও আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মুখে যে ভাব দেখিলাম, সে বোধ হয় আমার মুখে তাহাই দেখিল। আমি দেখিলাম, প্রবোধের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা উভয়ে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে সাহস করিলাম না। উভয়েরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সংসারে এই ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক থম্বিমেনা "শয়তান কা ঔরত" বলিয়া যে ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, এখন বুঝিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

এতদিন ভূতপ্রেতের কথা বিশ্বাস হয় নাই। ভূতপ্রেত হউক বা না হউক, পত্রলেখক মন্মথ এই নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ভূতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই উন্মত্ততায় হতভাগ্য আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে, নিজেও মরিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই সকল পত্র।

ভোর হইতে-না-হইতে আমরা সে স্থান হইতে পলাইলাম। রামোচন্দ্র! আর সেখানে এক মিনিট থাকে! বস্তিতে আসিয়া আমাদের দুই কুলি ও থম্বিমেনাকে পাইলাম। আমরা যে সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া এখনও জীবিত আছি, ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা দার্জিলিং পৌঁছিয়া পত্রগুলি সমস্ত কমিশনার সাহেবকে দিলাম। শুনিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটীরটা একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ❑



নরক এক্সপ্রেস

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

জলটা চেপে এলো। ঝড়ের ধাক্কায় দোর-জানলা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

রাত দশটা বেজে গেছে ; তখনো আমরা বসবার ঘরে আড্ডা দিচ্ছি। জয়ন্ত আমি আর সুরমা।

'আজ আর তোমার যাওয়া হয় না ভাই জয়ন্ত'—এই নিয়ে বার সাতেক অনুনয় করা হলো জয়ন্তকে।

সুরমা কথায় ঝাঁজ মিশিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলো—'আজ এই রাক্ষুসে রাতে রওনা না হলে কী আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

'দুই দিনের কড়ারে এসে আটদিন রয়েছি বৌদি! এর পরে শেষকালে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করবেন, সেটা না আপনাদের দিক থেকে শোভন, না আমার দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হবে।'

গম্ভীরভাবে এই কথা বলে একটা পান মুখে পুরলো জয়ন্ত।

তার কথা বলার ধরন দেখে আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। সুরমারও ঠোঁটের কোণে দেখা গেলো হাসির ঝিলিক।

কড় কড় করে বাজ পড়লো নিকটেই কোথাও।

'কিন্তু সত্যি বলো তো, এই দুর্যোগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে চাপতে তোমার ভয় হবে না? ঈশ্বর না করুন, অ্যাকসিডেন্ট তো হামেসাই হচ্ছে!"

আমার তূণের শেষ বাণ এইটি। ট্রেন-দুর্ঘটনার ভয়েও যদি ও নিরস্ত না হয়, তবে আর উপায় কী? বন্ধু বই আর কিছু নয় যে জোর করে বলবো—'হবে না যাওয়া!' বন্ধু মাত্র। তাও মাঝে কয়েক বৎসর কোনো খোঁজই রাখিনি ওর। হঠাৎ সেদিন একটা চিঠি এসে হাজির ; কে জানে কোথা থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে নিয়ে জানিয়েছে—'তোমার জঙ্গলে দুটো দিন কাটিয়ে আসতে চাই। পরশু রওনা হবো।'

আমার এটা জঙ্গলই বটে। ফরেস্ট অফিসার আমি, যে বাংলোতে থাকি, তা থেকে স্টেশন অন্ততঃ আধ মাইল। রাস্তা পাকা বটে, কিন্তু নিরাপদ নয়। রাত্রে বুনো হাতি চলাচল করে, আর সাপ অগুনতি।

জয়ন্ত এসেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বাস করতে হয় তো, এইরকম জায়গাতেই। একেবারে আইডিয়াল নিভৃতনিবাস। বেশ আছো তোমরা—'কপোতকপোতী যথা বাঁধি নীড় সুখে...।'

'থাকো না দিনকতক, তুমিও বেশ থাকবে'—এই বলে সুরমাকে ফিরিস্তি দিতে বসে গেলাম—ছাত্রজীবনে ও চা-য়ে কয় চামচ চিনি খেতো, ডিমের পোচ্ পছন্দ করতো, না মামলেট, আর ফুলের ভেতর বেলফুলের বেশি পক্ষপাতী ছিল, না রজনীগন্ধার।

'দেরাদুন এক্সপ্রেসে ভয়?'—আমার কথা শুনে ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিলো জয়ন্ত—নরক এক্সপ্রেসে চড়েও বেঁচে ফিরে এসেছি যখন, পৃথিবীর কোন ট্রেনের কোন অ্যাক্সিডেন্টই আমার কিছু করতে পারবে না ভাই!'

'নরক এক্সপ্রেস?—সে আবার কী?'—দুজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম—সুরমা আর আমি।

হাই তুলে দুহাতে একসঙ্গে তুড়ি দিলো জয়ন্ত। 'কথাটা বলে ফেলেছি তাহলে! এটা আমার একটা ব্যারামে দাঁড়ালো দেখছি। যেখানেই যাই—ঐ ছাই নরক এক্সপ্রেসের কথা না বলে পারিনে! এটা অবচেতন অহমিকা। একে দমন করতে হবে।'

'তা দমন করতে হয়, করো এর পর।'—আমি পেয়ে বসলাম। 'এখন তো গল্পটা আমাদের বলো।'—আশা হলো এই গল্পের নেশায় মেতে উঠলে ট্রেন-ধরার নেশা ছুটে যাবে হয়তো।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখলো জয়ন্ত। দশটা বাইশ। দেরাদুন এক্সপ্রেস এগারোটা পঞ্চাশে। দেড় ঘণ্টা। আধ মাইল যেতে—এই ঝড়-বৃষ্টির দরুন সময় বেশি লাগবে—তবু আধ ঘণ্টার বেশি কিছুতেই লাগতে পারে না। 'এক ঘণ্টা হাতে আছে যখন, নরক এক্সপ্রেসের গল্পটাই নিয়ে যাই তোমাকে—'

'বছর তিনেক হলো লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—যেমন চিরদিন বেড়াই। মধ্যভারতের ঐ দিকটায়।

হঠাৎ একদিন বিকেল বেলা একটা ছোট্ট স্টেশন প্রথম নজরেই বড়ো ভালো লেগে গেলো। দূরে দূরে নীল পাহাড়, স্টেশনের লাল ঘরগুলি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিলো তাদের ...। আমগাছে কোকিল ডাকছে, হরিণ ছুটছে মাঠের ভিতর।

ভালো যখন লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। স্টেশনের নামটা তখনোও ...খিনি।

আমি নামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলো। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম ওয়ে রুমের দিকে ; ব্যাগটা বিছানাটা কারো জিম্মা করে দিয়ে বেড়াতে বেরুবো।

স্টেশনের নাম দেখতে পেলাম—বুলন্দশহর।

বুলন্দশহর! কী যেন মনে পড়ে-পড়ে, পড়ে না। ঐ নামের সঙ্গে জড়ানো কী যে কবেকার একটা কাহিনী। রবিবাবুর গল্পে এক বুলন্দশহরের কথা পড়েছি না? যেখানক নবাবপুত্রী—কিন্তু না ; যে-গল্পটা আমার মনের আনাচে-কানাচে উঁকি দিচ্ছে, অথচ ধরা দি না, সেটা কোনো নবাবপুত্রীর গল্প নয়।

তবে, কী সেটা?

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে মাঠে পড়েছি, মাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়েছি বনে। রেললাইন আম পাশে পাশেই চলেছে।

বন তখনো আদ্ধেক পেরুতে পারিনি, একটা নদীর ধারে এসে পড়লাম। সরু নদী, কি গভীর খুব। এখন গরমের দিনে জল বেশি নেই, মাঝে মাঝে চড়াও বেরিয়েছে ; কিন্তু বর্ষ দিনে এ নদীতে যে অনেক জল থাকে আর স্রোতও হয় প্রবল, তা দেখেই আমি বুঝা পারলাম।

এই নদীর উপর মজবুত কংক্রিটের পুল, তারই উপর দিয়ে চলে গিয়েছে রেললাই

কিন্তু বাঁয়ে ওটা কী? আর একটা পুল না?

একটা কাঠের পুল, মাঝখানে ভাঙা। অর্থাৎ হাতদশ-বারো জায়গায় না আছে কাঠ, আছে লোহা, না আছে থাম, না আছে লাইন।

বেশ বোঝা যায়, ঐটিই এ-নদীর আদি পুল, এককালে ঐ পুল দিয়েই রেললাইন ন পার হতো।

যা এতোক্ষণ কিছুতেই মনে পড়ছিলো না, তা চট করে মনে পড়ে গেলো এইবা বুলন্দশহর! এই সেই বুলন্দশহর! তিন বৎসর আগে এই স্টেশনে, এই নদীর উপরেই এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। এক দুর্যোগের রাত্রে ঐ কাঠের পুলটা ভেঙে গোটা একখা ট্রেন পড়ে গিয়েছিলো নদীর জলে। একটি প্রাণীও বাঁচেনি সে ট্রেনের।

বটে! এই সেই বুলন্দশহর! ঐ সেই পুল!

একটা গোটা ট্রেনের সমস্ত যাত্রী সমুখের ঐ জায়গাটাতে জলে ডুবে মরেছিলো, জলেডে রেলগাড়ির কামরায় বন্ধ হয়ে, বা তার নিচে চাপা পড়ে। ঠিক খাঁচায়-বন্ধ ইঁদুর যে ভাবে জ ডুবে মরে, সেই ভাবে।

মনে পড়ে। আর কল্পনাতে শিউরে শিউরে উঠি।

হঠাৎ খেয়াল হলো—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পুব আকাশে ঐ জ্যোছনা চিকচিক করছে- মস্ত-বড়ো চাঁদ, দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী তিথি হবে।

রাতে বেড়ানো অভ্যাস আছে। বাঘ-ভাল্লুককে বড়ো-একটা কেয়ার করি না। তবু আ এই পাহাড়ে নদীর ভাঙা পুলের কাছে ভর-সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে গা-ছমছম ক উঠলো। জানা জিনিসের চাইতে অজানার ভয় আমাদের হাড়ে মজ্জায় অনেক বেশি নিবি করে মেশানো আছে। আমি তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

ছোট্ট জায়গা, বাজার দোকান নেই বললেই হয়। এক ভুজাওয়ালার দোকানে ডাল-রোটির ব্যবস্থা করতেই দুঘণ্টা কেটে গেলো। তারপর ফিরে এলাম প্ল্যাটফর্মে।

স্টেশনমাস্টারকে টিকিটখানা দেখানো দরকার ছিলো। মাঝপথে নেমে পড়েছি ; এই টিকিটেই বাকি দূরত্বটুকু পাড়ি দেওয়া চলবে তো?

'চলবে'—একগাল হেসে উত্তর দিলেন তিনি।

লোকটিকে মিশুক অমায়িক বলেই ধারণা হলো। আমার হাতে কাজ নেই তো বটেই : তাঁরও কিছু আছে বলে মনে হয় না। অনাহূত একটা টুল অধিকার করে গল্প শুরু করা গেলো।

'বেশ জায়গাটি আপনাদের।'

'তা যা বলেছেন।' মাস্টারমশাই উত্তর করলেন—'জায়গাটি এমনিতে বেশ ; তবে বাঘ-ভাল্লুক আছে ; আর—'

'আর' বলে থেমে পড়লেন ভদ্রলোক।

'আর কী?'—আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কী যেন বলতে বলতে থেমে গেলেন বোধ হচ্ছে?'

'না, ও কিছু নয়। বছর তিনেক আগে এইখানটাতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, শুনে থাকবেন। বেশ বড়ো-রকমের অ্যাকসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ'—আমি আগ্রহের সঙ্গে সায় দিলাম—'খুব শুনেছি। পুল ভেঙে—'

'লোকের মাথায় পোকা আছে, জানেন তো?'—স্টেশনমাস্টার বললেন—'ভূত থাক না থাক, লোকে ভূতের গল্প করতে ভালোবাসে।'

একটা মালগাড়ি এসে পড়লো। স্টেশনমাস্টার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভূতও আছে তাহলে এই ছোট্ট জায়গাটিতে ; থাকবে বই কি! শত শত লোক পাইকারী হারে একসাথে যেখানে মারা যায়—

বেরিয়ে ভুজাওয়ালার দোকানে হাজিরা দিলাম। ডাল-রোটি সে পাকিয়ে ফেলেছে। আমিও চোখ কান বুজে খেয়ে ফেললাম।

ওয়েটিংরুমে ফিরে এসে একটা বেঞ্চি অধিকার করলাম। সতরঞ্চিটা পেতে, কম্বল মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম আরাম করেই। রাত একটায় আমার ট্রেন। ঘুম যদি ঠিক সময়ে ভাঙে, ধরবো সেটা। যদি না ভাঙে, কুছ পরোয়া নেই, কাল সকালে যে ট্রেন পাবো, সেটাতেই উঠে পড়বো। রাত একটার গাড়ি আমার ধরতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ আমায় দেয়নি।

দেহ ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম সহজে আসে না। এটা, ওটা, নানা চিন্তা। কলকাতার মেসে এক বামুন ঠাকুর ছিলো, সে অড়হড়-কা দাইল বাঁধতো—চমৎকার। আজকের এই ভুজাওয়ালার দাইল তার কাছে কিছু না। মেসের সেই বামুন ঠাকুর দাঙ্গার সময় খুন হয়, ভূত হয়ে সে সারা রাত রান্নাঘরে হাঁড়ি-কড়া ঘট্‌ঘট্ করতো। ট্রেনভর্তি যে লোকগুলো তিন বছর আগে এখানে নদীর জলে ডুবে মরেছে, তাদের মধ্যে মেসের ঠাকুর কেউ ছিলো কিনা, কে বলবে?

কিন্তু, এতো লোক ওয়েটিংরুমে ঢুকলো কেন? কখনই বা ঢুকলো? একটু বোধহয় তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো এর ভেতরে। এরই মধ্যে ঘর যেন গিস্‌ গিস্‌ করছে লোকে। চুপি চুপি

ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, ফিস্‌ফাস্‌ কথা কইছে পরস্পরে। এরা কোন্‌ ট্রেনে যাবে? রাত একটা সেই ট্রেনে? ভীষণ ভীড় হবে দেখছি!

চোখ মেলে লোকগুলোর দিকে চেয়ে দেখবার উৎসাহ আর হলো না। চৈতন্য হারিে ফেললাম ঘুমের কোলে।

কে জানতো—এ ঘুম কাল ঘুম?

কতোক্ষণ এই কাল ঘুমে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো একটা অস্প কোলাহলে। ঘর-ভরা লোক দুদ্দাড় ছুটে চলেছে। ট্রেনে উঠবার জন্যে নাকি? উঠে ব বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি—তাই বটে, গাড়ি এসে গিয়েছে, দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে পাশে। উঃ, খুব সময়মতো ঘুমটা ভেঙেছে!

তাড়াতাড়ি বিছানাটা গুটিয়ে বগলে তুললাম ; ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুমুখেই যে কামরা চোখে পড়লো, উঠে পড়লাম তাতেই। আলোয়-আলো সারা গাড়ি, জানলায় জানলায় অগুন মানুষের মাথা, হাঁক-ডাক—কেউ চা-ওলাকে ডাকছে, কেউ চাইছে গরম দুধ, কেউ-বা দেশলা বিড়ি!

গাড়িতে উঠে বসে পড়লাম একটা খোলা জানলার পাশে। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ছ্যাঁ করে উঠলো। কেন, কে জানে?

হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই!

প্ল্যাটফর্মটা, স্টেশনঘরটা জনপ্রাণী-শূন্য।

একটা আলো পর্যন্ত কোথাও নেই!

গাড়িতে কামরায় আলো ঝলক দিচ্ছিলো, তাই আগে লক্ষ্য করি নি স্টেশনে আলো অভাব। এ কি রকম? দূরপাল্লার একটা এক্সপ্রেস ট্রেন এসে স্টেশনে দাঁড়িয়েছে। স্টেশে আলো নেই, মানুষ নেই! ট্রেন স্টেশনে এসে ঢুকলো কি করে? সিগন্যাল না পেলে এখন ট্রে ছাড়বেই বা কী করে? স্টেশনমাস্টারকে তো কোথাও দেখছি না! স্টেশনের ঘরটাই বন্ধ!

কিন্তু গাড়ি ছাড়লো ঠিকই। কেউ ঘণ্টা বাজালো না, কেউ নিশান দেখালো না, ত ছাড়লো গাড়ি। ঘটাং-ঘট-ঘট ঘটাং শব্দে দুলতে দুলতে স্টেশনের এলাকা ছেড়ে বেরিে পড়লো।

হাতঘড়ির দিকে দৈবাৎই চোখটা পড়েছিলো ; চমকে উঠলাম—রাত মোটে বারোটা আমার এক্সপ্রেস গাড়ি তো রাত একটায় আসবার কথা!

এ তবে কোন্‌ ট্রেন?

যাঃ, কোথায় গিয়ে পড়বো এবার, কে জানে! এমন রাগ হলো স্টেশনমাস্টারটার ওপরে লোকটা কিনা আমায় অম্লান বদনে বললো যে রাত একটার আগে কোন গাড়ি নেই?

গাড়ি নেই যদি, এটা তবে কী?

পাশের এক ভদ্রলোককে জিগেস করলাম—'ও মশাই, বিদেশী লোক, না-জেনে উে পড়েছি, গাড়িটা যাবে কোথায়?'

লোকটা একবার তাকিয়ে দেখলো আমার পানে, কিন্তু জবাব কিছু দিলো না। লোকট কালা নাকি?

অন্য পাশে ছিলো এক পাৎলুন-পরা পার্শি। তাকেও জিজ্ঞেস করলাম ঐ একই প্রশ্ন। নাঃ, জবাব এও দিলো না।

রেগে গেলাম রীতিমতো। স্টেশনমাস্টারের ওপর, এই সহযাত্রীদের ওপর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর। এরা আমায় উজবুক বানিয়ে ছেড়েছে! গোল্লায় যাও সব!

রেগে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ খেয়াল হলো—রাতটা বড়ো অন্ধকার ঠেকছে। চাঁদটা গেলো কোথায়? সেই সন্ধ্যেবেলা দেখেছিলাম—এতো বড়ো সোনার থালার মতো ত্রয়োদশীর চাঁদ সারা পৃথিবী আলোয় উজ্জ্বল করে তুলেছে—সে চাঁদ আমার গেলো কোথায়? রাত মোটে বারোটা, ত্রয়োদশীর চাঁদ তো এক্ষুনি অস্ত যেতে পারে না।

তবে মেঘে ঢেকে ফেলেছে?

ওঃ, তাই বলো! জমাট মেঘ সারা আকাশে। কালো। নিকষ কালো। ঐ যাঃ, বিদ্যুৎ চমকালো যে!

শুধু বিদ্যুৎ? কড় কড় করে বাজ ডেকে উঠলো। আকাশের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত গড়িয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটলো। কড়-কড় কড়াৎ!

কোথায় ছিলো ঝড়, আর কোথায় ছিলো বৃষ্টি! দুই মিনিটের ভেতর প্রলয়-দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলো। জানলা বন্ধ করে বসলাম সাবধানে। সহযাত্রীরা যেন ক্ষেপে উঠেছে ততোক্ষণে। ডাক ছেড়ে কাঁদছে, এ-ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে, কপাল চাপড়াচ্ছে, যেন ভয়ে আর নৈরাশ্যে।

দুই একজনকে জিগ্যেস করলাম—'ক্যা হুয়া, রোতা কাহে? তুফান বরখা কভি দেখা নেহি?'

কে কার কথা শোনে। আমাব দিকে কানই দিলো না কেউ। সমানে কাঁদতে থাকলো বাপ-দাদার নাম করে।

বিরক্ত হয়ে জানলা খুললাম। ঝড়-বাদলের ঝাপ্টা বরং সহ্য হবে, এদের এ পাগলামি অসহ্য।

জানলা খুলে ফেললাম। সেই মুহূর্তে এলো একটা বিদ্যুতের চমক। চোখের পলকে যা দেখলাম, তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো আমার।

নদীর ধারে এসে পড়েছি আমরা। আর—

ডাইনে ঐ কংক্রিটের পুল।

বাঁয়ে সেই ভাঙা কাঠের পুল।

আমাদের ট্রেন কংক্রিটের পুলের দিকে গেলো না, বাঁয়ে মোড় খেয়ে তীরবেগে ছুটলো কাঠের পুলের পানে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। গাড়ি-ভর্তি পঞ্চাশটা লোকের ভয়ার্ত রোদনের ওপরেও আমি শুনতে পেলাম আমার নিজের সেই চীৎকার।

ঘড়াস! ঘস্! ঝপাস্! ঝপ্!

আমি দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে খোলা জানলা দিয়ে লাফ দিলাম। গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে লাফ দিলাম—কিসের ভিতরে লাফ দিচ্ছি, না দেখেই দিলাম লাফ।

তারপর কী হলো, জানি নে।

জ্ঞান হলো যখন, তখন আমি নবীনগরের হাসপাতালে। আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যান্ডেজ বাঁধ শুনলাম, সকালবেলায় কারা নাকি আমায় নদীর চড়ায় অজ্ঞান আর আহত অবস্থায় পং থাকতে দেখে স্টেশনে নিয়ে যায়। স্টেশনমাস্টার আমায় পাঠান হাসপাতালে।

লোকটি ভালো। একদিন আমায় দেখতে এলেন হাসপাতালে। কথায় কথায় তাঁর মুখে শুনলাম সব। ও ট্রেনটা আসলে ট্রেনই নয়, ট্রেনের ভূত। ওখানকার লোকে ওর নাম দিয়েছে- নরক এক্সপ্রেস। তিনবছর আগের সেই মারাত্মক দুর্ঘটনায় যে ট্রেনটা নদীতে উল্টে পং গিয়েছিলো, সে এখনো রোজ রাতে একবার বুলন্দশহরের পাশ দিয়ে পুলের পানে ছোটে অ রোজ রাতে একবার ঝাঁপ খায় নদীর জলে।

আমার বরাত মন্দ যে সেই ট্রেনে উঠে পড়েছিলাম। আবার বরাত ভালো যে নর এক্সপ্রেসও আমাকে নরকে নিয়ে যেতে পারে নি।'

গল্প শেষ হলো। সুরমা চুপ, আমিও চুপ। হঠাৎ জয়ন্ত গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালে

'এবার বেরুতে হয়। নইলে গাড়ি পাবো না।'

'সত্যিই এই জল-ঝড়ে?'—আর কথা ফুটলো না আমার।

'সেরাত্রের জল-ঝড় এর চেয়ে বেশিই ছিলো ভাই। শুধু কি জল-ঝড়? চারিধারে ঘি ছিলো নরকের অধিবাসীরা। সামনে ছিলো মৃত্যুর হাতছানি। সেখান থেকে যখন ফিরতে পেরে তখন কিছু ভয় করো না—আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।'

বেরিয়ে পড়লো জয়ন্ত।

তার বর্ষাতি-মোড়া সুদীর্ঘ দেহটা অচিরেই হারিয়ে গেলো বর্ষার ঘন-চিকের আড়ালে।।



কালা নাবি



মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরাম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন,—'আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেহ্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল,—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বাল্‌ডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

'আচ্ছা আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি?'

'জান না? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায়!'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসব আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসারি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হ'তে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হবিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তা ছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতিব মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পবের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকাবা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন-তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকেব তাই উঁচুদরের বিষয় আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হযেছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকেব লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিত মশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্‌টা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে। তাইতো পরকালের আশায় ব'সে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর, বেদানা, আম, রসগোল্লা, কাটলেট সব রকম ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ঐ হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিচ্ছু বলবে না। যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোকে আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জ'মে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল রফা ক'রে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-ই নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য! বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর = ০, আত্মা = ভূত = ০।

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হ'ল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার ব'য়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিনসিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হ'লেই হ'ল।'

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন, মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কাল মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হ'লেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স্ বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না-হয় রামনাম ক'রো।'

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কাল মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কি। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেন্ড ইয়ার স্যার।'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'বলি স্যার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুই ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্‌টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলতে বুলতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন। আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থূল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ ক'রে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন ক'রে বললেন—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি—আমার কলেজে আর ভুতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলেই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ—হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরি দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল, তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা ক'রে ফেলেন—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্‌ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ক'রে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই বড় একখানা আলজেবরা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা বাধল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবীন্দ্রনাথই হোন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঙঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ
তোরে করি কাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে—'বাবু চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।'

মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই ক'রে নে।'

পিঠে মারি চড়,
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনও লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে,
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা।
দেব মাটি-চাপা।
সার হয়ে যাবি,
ঢ্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই। কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হ'ল, তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গেল। সহকর্মীরা মিলনের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটু সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন। কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল—প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সংগত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়াছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলিতী বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা ক'রে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাতে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'তে লাগল। ডাক্তার বললেন—'পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভুতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন?' কিন্তু ঐ মানুষ বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা ঠিক নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন—'হরিনাথ তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ ক'রো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আনানো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধহয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেকে আনতে।

অনেকক্ষন পরে দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড়? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেল্লেল্লা হতভাগার লাস আমরা বইব? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে প'ড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠায় সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হ'ল। পনর টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর তিন সঙ্গী খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওআলিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন।

বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিলোচন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের ঢের বয়েছি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি? পনর টাকায় হবে না মশায়, আরও পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণী তিন জন হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কাল র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয় চিরকাল

সমদর্শী এখন তো কথাই নেই। তাছাড়া যে লোক উপযাচক হয় শ্মশান যাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না। তার জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—কুড়ি টাকার কাজ নয় বাবু এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা লাগবে।

এমন সময় আরেকজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কাল র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কাল র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললে, চল, চল।

আবার যাত্রা আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির সেই কাল র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্য এই তিন পহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই বললেন,—'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হন হন করে চলছে। হরিনাথের আর তার সঙ্গীদের ছুটতে হল।

আরে অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আস্তে চল। কেই বা কথা শোনে! ছুট—ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। বীডন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওহে পাকড়াশী, থামাও না ওদের। কোথায় পাকড়াশী? তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীব্র বেগে ছুটছে, হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওআলিস স্ট্রীট, গোলদিঘি, বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে? এ কি আলো না অন্ধকার? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চীৎকার করছেন—'থাম', 'থাম'। ও কি, খাটের উপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো! কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে কি বলছে?

দূর দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—'হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ আছে আছে সব আছে, সব সত্যি।—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে আছে—'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি?'

'শুধু গয়ায়! পিণ্ডিদাদনখাঁএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয়নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।'

'তার মানে?'

'মানে, মহেশ পিণ্ডি নিলেন না, কিংবা তাকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য। মহেশ মিত্তিরের টাকাটা?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজ কিছুই হয়নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে সেই টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ ফাণ্ডের নাম কেউ করে না।' ❑





কঙ্কাল-সারথি

হেমেন্দ্রকুমার রায়

উঃ! ম্যালেরিয়ার মত ছ্যাঁচড়া অসুখ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি? উঁহু।

এই দ্যাখ না, শখ্ করে সেদিন ঢাকুরিয়ার 'লেক' দেখতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যার একটু গে। হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার জ্বর এল।

সেকি যে-সে জ্বর, যে-সে কাঁপুনি? না পারি দাঁড়াতে, না পারি বসতে, একেবারে ঘাসের পর পড়লুম শুয়ে। কি শীত রে বাপ! পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলুম।

সেই ভাবে কতক্ষণ ছিলুম, ভগবান জানেন। তবে একবার চাদরের ভিতর থেকে জুল্-ল্ ক'রে চোখ মেলে উঁকি মেরে দেখলুম, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের মেলা বসেছে, কোথাও সাড়া নেই!

বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল। কোথায় বাগবাজারে আমার বাড়ি, আর কোথায় প'ড়ে আছি, একলা। গুণ্ডায় গলায় ছুরি বসাতে পারে, সাপে কামড়াতে পারে, বিনাচিকিৎসায় প্রাণপাখি ক'রে পালিয়ে যেতে পারে! বাড়ির লোক এতক্ষণে হয়তো ভেবে সারা হচ্ছে।

আর তো এখানে থাকা চলে না! যেমন ক'রেই হোক, আমাকে আজ বাড়ি যেতেই হবে।

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের ভিতর দিয়ে তখনো যেন আগুনের ঝলক্ ছুটছে চোখের সামনে দিয়ে যেন রাশি রাশি সর্ষে ফুল নাচতে নাচতে একবার আঁধারসাগরে ডুবে যাচ্ছে, আর একবার ভেসে ভেসে উঠছে! প্রতিবার পা ফেলি আর মনে হয়, এই বুঝি আমি দড়াম ক'রে পপাত ধরণী তলে হলুম! তবু থামলুম না মাতালের মতন টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চললুম।

রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে! সেই রাত্রে আমি প্রথম বুঝতে পারলুম, পৃথিবী কত বেশী স্তব্ধ হ'তে পারে। শহরের হট্টগোলে রাগ হয় বটে, কিন্তু এ স্তব্ধতাও সহ্য করা অসম্ভব! একটা ব্যাং, কি একটা ঝিঁঝিঁ পোকা, কি একটা পাহারাওয়ালার নাক পর্যন্ত ডাকছে না, গাছের পাতায় বাতাসের একটু নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না! সারি সারি কোম্পানীর আলোর থামগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চক্ষে যেন থমথমে অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করছে! তিমির-তুলির প্রলেপ-মাখানো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির পর বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারাও যেন প্রেতপুরীর নিস্তব্ধ—তাদের ভিতর থেকে একটা ঘুমভাঙ্গা খোকার কান্নার আওয়াজ পর্যন্ত জেগে না। কে যেন আজ নিদুটির মন্ত্র প'ড়ে সমস্ত জগৎকে বোবা করে দিয়ে গেছে।

জ্বরের ঘোরে চলেছি তো চলেছিই—এই নিঃশব্দ পল্লী ছেড়ে শহরের শব্দের রাজ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে প্রাণ যেন আই-ঢাই করতে লাগল, তবু এ পথ আর শেষ হ'তে চায় না। এ পথ যেন আজও শেষ হবে না, কালও শেষ হবে না—আমাকে যেন কোন অভিশপ্ত আত্মার মতন চলতে হবে অনন্তকাল ধ'রে। এক বেচারা ইহুদীর গল্প পড়েছিলুম। কার শাপে তাকে নাকি অনন্তকাল ধরে সারা বিশ্বে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়েছিল। আমারও তাই হ'ল নাকি?

মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে ভাবলুম, দুর ছাই ; এ-সব কি উদ্ভট কথা ভাবছি? জ্বরে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মাঝে মাঝে এক-একটা মাঠ—যেন এক-একটা অন্ধকারের মায়া সরোবর! সেখান দিয়ে যেন অন্ধকারের ঢেউ বইছে, অন্ধকারের স্রোত ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করবার জন্যে অন্ধকারের তরঙ্গের ভিতর গাছগুলোকে দেখাচ্ছে যেন বড় বড় দৈত্য-দানবের মত—পথিকের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবার জন্যে তারা ওঁৎ পেতে প্রস্তুত হ'য়ে আছে! কান্না-ভরা কন্‌কনে বাতাস এসে চুপিচুপি যেন আমার কানে কানে বলে যাচ্ছে—ওহে নিঝুম রাতের অজানা মানুষ! মৃত্যুপুরীর ভিতর দিয়ে কোথায় চলেছ তুমি? আমার কথা শোনো, ভূত-প্রেতরা একে একে জেগে উঠছে, এই বেলা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, যাও গো!...

আরো খানিক অগ্রসর হয়ে মনে হ'ল পৃথিবীর সমস্ত শব্দ এসে আমার দুই পায়ের দু জুতোর ভিতর আশ্রয় নিয়েছে! প্রত্যেকবার পা ফেলি, আর সেই শব্দগুলো জুতোর ভিতর থেকে চমকে উঠে রাজপথের উপরে আছাড় খেয়ে প'ড়ে আমাকে চমকে চমকে তোলে। শব্দ শুনতে চাই, নিজের পায়ের শব্দ পাচ্ছি, কিন্তু কেন জানি না, সে শব্দ শুনে শুনে মন খুশী হবে কি, আরো বেশী নেতিয়ে পড়তে লাগল।—সে যেন রাজপথে ঘুমন্ত কোন অশরীরী প্রেতাত্মার চিৎকার, আমার পদাঘাতে সে যন্ত্রণায় গজ্‌রে উঠছে।

আঃ! এতক্ষণ পরে রসা রোডের মোড়ে এসে পড়লুম। অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ট্রামও একটা লোহার থামে ঠ্যাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলুম।

এখানটাও তেমনি নির্জ্জন ও তেমনি নিস্তব্ধ হ'লেও আমার মন যেন অনেকটা আরাম ালে। এই তো ট্রামের রাস্তা, এই পথ ধ'রে সিধে গেলেই—যত মাইল দূরেই থাক্—ামাদের পাড়া বাগবাজার পাওয়া যাবেই যাবে! খানিকদূর এগুতে পারলেই লোকজনেরও ড়া পাব নিশ্চয়, আর ট্রাম ও বাস বন্ধ হ'লেও ট্যাক্সি মেলাও তো অসম্ভব নয়।

তখন জ্বরে আমার চোখ ছল্‌ছল্ করছে, কান করছে ভোঁ ভোঁ, আর মাথা ঘুরছে বোঁ-া ক'রে! বার বার ইচ্ছে হ'তে লাগল পথের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বার জন্যে, কেবল প-মায়ের বিষণ্ণ মুখের কথা ভেবেই মনের সে ইচ্ছা দমন করলুম, অনেক কষ্টে। নিজে-জেই বললুম, মন, তুমি শান্ত হও। এই পথের শেষেই আছে তোমার বাড়ি, তোমার আত্মীয়-জন, তোমার নরম তুলতুলে বিছানা! কোন রকমে চক্ষু মুদে এই পথটুকু পার হ'তে পারলেই—স্, সকল কষ্ট সকল ভাবনার অবসান!

হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ জেগে উঠে চারিদিকের নিস্তব্ধতার মুখে যেন ভাষা দিলে! ং ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ক'রে একটা বাজ-ডাকার মত শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে—রপরেই শুনলুম ভেঁপুর আওয়াজ—ভোঁপ্, ভোঁপ, ভোঁপ্।

ট্যাক্সি, না বাস?

আহ্লাদে চাঙ্গা আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

তারপরেই দেখা গেল, নীচে দুটো আর উপরে একটা আলো। তিনটে আলো দেখেই ালুম ট্যাক্সি নয়, বাস্ আসছে!...তাহ'লে জ্বরের ধমকে আমি ভুল বুঝেছিলুম, বাস্ যখন াছে তখন রাত খুব বেশী হয়নি! কিন্তু আশ্চর্য, এরি মধ্যে এ-অঞ্চলটা এমন ভয়ানক নিস্তব্ধ য় পড়ে? বাবা, আমার কলকাতার গোলমাল বেঁচে থাক্, এ-অঞ্চলে আবার ভদ্রলোক বাস র?

কিন্তু বাসের আলো অত বেশী জ্বলছে কেন, সামনের সারা পথে সে যেন আগুনের ঢেউ য়ে ছুটে আসছে! আর এই নিরালা পথে অত-জোরে ভেঁপু বাজাবারই বা দরকার কি, এ-ঞ্চলে সন্ধ্যের পরেই ঘুমকাতুরে লোকগুলোর কানে যে তালা ধ'রে যাবে!

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ধুলোয় ধুলোয় পথ অন্ধকার ক'রে একখানা রাঙা টক্‌টকে মস্ত-া বাস আমার কাছে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে চিয়ে উঠল,—"ধর্মতলা, ওয়েলেস্‌লি, শ্যামবাজার!"

আমি তাড়াতাড়ি বাসে উঠে একখানা গদিমোড়া আসনের উপর গিয়ে ধুপ্ ক'রে বসে লুম। হোক্ শ্যামবাজারের বাস, এই স্তব্ধ মড়ার মুল্লুক থেকে এখন তো স'রে পড়ি, মবাজার থেকে বাগবাজার পায়ে হেঁটে যেতে এমন বিশেষ দেরি লাগবে না!

কিন্তু কেন জানি না, বাসের ভিতরে ঢুকেই আমার বোধ হ'ল আমি যেন এক জগৎ ছেড়ে র এক অচেনা জগতের ভিতরে প্রবেশ করলুম।

বাস ছুটছে, তার ভেঁপু বাজছে। এত বেগে বাস ছুটছে, তার জান্‌লাগুলো সব খোলা অথচ বাহির থেকে বাতাসের একটুখানি ঝলক্ পর্যন্ত আমার গায়ে লাগছে না! ভারি াক হয়ে গেলুম। আমার জ্বর কি এত বেশী উঠেছে যে দেহের অনুভব করবার ক্ষমতাটুকুও নেই?

পথ তেমনি নির্জন আর নিঃসাড়। কিন্তু বাতাসও কি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে? আমার খালি মনে হ'তে লাগল, দমবন্ধ হয়ে সারা পৃথিবী আজ মারা পড়েছে—তার কোথাও আর জীবনের লক্ষণ নেই। বেঁচে আছি খালি আমি ও এই বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টার।

আমরা তিনজন ছাড়া বাসের ভিতরেও কোন আরোহী ছিল না। থাকবেই বা কেন? এ রাতে কার ঘাড়ে ভূত চাপবে যে বাসে চ'ড়ে বেড়াতে বেরুবে!

বাসের ভেঁপু বাজছে আর বাজছে আর বাজছে। কান যে ঝালাপালা হ'য়ে গেল! কন্ডাক্টারের দিকে ফিরে বিরক্ত স্বরে বললুম, "ড্রাইভারকে বারণ ক'রে দাও। পথে লোকও নেই, গাড়িও নেই,—তবু এত 'হর্ন' বাজাচ্ছে কেন?"

লোকটা শিখ। মস্ত বড় লম্বা দেহ, মস্ত বড় দাড়ি। সে কালা আর বোবার মত আমার পানে তাকিয়ে রইল।

আবার বললুম, "শুনছ? 'হর্ন' দিতে বারণ কর।"

সে তবু জবাব দিলে না, ড্রাইভারকে হর্ন থামাতেও বললে না। লোকটা সত্যি-সত্যিই কালা ও বোবা নাকি? কিন্তু না, তাই বা হবে কি ক'রে? এই খানিক আগেই তো সে "ধর্মতলা ওয়েলস্‌লী, শ্যামবাজার" ব'লে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করছিল!

সে বোধ হয় আমার কথার জবাব দিতে চায় না। এরা কি ভেবেছে যে এদের ভেঁপুর আওয়াজে সারা শহরের ঘুম ভেঙ্গে যাবে, আর তাহ'লেই সবাই বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটে এসে বাসের প্যাসেঞ্জার হয়ে বসবে?

কিন্তু শহর জাগবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করলে না। পথের আশেপাশে লেড়ী কুকুরগুলো আরাম ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু এই বাসের সাড়া পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি উঠে, ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে পালাতে লাগল—মহা ভয়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে! আজকে বাইরের জীবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কেবল ঐ কুকুরগুলোর কাছ থেকে, কিন্তু তারাও দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে!

কুকুরগুলো কেন আমাদের বাস দেখে পালাচ্ছে? মনের ভিতর কেবল এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—কেন? কেন? কেন?

কন্ডাক্টার কেন আমার কথার জবাব দিচ্ছে না—কেন? কেন? কেন?

ড্রাইভার কেন ক্রমাগত ভেঁপু বাজাচ্ছে—কেন? কেন? কেন?

কন্ডাক্টারের দিকে ফিরে বললুম, "তোমার ভাড়ার পয়সা নাও।"

সে মস্ত একখানা কালো হাত বাড়ালে। ভাড়া দিয়ে টিকিট নেবার সময় আমার হাতে তার হাতের ছোঁয়া লাগল—উঃ, অমনি মনে হ'ল কে যে একখানা তীক্ষ্ণ বরফের ছুরি দিয়ে আমার হাতে খ্যাঁচ্ ক'রে খোঁচা মারলে! জ্যান্ত মানুষের হাত এমন ঠাণ্ডা-কন্‌কনে হয়!

আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। তার লম্বা চুল তার দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ভরা মুখখানি বাসি-মড়ার মুখের মত স্থির। তার চোখেরও পলক পড়ছে না। তার চোখ যেন পাথরে গড়া।

আমার বুকটা গুড়গুড় করতে লাগল। আজকের শহরের এই নির্জনতা, পৃথিবীর এই ঃশব্দতা, বাতাসের এই অভাব, ভাড়াটে বাসের এই ভেঁপুর আওয়াজ, কন্ডাক্টারের এই দাসীন মূর্তি—সমস্তই যেন রহস্যময়, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক!

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ির বাইরে পা দিয়েছি!

যতবার ফিরে তাকাই, ততবারই কন্ডাক্টারের সেই মড়ার মত স্থির মুখ আর পলক-হারা থুরে দৃষ্টি চোখে পড়ে! কেমন একটা অমানুষিক ভাবে আমার মনটা ছেয়ে গেল,—আর সহ্য রতে পারলুম না—সামনেব বেঞ্চের উপরে, দুই হাতেব ভিতরে মাথা রেখে চোখ মুদে আমি প ক'রে ব'সে রইলুম।—ভাবলুম, শ্যামবাজারে পৌঁছবার আগে আর মাথা তুলে চাইব না।

কিন্তু মাথা তুলতে হ'ল--আবার চোখ খুলতেও হ'ল।

আধ ঘণ্টারও বেশী সময় কেটে গেছে, গাড়িও না থেমে ক্রমাগত ছুটছে, তবু এখনো ামবাজার এলো না কেন?

মুখ তুলে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্যামবাজার তা অনেক দূরেব কথা, গাড়ি এখনো ভবানীপুরেই আসেনি। অথচ গাড়ি এত বেগে ছুটছে যে, থেব দু-পাশের বাড়িগুলো তীরের মতন পিছনে স'রে স'রে যাচ্ছে! এও কি সম্ভব?

হতভম্বেব মতন মুখ ফিরিয়েই দেখি, গাড়ির ভিতরে দশ বারো জন লোক ব'সে রয়েছে। জেব চোখকেও আমি আর বিশ্বাস করতে পারলুম না।

আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, এতক্ষণের ভিতরে গাড়ি একবারও থামেনি। তবু কোত্থেকে রা এল, কখন এরা গাড়িতে উঠল?

একে একে সকলকার মুখের পানেই তাকিয়ে দেখলুম, সব মুখই মড়ার মতন স্থির, র্বিকার, সব চোখের পাথুরে দৃষ্টিই আড়ষ্ট হয়ে আছে! কে যেন শ্মশান থেকে কয়েকটা দেহ তুলে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপরে সারি সারি বসিয়ে দিয়ে গেছে!

তাদের ভিতরে বাঙালী আছে, খোট্টা আছে, সায়েব আছে। কিন্তু তারা সবাই চেয়ে ছে আমার দিকেই। সে চাউনিতে কোন ভাবের আমেজ নেই, সে চাউনি যেন চাউনিই -অথচ সে চাউনি দেখলেই গা ছম্‌ছম্ করে, দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়! তাদেব চাউনি ন চোখের ভিতর দিয়ে আসছে না,—আসছে আলোকের ওপার থেকে, অন্ধকারের আত্মাব তর থেকে, যে দেশে জ্যান্ত মানুষ নেই সেই দেশ থেকে! ভাবহীন অথচ ভয়ানক তাদের ই চাহনি!

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, গাড়ির ঝাঁকুনিতেও তাদের কারুর দেহ এতটুকুও ছে না! গাড়ির ভিতরে ব'সেও তাদের দেহ যেন গাড়িকে না ছুঁয়ে শূন্যে বিরাজ করছে! মনে তে লাগল, আমার অজ্ঞাতসারে যেমন হঠাৎ তারা গাড়ির ভিতরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, মনি হঠাৎ তারা আবার হাওয়া হ'য়ে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে পারে, আমার অজান্তেই। তারা ছায়ার কায়াহীন অনুচর—দেখা দেয়, ধরা দেয় না। তাদের দেখা যায়, ধরা যায় না।

আমার সভয় দৃষ্টি আবার পথের দিকে ফিরিয়ে নিলুম। গাড়ি তেমনি হেঁচকি-তোলা ওয়াজের মতন ভেঁপুর শব্দ করতে করতে তীরবেগে ছুটছে—কিন্তু তখনো ভবানীপুর আসে ! আমি শ্যামবাজাব না সোজা যমালযেব দিকে চলেছি?

কি এক দুঃসহ অজানা টানে অস্থির হয়ে চোখ আবার গাড়ির ভিতরে ফেরালাম। গাড়ি ইতিমধ্যে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে উঠেছে—তারাও স্থির নেত্রে আমার দিকে তাকি আছে।

সমস্ত গাড়ির ভিতরে—একটা বোঁটকা গন্ধ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন বাসি মড় গন্ধ। হাসপাতালে মড়ার ঘরে গিয়ে আমি একবার এই রকম গন্ধই পেয়েছিলুম!

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিলে, বুকের কাছটা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল—আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

আর থাকতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "এই কন্ডাক্টার গাড়ি বাঁধো!"

কন্ডাক্টার কোন সাড়া দিল না, গাড়ি থামাবারও চেষ্টা করলে না।

আবার বললুম, কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

.রেগে দাঁড়িয়ে উঠে কন্ডাক্টারের দেহ ধ'রে আমি নাড়া দিতে গেলুম—কিন্তু তাকে ছুঁতে পারলুম না! চোখের সামনে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারছি না-সে দেহ যেন হাওয়া দিয়ে তৈরি!

হঠাৎ গাড়ির সব লোক একসঙ্গে অট্টহাস্য শুরু ক'রে দিলে! সে অদ্ভুত বীভৎস হা আসছে যেন অনেকদূর থেকে, অনেক আকাশ-বাতাস ভেদ ক'রে অনেক সমুদ্র-পাহাড়-প্রা পার হয়ে, অনেক নরকের অন্ধকারে ডুব দিয়ে—অথচ তার আওয়াজ এত স্পষ্ট যে, আমা কান যেন ফেটে যাবার মত হ'ল!

আমি পাগলের মতন চীৎকার করে বললুম, "গাড়ি থামাও, জলদি গাড়ি থামাও,—এ ড্রাইভার!"—গাড়ি থামানো ঘণ্টার দড়ি ধ'রে আমি ঘন ঘন নাড়তে লাগলুম!

ড্রাইভার এতক্ষণ পরে আমার দিকে মুখ ফেরালো—সে মুখে এক তিলও মাংস নে সে মুখ সাদা ধব্‌ধবে হাড়ের মুখ—নাক-চোখের জায়গায় তিন-তিনটে গর্ত, দু-ঠোঁটের জায়গ দু-সারি দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতক্ষণ তবে এই পোশাকপরা কঙ্কালটাই গাড়ি চালিয়ে আসছে?

গাড়ির ভিতরে অট্টহাসির আওয়াজ আরো বেড়ে উঠল!

আর সইতে পারলুম না—সেই ভীষণ অট্টহাসি শুনতে শুনতে আমি একেবারে অজ্ঞ হয়ে গেলুম।

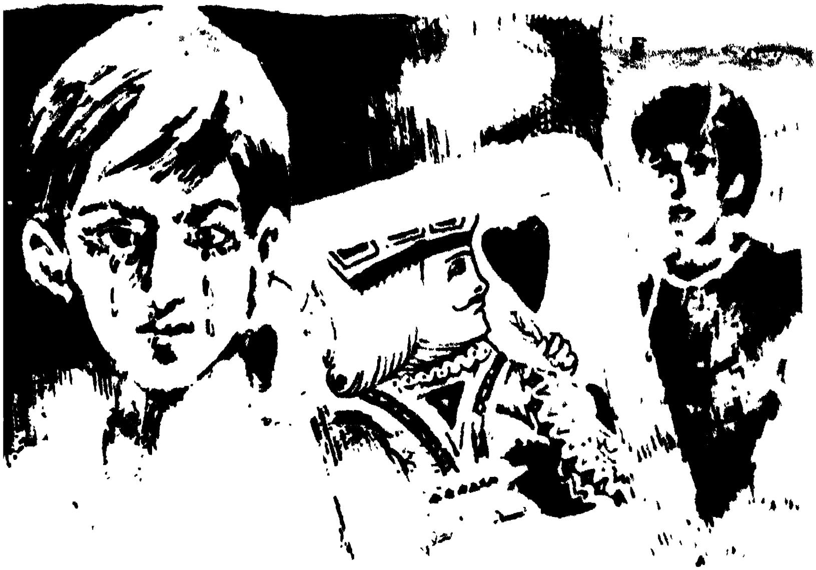
জ্ঞান হ'লে দেখলুম, নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার চারপাশে ব'সে মা, বা ভাই আর বোনেরা।

শুনলুম, আমি নাকি রসা রোডের ফুটপাথের উপর জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হয়ে শুয়েছিলু

কালকের রাতের বিভীষিকার কথা সকলকে বললুম।

বাবা বললেন, "ও-সব বাজে কথা! জ্বরের ঝোঁকে লেকের ধার থেকে রসা রোড প এসেই বেহুঁস্ হ'য়ে প'ড়েছিলে। তারপর এই সব খেয়াল দেখেছ।"

কিন্তু আমার মন বলতে লাগল—না, না, আমি যা দেখেছি তা খেয়াল নয়, খে



হরতনের গোলাম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প ;—বোধ হয় বারো-তেরো।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিনু, বিনু ছিল আমার সব-চেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগতনা। আমাদের পাশেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলা-ধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে ; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিততে পারিনি;—সে বরাবর আমার চেয়ে বেশী খেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হতো

আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশী কোরে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিলনা। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালো বাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ কোরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদরবাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নীচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানিনা ; এ বাড়ি যখন জম্‌জমাট ছিল, তখন হয়তো কর্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বসবাস করত। এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়েনা—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই-বন্ধুর ভারি মনের মতো ঘর ছিল;—এর মধ্যে বাড়িব ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌঁছতে পারতনা ; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে, নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গল্‌গল্‌ করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে—বিনু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিলনা—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ কোরে এনেছিল—বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা ছিল খুবই পুরানো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচাবা ওস্তাদ খেলোয়াড়ের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচাবাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন্ গুরুতর অপরাধে তাব কান-গুলো যে এমন নির্দয়-ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন্ পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত। সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম ;—আস্তে আস্তে তুলতুম, আস্তে আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আল্‌গা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বল্‌ছি, এই তাস্‌কে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝক্‌ঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হতো—এরা যেন এক-কালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না ; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দরোয়ান এ! এর ফোঁটাওয়ালা তাসগুলোও যে কেমন-এক-রকমের। এক-একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপ্‌সা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুট্‌কিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হতো আমি যেন তাদের ঐ ফুট্‌কিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে-যেন কতকালের আগেকার কোন্‌খানে:—যারা অনেক-কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে সব দেখে শুনে কেমন

তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বল্‌তো—"কি বসে-বসে ভাবছিস?—খ্যাল্ না!" আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা-হোক-একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছম্‌ছম্ করতে থাকতো। মনে হতো এ নিশ্চয় যাদুকরা তাস!

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলত রে বিনু?" বিনু বলেছিল—"শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন। কেউ নাকি তাঁকে তাসখেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে কোরে বলতো, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ-করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাস।" বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি। তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো! উঃ, তাহলে না-জানি তিনি কত বুড়ো! এ সেই আদ্যিকালের-বদ্যিবুড়োর হাতের গুণ-করা তাস! এ-তাস ছুঁতে বুক ছম্‌ছম্ করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতুম বিনুর দেওয়া এই তাসজোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলতো। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বোলে সে প্রায়ই হাসতে-হাসতে বল্‌তো—"জানিস্ মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ-করা তাস। এ-তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না;—তুইও না!"

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গোরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলতো—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো-কোরে; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকতো—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠতো, সঙ্গে-সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠতো। একে-একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসতো। চৌধুরী-বাড়ির দো-তলার জানালা থেকে যে এক-ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়তো, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত; গলির ফাঁকটা ভরাট্ হয়ে উঠতো—জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্ খটাস্! খট্ খটাস্! তারপরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাৎরে উঠতো—কেঁই-কেঁই! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কাল্‌প্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্ হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্ছাগুলোকে সাবধান কোরে দিত। এবং মাঝে-মাঝে ফট্‌ফট্ কোরে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত! ঐ বুঝি সে এলো! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামতো না। বিনু ধমক দিয়ে বল্‌তো—"কি করছিস্? খ্যাল্ না!" তার এই ধমকানিতে আমার চট্‌কা ভাঙতো। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে-ভয়ে চুপ কোরে যেত। তা যদি না হতো তাহলে বোধহয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতুম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়বৃষ্টি এলো। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উল্টে-পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো

উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বল্লে—"মন্নি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে!" আমি উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড কোরে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম—কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম্। আশ্চর্য কাণ্ড! যা কখনো হয়নি, তাই হলো। বিনুও অবাক। সে একটু বেশী কোরে মন দিয়ে খেলতে বস্‌লো। কিন্তু পরের বাজীও জিততে পারল না। আমার কেমন সন্দেহ হলো—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই, প্রতিবারই এমন তাস আসছিল যে খেল্লেই পিঠ পাওয়া যায় ; কে যেন ম্যাজিক করে ভালো-ভালো তাসগুলো বেছে-বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—"আজ আমার পড়তা খারাপ পড়লো দেখছি!" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজলো! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগলো—"আমি জিত চাই না বিনু জিতুক।" আমি ফন্দি কোরে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকপাঁক করতে লাগলুম ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আজকের ঐ ঝড়ে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

বিনু ফেল্লে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেল্লুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময়ে দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে, কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হলো। পরের হাতে আমি খেল্লুম চিড়ের দশ ; আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে ; বিনু ফেল্লেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দুই ফোঁটা চুরি কোরে কেমন কোরে যে আট হয়ে গেল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক ; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড় বড় চোখ-দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বোলে মনে হতে লাগলো। সে-বারের খেলাতে হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত কোরে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিমঝিম্ কোরে এলো।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম—"ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুল্লে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো মনে হলো বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে ; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে ;—এর দরজা-জানলা ইঁট-কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়ি কাঠের খোপে-খাপে চড়াই পাখীগুলো গল্প শেষ কোরে শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। আমিও তার সঙ্গে দুলতে লাগলুম—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।

হঠাৎ চট্‌কা ভাঙলো চৌধুরি-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—টং। সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌স্‌স্‌।—হুউউস্‌স্‌! আমি চম্‌কে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ও কিসের শব্দ ভাই?"

বিনু কথা কইলে না; শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়ি কাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হলো তার সেই ড্যাব্‌ডেবে চাহনিটা চোখ-থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইলো—জ্বল্‌ জ্বল্‌ কোরে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বললুম—"ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

বিনু বল্‌লে—"আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।" আমি চম্‌কে উঠলুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিনুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে?

কোনো রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার, আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখকান ঢেকে ফেলি। আমি চোখের খুব কাছে তাস এনে এক-মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি-করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বোলে উঠলো সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—"গোলামটা আছে তো?"

ভয় হলো ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাসের সারি থেকে চট্‌-কোরে হরতনের গোলাম তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই; বিনুও নেই। অ্যাঁ।

বুকটা ধক্‌ কোরে উঠলো।

এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই।

বো করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা-হাত-পা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে লাগলো; ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল্‌খিল্‌ শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরে নহবৎখানা থেকে ঢাক-ঢোল, কাঁসি-বাঁশি সব একসঙ্গে বেজে উঠলো। আমি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হলো আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আল্‌গা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগলো—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল? উপর থেকে ভাঙা কাঁসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগলো—কৈ না না! কৈ না না! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম—বিনু, বিনু! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে ঘুরতে, গোঁ-গোঁ-শব্দে।

একবার আশা হলো বিনু হয়তো বাইরে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে কোরে

দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনিই আছে। তবে? তবে সে কেমন কোরে বাইরে গেল?

হঠাৎ মনে হলো বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো!

কিন্তু কোথায় লুকোবে? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পিছনে বড়জোর আঙ্গুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারেনা। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোণ ওকোণ, এধার ওধার প্রদীপ ধোরে দেখলুম তন্ন তন্ন কোরে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই।

৩

কতক্ষণ পড়ে পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই, কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; যেন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। চৌধুরিদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হলো রে, কি হলো? কোথায় গেল?" পশ্চিম-কোণের ঢ্যাঙা সুপুরিগাছটা কিছু না বোলে শুধু ডিঙি-মেরে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখী তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বোলে উঠলো—"আ হা হা!" অমনি আমার বুকের ভিতরটা কোরে উঠলো—"আহাহা। বিনুকে ওরা ভেল্‌কিবাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!"

ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে একে মুছে আসতে লাগলো, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো ; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালেতালে!

তারপর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা-পথ ধোরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম ; হঠাৎ কানে এলো তাস পেটার শব্দ—চটাস্‌-চটাস্‌! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল ; আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম-কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা-ছম্‌ছম্‌ করে, সে জন্য এদিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূত-প্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না ;—ঝাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কত কালের তা কেউ জানে না ;—বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হতো—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর ; সামনে মোটা-মোটা লোহার গারদ-

দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টে পৃষ্টে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মতো ঘুরচে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়নি। কারণ বহুদিন হলো আমাদের সে জমিদারী নেই ; তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি দাদামশাই ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা কোরে চলতেন। লোকে টাকা খরচ কোরে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যকের হাতে সমর্পণ কোরে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যকের কাহিনী একটা মস্ত বড় গল্প! কেমন কোরে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেল্‌নার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি কোরে আনা হয়, কেমন কোরে তাকে লাল চেলির গরদ পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ঐ অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর-কিছু নেই, আর-কেউ নাই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তারপর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশমন পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুঁজিয়ে দেওয়া হয়, সে খাত শুনতে-শুনতে আমার চোখে জল আসতো—বুক দুর দুর করতো ; আর ঠাকুরদাদার, সেই পাষণ্ড ঠাকুরদার উপর রাগ হতো। ঠাকুরমা বলতেন—"আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা কোরে বুক-ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছট্‌ফট্ করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসতো। তারপর ক্ষিধে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে-কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যক হয়ে আছে—ঐখানে বসে বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে হয়নি ; মেঝের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল ; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হলো, কেউ জানে না, তিনি নিজেও কিছু বলেননি ; কারো সাহসও হয়নি—জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হলো ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাসখেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুর্‌দুর্ করতে লাগলো, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না ; যদি সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদ-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকলদিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা

গেল না' কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম্, দুম্, দুম্! আমার কেমন মনে হলো যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যকের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি এক-মনে এদের লড়াইয়ের তাল শুনছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলুম। সে বল্‌ছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠলো—'দূর বোকা, তা কখন হয়? গোলাম হলো সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম ; হলোই না হয় সে রং মেখেছে!"

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম—"গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?" বিনু বলেছিল—"এই রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—"তুই কিছু খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।" বিনু আমায় ডাকতো মল্লি বলে।

মনে হলো, আমার যখন নাম করেছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু। বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলিব্যাকুলি করতে লাগলো, কিন্তু পারলুম না। ভয় হলো, পাছে ঐ দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ-কোরে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—"অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি।

বিনু বলে উঠলো—"হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।"

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যই তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বোলে উঠলো—"কৈ হ্যা—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে আও!"

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার ঘরে পালিয়ে এলুম।

৪

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধ্বক্-ধ্বক্ করতে লাগলো—এই বুঝি সে এসে আমায় জাপ্‌টে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এলোনা, তারপর কে একজন খস্‌খস্ শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি,

এমন সময় কে আবার তড়াক-ক'রে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠলো। আমি ভয়ে কাঠ। যে এলো, সে খানিক বিছানার এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকে-শুঁকে বেড়াতে লাগলো, তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগলো—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম. কিছুতেই মুখ খুল্‌তে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিঃশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এলো। আমার পা ধোরে হিড়-হিড় কোরে টেনে নিয়ে যাবে না ত? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ কোরে রইলো, বোধ হয় কি ভাবলে. তারপর আমার পাশে এসে ধুপ-কোরে শুয়ে পড়লো। সর্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক কোরে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙ্গে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এলো—তাহ'লে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ঐখানে—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কি কোরে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ সে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—"মল্লি, ভাই মল্লি! বিনুর কাছে যাবে? বিনুর কাছে।"

আমি ধড়মড় কোরে উঠে বসলুম—বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠলো ; কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগলো—যদি আর ফিরে আসতে না পারি?

সে তখন বল্লে—"ভয় কি। চল না! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিনুর কান্নার কথা শুনে বুক ফেটে যেতে লাগলো। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্‌তে লাগলুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও, বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।"

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশী ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দরোয়ান ছিল—ঠাকুরদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প-অল্প তার চেহারা মনে পড়ে ; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি কোরে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগতো সে রসমুণ্ডি! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হলো, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি-হাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি-বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি কোরে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল ; ঘরের ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করতে করতে কতদূর চলে গেল, মনে মধ্যে কত ভাবনা এলো গেল—তবু বিনু এলোনা। হায়, সে কি আর আসবে? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার কোরে আনবে? ভাবতে ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগলো, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগলো, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে। আর অমনি এক-

নিমিষে মনে হলো, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে-ভেসে!

তাসখানা ভাসতে ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক-মনে তাস খেল্‌ছে ; বিনু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা-থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিনুর ছোট ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগলো, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হলো—হিংসেও হলো। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব! আমি মুখ গোঁ-করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"এ কে, বিনু?"

বিনু গম্ভীর গলায় বললে—"ও মল্লি!"

সে বল্‌লে—"বেশ হলো ; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব।"

আমি রাগে চীৎকার কোরে উঠলুম—"না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে কোরে তুলে নিলে। বিনু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল্-খিল্ কোরে হেসে উঠলো।

বিনু বললে—"দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাব"—বোলে ছেলেটির কানে-কানে কি বললে। ছেলেটি বললে—"চল, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ কোরে পড়ে গেল। দিন-রাত এক জায়গায় বসে থেকে-থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে কোরে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাসগুলোকে কি বল্লে, তারা ফর্-ফর্ কোরে উড়ে এসে পাখীর মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। আমরা উড়তে যাচ্ছি এমন সময় কড়িকাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ!—আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি। আমি ভয়ে ঠক্‌ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ-আটকে দাঁড়ালো!—যেন আমরা পালাতে না পারি! ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লে—"বিনু, দেখেছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না! তোরা কেন প্রাণে মরবি? পালা!"

বিনু বল্লে—"না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।" চামচিকে-দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস কোরে উঠলো। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে : চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালালো। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। আমি তাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলুম—"বিনু, আয় আয়!" বিনু আমার দিকে ফিরেই চাইলো না ; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো। আমার কান্না পেতে লাগলো। তাসগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হলো জানি না।

৫

"মল্লি! মল্লি!"

আমি ধড়মড়-কোরে উঠে বসলুম। ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গল। আমি ছুটে গিয়ে দু-হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলুম,—"বিনু এসেছিস ভাই, এসেছিস?"

সে বল্লে—"আসব না ত কি। তুই স্টুপিড্ এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন?"

আমি বল্লুম—"কখন্ এলি ভাই।"

সে বল্লে—"অনেকক্ষণ। তোকে ডেকে-ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ য়েছে কি? চোখ অমন রাঙা কেন?"

আমার ধাঁধা লাগলো। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?

আমি আমতা-আমতা কোরে বল্লুম—"কাল রাত্রে এই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন মন্তর্ধান—"

সে বাধা দিয়ে বল্লে—"আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব? তুই তো খেলা ফেলে চোখ ছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।"

আমার আরো ধাঁধা লাগলো। এ কি ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম। কিন্তু এত য় কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বোলে হেঁয়ালিটা বিষ্কার কোরে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে াগলো যে বল্‌তে লজ্জা হলো। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে!

বিনু বল্লে—"কি ভাবছিস? চল বাইরে যাই।"

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো; মস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত! তাদের বুকের উপর কে যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের-পর-আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড য়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বল্লুম—"বিনু দেখছিস।"

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমারই জন্যে তাসগুলো গেল!"

"আঁ। তোমারই জন্যে? তার মানে।—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে? তা হলে তো সবই ঠিক।"

কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইসারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"কি কোরে এমন হলো বিনু?" বিনু কোনো জবাব দিলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা-আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আল্‌মারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফর্‌ফর্ কোরে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ডানা-মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধ হয় টেবিল তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বল্লে—"তাসগুলো কুড়ো।"

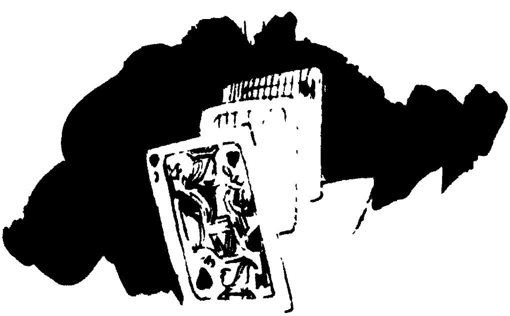
আমি তাসগুলো কুড়িয়ে গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম।

তবে?

এই তো ঠিক মিলছে। সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রের ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন? সে গেল কোথা?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে—সেই চারিদিক-বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয়-বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে; সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা' হলে আমিও হয়ত সব ভুলে যেতুম; আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো, হরতনের গোলাম-বেচারা গেল কোথায়? ❑





গঙ্গাধরের বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলে। সে সময় মসলাপোস্তায় গঙ্গাধর কুণ্ডুর ছোট-খাটো একখানা মসলার দোকান ছিল।

গঙ্গাধরের দেশ হুগলী জেলা, চাঁপাডাঙ্গার কাছে। অনেকদিনের দোকান, যে সময়ের কথা বলচি, গঙ্গাধরের বয়েস তখন পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু শরীরটা তার ভাল যাচ্ছিল না। নানারকম অসুখে ভুগতো প্রায়ই। তার ওপর ব্যবসায়ে কিছু লোকসান দিয়ে লোকটা একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। দোকানঘরের ভাড়া দুমাসের বাকী, মহাজনের দেনা ঘাড়ে—দুপুরবেলা দোকানে বসে থোলো হুকো হাতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিল। আজ আবার সন্ধ্যার সময় গোমস্তা আসবে ভাড়া নিতে বলে শাসিয়ে গিয়েচে। কি বলা যায় তাকে।

এক পুরানো পরিচিত মহাজনের কথা তার মনে পড়ে গেল। তার নাম খোদাদাদ খাঁ, পেশোয়ারী মুসলমান, মেটেবুরুজে থাকে। আগে গঙ্গাধরের লেনদেন ছিল তার সঙ্গে। কয়েকবার টাকা নিয়েচে, শোধও করেচে—কিন্তু সুদের হার বড় বেশী বলে ইদানীং বছর-কয়েক গঙ্গাধর সেদিকে যায়নি।

ভেবে চিন্তে সে মেটেবুরুজেই রওনা হোলো। সুদ বেশী বলে আর উপায় কি? টাকা না আনলেই নয় আজ সন্ধ্যার মধ্যে।

মেটেবুরুজে গিয়ে খোদাদাদ খাঁয়ের নতুন বাসা খুঁজে বার করতে, টাকা নিতে, গল্প-গুজব করতে দেরি হয়ে গেল। খিদিরপুরের কাটিগঙ্গা পার হয়ে এসে ট্রাম ধরবে, হন্‌হন্ করে হেঁটে আসচে—এমন সময় একজন লোক তাকে ডেকে বল্লে—এ সাহেব, ইধার শুনিয়ে তো জরা—

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে। যেখান থেকে লোকটা তাকে ডাকলে সেখানে কতকগুলো গাছপালায় বেশ একটু অন্ধকার। স্থানটা নির্জন, তার উপর আবার তার সঙ্গে রয়েছে টাকা। গঙ্গাধরের মনে একটু সন্দেহ যে না হোল এমন নয়। কিন্তু উপায় নেই। লোকটা এগিয়ে এল। ওই গাছগুলোর তলায় সে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

লোকটা খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল ঘাড়ের ওপর পড়েচে, মুখটা ভাল দেখা যাচ্চে না। পরণে ঢিলে ইজের ও আলখাল্লা। সে কাছে এসে সুর নীচু করে হিন্দীতে ও ভাঙ্গা বাংলায় মিলিয়ে বল্লে—বাবু, সস্তায় মাল কিন্‌বেন?

গঙ্গাধর আশ্চর্য হয়ে বল্লে—কি মাল?

লোকটা চারিদিকে চেয়ে বল্লে—এখানে হবে না বাবু, পুলিশ ঘুরচে, আমার সঙ্গে আসুন।

ঝুপ্‌সি গাছের তলায় এক জায়গায় অন্ধকার খুব ঘন। সেখানে গিয়ে লোকটা বল্লে—জিনিসটা কোকেন। খুব সস্তায় পাবেন। ডিউটি-ছুট্ মাল—লুকিয়ে দেবো।

গঙ্গাধর চম্‌কে উঠ্‌ল।

সে কখনো ও ব্যবসা করেনি। ডিউটি-ছুট কোকেন—কি সর্বনেশে জিনিস! ভাল লোকের পাল্লায় পড়েচে। না—সে কিন্‌বে না।

লোকটা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী মুসলমান। বাংলা বলতে পারে—তবে বেশ একটু বাঁকা। সে অনুনয়ের সুরে বল্লে—বাবু, আপনি নিন্। আপনার ভাল হবে। সিকি কড়িতে দেবো—আমার মুশকিল হয়েচে আমি মাল বিক্রীর লোক খুঁজে পাচ্চিনে। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি কত জায়গায়—আবার সব জায়গায় তো যেতে পারিনে, পুলিশের ভয় তো আছে। কেউ কথা কইচে না আমার সঙ্গে. সেই হয়েছে আরও মুশকিল। হঠাৎ শহরে এত পুলিশের ভয় হোল যে কেন বাবু তা বুঝিনে—আগে যারা এ ব্যবসা করতো, তাদের কাছে যাচ্চি। তারা আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌চে না। আপনি গররাজি হবেন না বাবু—মাল দেখুন, পরে দামদস্তুর হবে।

লোকটার গলার সুরে একটা কি শক্তি ছিল, গঙ্গাধরের মন খানিকটা ভিজ্‌ল। কোকেনের ব্যবসাতে মানুষে রাতারাতি বড় মানুষ হয়েচে বটে। বিনা সাহসে, বিপদ এড়িয়ে চলে বেড়ালে কি লক্ষ্মীলাভ হয়? দেখাই যাক না।

হঠাৎ গঙ্গাধর চেয়ে দেখ্‌লে যে লোকটা নেই সেখানে। এই তো দাঁড়িয়ে ছিল, কোথায় গেল আবার? পাছে কেউ শোনে, এই ভয়ে বেশী জোরে ডাক্‌তেও সাহস পেল না। চাপা গলায় বাঙ্গালী হিন্দীতে ডাক্‌লে—কোথায় গিয়া ও খাঁ সাহেব? এদিকে ওদিকে চাওয়ার পর সাম্‌নে চাইতেই দীর্ঘাকৃতি আলখাল্লাধারী খাঁ সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখা গেল। গঙ্গাধর বল্লে—জলদি বলো, রাত হো গিয়া। অনেক দূর যানে হোগা।

কি একটা যেন ঢাক্‌বার জন্য লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করচে। বল্লে—আমাব সঙ্গে এসো, মাল দেখাবো।

দুজনে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে অনেকদূর গেল। যে সময়ের কথা বল্‌চি, তখন ওদিকে তত লোকজন ছিল না। মাঝে মাঝে জোয়ার নেমে যাওয়াতে বড় বড় ভড় ও নৌকা ডাঙায় কাদার ওপর পড়ে আছে, দু-একটা করাতের কারখানা, তাও দূরে দূরে—জলের ধারে নোনা চাঁদা কাঁটার বন পেছনে অনেকদূরে খিদিরপুর বাজারের আলো দেখা যাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে খাঁ সাহেব একটা বড় অদ্ভুত প্রশ্ন করলে। গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বল্লে—আমায় দেখ্‌তে পাচ্চ তো?

—কেন পাবো না? এমন বয়েস এখনও হয়নি যে এই সন্দেবেলাতেই চোখে ঠাওর হবে না।

একবার গঙ্গাধর জিগ্যেস করলে—তোমার ডেরা কোথায় খাঁ সাহেব?

লোকটা চকিতে পিছন ফিরে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কেন, সে তোমার কি দরকার? পুলিশে ধরিয়ে দেবে ভেবে থাকো যদি, তবে ভাল হবে না জেনো। মাল দেবো, তুমি টাকা দেবে—মাল নিয়ে চলে যাবে—আমার বাসার খোঁজে তোমার কি কাজ?

লোকটার চোখের চাউনি কি অদ্ভুত! গঙ্গাধর অস্বস্তি বোধ করলে। মুখ ভালো দেখা যায় না—কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ইস্পাতের ছুরি ঝল্‌সে উঠল। না, সঙ্গে তার টাকা রয়েচে, এ অবস্থায় একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল লোকের সঙ্গে একা এই সন্ধ্যাবেলাতে সে এতদূর এসে পড়েচে? লোভে মানুষের জ্ঞান থাকে না—তার ভেবে দেখা উচিত ছিল ; কিন্তু যখন এসেইচে, তখন আর চারা নেই। বিশেষতঃ সে যে ভয় পেয়েচে এটা না দেখানই ভালো। দেখালে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কম্‌বে না! ছুরি বার করে বসলে তখন আর উপায় থাকবে না।

অনেক দূরে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা গুদামঘর। একটি গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, গুদামঘরের দরজা থেকে একটু দূরে ; তার ওপর গঙ্গাধরকে বসতে বলে লোকটা কোথায় চলে গেল। গঙ্গাধর বসে চারিধারে চেয়ে দেখ্‌লে গুদামঘরের আশেপাশে সর্বত্র আগাছার অনুচ্চ জঙ্গল, নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

অন্ধকার হোলেও মাঠের মধ্যে বলে অন্ধকার তত ঘন নয়—সেই পাতলা অন্ধকারে চেয়ে দেখে গঙ্গাধরের মনে হোল গুদামঘরটা পুরানো এবং যেন অনেককাল অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। বাঁশের বেড়া খসে পড়েচে, জায়গায় জায়গায় চালের খোলা উড়ে গিয়েচে, মাঝে মাঝে সাম্‌নের দোরটা উই-ধবা, ভেঙে পড়তে চাইচে যেন।...

গঙ্গাধরের কেমন একটা ভয় হোল। কেন সে এখানে এল এই সন্ধ্যায়? এরকম জায়গায় একটা মানুষে আসে বিশেষ করে এতগুলো টাকা সঙ্গে ক'রে? সে আসত না কখনই, সে কলকাতায় আজ নতুন নয়, তার ওপরে ঝুনো ব্যবসাদার, বাঙ্গাল দেশ থেকে নতুন আসেনি। কিন্তু ওই লোকটার কথার সুরে কি যাদু আছে, গঙ্গাধরকে যেন টেনে এনেচে, সাধ্য ছিল না যে সে ছাড়ায়। একথা এখন তার মনে হোল।...

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে খাঁ সাহেবের মূর্তি দেখা গেল। লোকটার যাওয়া-আসা এম নিঃশব্দ ও এমন অদ্ভুত ধরনের যেন মনে হয় অন্ধকারে ওর চেহারা মিলিয়ে গিয়েছিল, আবা ফুটে বেরুল। কোথাও চলে যে গিয়েছিল, এমন মনে হয় না। পাকা ও ঝুনো খেলোয়াড় আ কি!

খাঁ সাহেব দোর খুলে গুদামঘরে ঢুকল। গঙ্গাধরকেও যখন পেছনে পেছনে আস বলল তখন ভয়ে গঙ্গাধরের হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করচে, বুক টিপটিপ করচে। এই অন্ধকা গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঠিক ও লোকটা ওর ওই লম্বা হাতে গলা টিপে ধরবে কিং ছুরি বুকে বসাবে—সেই ফন্দিতে এতদূর ভুলিয়ে এনেচে। লোকটা নিশ্চয়ই জানত যে তা কাছে টাকা আছে, সন্ধান রেখেছিল। কে জানে খোদাদাদ খাঁয়ের দলের লোক কিনা গঙ্গাধরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। একবার সে ভাবলে দৌড়ে পালাবে? কিন্তু বুড়ো মানুষ, এই জোয়ান পাঞ্জাবী মুসলমানের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তার পক্ষে পেরে ও অসম্ভব।

কলের পুতুলের মত গঙ্গাধর গুদামের মধ্যে ঢুকল। আশ্চর্য! গুদামের ওদিকের দেওয়াল যে একেবারে ভাঙা! গুদামের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে সেই অস্পষ্ট অন্ধকার। এক জায়গায় দু খালি পিপে ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মাকড়সার জাল সর্বত্র, অন্ধকারে দেখা যায় না বটে, কি নাকে-মুখে লাগে। একটা কি রকম ভ্যাপ্‌সা গন্ধ গুদামের মধ্যে, মেজেটা স্যাঁতসেঁতে, কতকা এর মধ্যে যেন মানুষ ঢোকেনি।

এদিকে আবার খাঁ সাহেব কোথায় গেল? লোকটা থাকে থাকে যায় কোথায়?

অল্পক্ষণ—মিনিট দুই হবে—কেউ কোথাও নেই, শুধু গঙ্গাধর একলা—আবার সে ভয়টা হোল। কেমন এক ধরনের ভয়—যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে। এই বা কি রক ভয়? আর গুদামঘরটার মধ্যে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা স্রোত বইচে মাঝে মাঝে

মিনিট-দুই পরেই খাঁ সাহেব—এই তো আধ-অন্ধকারের মধ্যে সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে।..

হঠাৎ আবার একটা অদ্ভুত কথা বল্লে খাঁ সাহেব। বল্লে—তুমি কালা না কি? এত কথা বলচি, শুন্‌তে পাচ্চ না? কথার উত্তর দিচ্চ না কেন? কোকেন যে জায়গায় বল্লাম—তা দেখ্‌তে পেয়েচ? শাবলের চাড় দিয়ে তুলতে বল্লাম—পিপে দুটা।

হাঁ করে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বা রে! এত কথা কখন বলেচে লোকটা? পাগ নাকি? গঙ্গাধর কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েচে, মূঢ়ের মত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—কখন তুমি দেখালে কোকেনের জায়গা—কই কোথায় শাবল? কথা বল্‌তে বল্‌তে গঙ্গাধর সম্মুখস্থ সাহেবের মুখের দিকে চাইলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হোল তার বিভ্রান্ত, বিমূঢ়, দৃষ্টির সাম্‌নে খাঁ সাহেবের মুখ, গলা, বুক, হাত-পা সারা দেহটা যেন চুরচুর হয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়চে—সব যেন ভেঙে ভেঙে বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্চে—খাঁ সাহেব প্রাণপণে দাঁ মুখ খামুটি করে বিষম মনের জোরে তার দেহের চূর্ণায়মান অণুগুলো যথাস্থানে ধরে রাখ জন্যে চেষ্টা করচে! কিন্তু পেরে উঠচে না..তার চোখে রসে বিজিত, হতাশ দৃষ্টি গঙ্গাধ হৃদয় স্পর্শ করলে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অত বড় দীর্ঘাকৃতি দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট রা না...সব ভেঙে গেল, গুঁড়িয়ে গেল, উড়ে গেল...এক...দুই.. তিন...চার...

আর কোথায় খাঁ সাহেব? চারি পাশের অন্ধকারের মধ্যে সে মিলিয়ে গিয়েচে—একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের ঝাপ্‌টা এল কোথা থেকে, সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর আর্তরবে চীৎকার করে গুদাম ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝের ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে গেল।

একটা দিশী ভড় কাছে কোথায় বাঁধা ছিল, তার মাঝিরা এসে গঙ্গাধরকে অচেতন অবস্থায় তাদের ভড়ে নিয়ে যায়। তারাই তাকে দোকানে পৌঁছে দেয়। গঙ্গাধরের টাকা ঠিক ছিল, কানাকড়িও খোয়া যায়নি। তবে শরীর ওধরে উঠতে সময় নিয়েছিল, অনেকদিন পর্যন্ত অন্ধকারে সে একা কিছুতেই থাকতে পারত না।

মাস-দুই পরে মেটেবুরুজের খোদাদাদ খাঁর কাছে টাকা শোধ দিতে গিয়ে গঙ্গাধর, টাকা নিয়ে যাবার দিন কি ঘটেছিল সেটা বল্‌লে। খোদাদাদ গল্প শুনে গম্ভীর হ'য়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—সাহজী, ও হোলো আমীর খাঁ। চোরাই কোকেনের খুব বড় ব্যবসাদার ছিল। আজ বছর-পনের আগেকার কথা, রমজান মাসে বেশ কিছু মাল হাতে পায়। তক্তাঘাটের কাছে একখানা জাহাজ ভিড়েছিল, সেখান থেকে রাতারাতি কোকেন সরিয়ে ফেলে, জাহাজের লোকের সঙ্গে সাড় ছিল। কোথায় সে মাল রাখ্‌ত কেউ জানে না। সেই মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ সে খুন হয়। কেন, বা কে খুন করলে জানা যায়নি, কেউ ধরাও পড়েনি। তবে দলের লোকেই তাকে খুন করেছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। এই পর্যন্ত আমীর খাঁর ঘটনা আমি জানি। আমার মনে হয়, আমীর খাঁ সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মাল বিক্রী করার জন্য, ওর লুকানো কোকেনের বাক্স হয়েছে দোজখের বোঝা। তা বাবু, সে গুদামঘরটা কোথায় তুমি দেখাতে পার্‌বে?

গঙ্গাধর অন্ধকারে কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে সেখানে গিয়েছিল তা তার মনে নেই, মনে থাকলেও সে যেত না।

পথে আসতে আসতে গঙ্গাধরের মনে পড়ল, পুরানো ভাঙা গুদামঘরটার অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে আমীর খাঁয়ের মুখের সেই হতাশ ও অমানুষিক চেষ্টা করেও হেরে যাবার দৃষ্টিটা। হতভাগ্য কি এতদিনেও বোঝেনি সে মারা গিয়েছে—কে উত্তর দেবে? ভগবান্ তার আত্মাকে শান্তি দিন। ❑





কলকাতার গলিতে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিশ্বনাথ পাড়াগাঁয়ের ছেলে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুপুর রাত্রে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সে তিন ক্রোশ অনায়াসে বেড়িয়ে আসতে পারে। অমাবস্যায় গ্রামের সীমানার শ্মশান থেকে মড়া পোড়ান কাঠ সে কতবার বাজি ধরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভয় তার শুধু কলকাতা শহরকে।

যেখানে দু'পা এগুতে হলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে, ইলেকট্রিক আর গ্যাস লাইটের কল্যাণে যেখানে দিন কি রাত চেনবার জো নাই বল্লেই হয়, সেইখানেই একরাতে সে যা বিপদে পড়েছিল।

বিশ্বনাথ বলে—"না, কলকাতা শহরে সন্ধ্যার পর বেরুন নিরাপদ নয়।"

আমরা হেসে উঠলে, বলে,—"না হে না, চৌরঙ্গী, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ-এর কথা বলছি না। কলকাতাটা আগাগোড়া চৌরঙ্গী নয়। শোন তাহলে—"

"সেবার গাঁয়ের লাইব্রেরীর জন্যে বই কিনতে কলকাতা গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন থেকেই বইপত্র সব কিনে রাত্রের ট্রেনে বাড়ি চলে আসব। কিন্তু কলকাতায় গেলে নতুন বায়স্কোপ থিয়েটার না দেখে কেমন করে ফেরা যায়? প্রথম দিনটা তাতেই কেটে গেল। দ্বিতীয় দিনে কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে বই-টই সব কিনে ফেল্লাম। সঙ্গে বিছানা-পত্রের বা তোরঙ্গ-বাক্সের

ঝঞ্ঝাট ছিল না। শুধু একটি সুটকেশ, তাতে বইগুলো ভরে একেবারে সোজা শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উঠলেই হ'ত।

কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হল একবার অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে যাই।

অবিনাশ আমাদের গ্রামের ছেলে। স্কুলে আমার সঙ্গেই পড়াশুনা করেছে। কলেজেও কয়েক বছর আমরা এক সঙ্গে পড়েছিলাম। অবিনাশ বেশী দিন অবশ্য কলেজে থাকেনি। অত্যন্ত খেয়ালী ছেলে—কোন কাজে বেশীদিন লেগে থাকবার মত ধৈর্য তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন তার উড়ুউড়ু ভাব। বাড়ি থেকে যে কতবার সে ছেলেবেলায় পালিয়ে গেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। বড় হয়েঁও তার সে স্বভাব কাটেনি। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ একদিন হয়ত আমরা শুনলাম অবিনাশ হেঁটে সেতুবন্ধ যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর হয়ত দুমাস তার দেখা নেই। আমরা কোন রকমে প্রক্সি দিয়ে হয়ত সেবার তার কলেজের খাতায় কামাই-এর সংখ্যা কমিয়ে রাখলাম। কিন্তু এমন করে কতদিন রাখা যায়? বছরের শেষে এক্‌জামিনেশনের সময়ে দেখা গেল অবিনাশ আমাদের প্রক্সি দেওয়া সত্ত্বেও কলেজে এত কম দিন এসেছে যে তার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব। আমরা দুঃখিত হলাম। ছেলেটা এত আমুদে মিশুক ছিল যে আমরা সবাই তাকে ভালবাসতাম। কিন্তু অবিনাশের যেন স্ফূর্তিই হল। বল্লে, "তবে আর কি? ভাই। বর্ম্মাটা একবার ঘুরে আসি।"

তারপর অবিনাশের আর দেখা নেই। আমাদের চেয়ে তার ধাতই ছিল আলাদা।

পৃথিবীটা যে মস্ত বড় এই আনন্দেই তার মন ভরপুর হয়ে থাকত। পৃথিবীর এই বিশালতাকে দেশে দেশে নতুন পথে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করে তার আশা আর মিটতে চাইত না। যে সব দেশ সে এখনো দেখেনি তার আকর্ষণের কথা সে মাঝে মাঝে এমন তন্ময় হয়ে বলত যে আমাদেরও কখন কখন মোহ ধরে যেত—কেমন যেন মনে হত এই ছোট্ট শহরের ছোট্ট জানা কটি রাস্তায় দুবেলা যাওয়া আসায় জীবনের কোন সার্থকতাই নেই,—পথ যেখানে অফুরন্ত, আকাশের যেখানে কূল-কিনারা নেই, এমন জায়গায় বড় করে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে না পারলে যেন বাঁচাই বৃথা।

কিন্তু আমাদের এ ক্ষণিক মোহ অবশ্য খানিক বাদেই কেটে যেত কিন্তু অবিনাশের এই মোহই ছিল সব।

মাস-তিনেক আগে আমার গ্রামের ঠিকানায় এই অবিনাশের একটা চিঠি পেয়েছিলাম বহুদিন বাদে। একটা গলির ঠিকানা দিয়ে লিখেছিল যে অনেক জায়গা ঘুরে ফিরে সে কলকাতায় এই ঠিকানায় আপাততঃ আছে। আমি এসে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। এতদিন বাদে তাকে সেই ঠিকানায় পাওয়া হয়ত যাবে না জেনেও একবার যেতে ইচ্ছে হল।

বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম কিন্তু গলিটা মনে ছিল। ভাবলাম কলেজ স্ট্রীট থেকে বেশী দূর হবে না। ট্রেনেরও এখন দেরি আছে। একবার দেখা করেই যাই যদি তাকে পাওয়া যায়।

একটু খোঁজাখুজির পর—একটা গলি রাস্তায় ঢুকে একজনাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম আর একটু গেলেই অবিনাশ যে গলিতে থাকে তা পাওয়া যাবে।

রাত তখন বেশী নয়। বড় জোর আটটা হবে। কিন্তু গলি দিয়ে খানিক দূরে হেঁটেই একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। গলিই হোক আর যাই হোক, কলকাতার পথ ত বটে। অথচ এই আটটা রাত্রে সেখানে একটি জনপ্রাণী নেই।

ভেবেছিলাম খানিক দূর গিয়ে আবার কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু লোক কোথায়? তা ছাড়া গলিটাও ফুরোতে চায় না।

একবার সন্দেহ হল, হয়ত ভুল পথে এসেছি। কিন্তু যে লোকটা আমায় খবর দিয়েছে আমায় ভুল পথ দেখিয়ে তার লাভ কি? নির্জন রাস্তায় চুরি-ডাকাতি? কিন্তু আমার কাছে কি এমন লাখ পঞ্চাশ টাকা আছে যে চোরদের ষড়যন্ত্র করতে হবে? আমার সাজপোশাক দেখেও বড়লোক বলে ভুল করবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে?

আরো খানিকটা এমনি করে এগিয়ে গেলাম। পথ তেমনি নির্জন। বাতিগুলোও কি এ পথের মিটমিটে হতে হয়। একে গ্যাস-পোস্টগুলো অত্যন্ত দূরে দূরে তার ওপর কি কারণে জানি না আলো তাদের এত ক্ষীণ যে রাস্তা আলো হওয়া দূরের কথা, সেগুলো যে জ্বলছে এইটুকুই বুঝতে কষ্ট হয়।

খাস্ কলকাতার ভেতর এমন রাস্তা আছে কে জানত। দুপাশের বাড়িগুলো যেন মান্ধাতার আমলের তৈরী। কোন রকমে হাড় বেরুন ইট-কাঠের জীর্ণ দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। না আছে কোন বাড়িতে একটা আলো, না জন-মানুষের একটু শব্দ। সে রাস্তার পাশে সারের পর সার পোড়া বাড়ির মত সব খাঁ-খাঁ করছে।

ক্রমশঃ মনে হল একটা কেমন যেন ভাপ্‌সা গন্ধ নাকে আসছে। বহুদিন আলো-বাতাস সেখানে ঢোকেনি, মানুষের বাস যেখানে বহুদিন ধরে নেই, এমনি ঘরে ঢুকলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, গলিটায় ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম।

লোকটা বলেছিল কিছু দূর গেলেই ডাইনে গলি পাওয়া যাবে। কিন্তু জন-মানুষহীন জীর্ণ বাড়ির সারের ভেতর ডাইনে-বাঁযে কোথাও কোন পথ নেই।

সামনের পথও খানিক দূর গিয়ে দেখলাম বন্ধ। যে পথে ঢুকেছি গলিটার ওই একটি মাত্রই তাহলে বেরুবার রাস্তা। আশ্চর্য ব্যাপার। লোকটা মিছিমিছি আমায় ভুল পথ দেখাল কেন?

সেখান থেকে ফিরলাম। গলিটা যেন আরো অন্ধকার মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ যে গ্যাসগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল তারই কটা একেবারে নিভে গেছে দেখলাম। মনে হল, এ গলি থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। ভীতু আমি নই কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতর এমন অভাবনীয় ব্যাপার দেখে গাটা কেমন ছম্‌ছম্ করছিল।

সবে তো প্রথম রাত। কলকাতা শহরের সমস্ত রাস্তা এখন লোকজনে গাড়ি ঘোড়ায় মানুষের শব্দে গম্‌গম্ করছে। অথচ এই পথটা কেমন করে এখন নির্জন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মনে হল, আমি যেন বহুকালের প্রাচীন একটা শহরে এসে পড়েছি। সে শহরের লোকজন বহুকাল আগে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কত বছর যে মানুষের পা সে শহরে পড়েনি কেউ যেন জানে না। আমিই যেন প্রথম সে শহরের নিস্তব্ধতা ভাঙলাম। খট্‌খট্ খট্—আমার

নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। সে শব্দ অদ্ভুত ভাবে নির্জন অন্ধকার বাড়িগুলোর দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার চোখের ওপরই কটা রাস্তার বাতি দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। ভাপ্‌সা গন্ধটা ক্রমশঃ যেন বেড়ে গিয়ে অসহ্য মনে হচ্ছিল। না, এ গলি থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে পারি ততই মঙ্গল। কাজ নেই আর অবিনাশের খোঁজ করে। পরে একদিন আবার আসলেই হবে।

খানিক দূর গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদিকেও গলির পথ যে বন্ধ। কিন্তু তা কেমন করে হতে পারে? আমি একটা পথে যে গলিতে ঢুকেছি এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। এ গলি দিয়ে এগুবার সময়ে আশ-পাশে কোন পথই দেখতে পাইনি। তা হলে গলির দুমুখ বন্ধ কেমন করে হয়?

ভাবলাম, হয়ত আরো একটা পথ ছিল। যাবার সময় আমার দৃষ্টি কোন রকমে এড়িয়ে গেছে, এখন আসবার সময় ভুল করে সেইটিতেই ঢুকে পড়েছি। সেইটেরই মুখ এখানে বন্ধ। কিন্তু এরকম ভুলই বা হবে কেমন করে? আমি অন্যমনস্ক হয়ে ত ছিলাম না। আগাগোড়াই ত সজাগ হয়ে চলেছি। রাস্তায় লোক না থাক, একটা বাড়িতে যদি একটা আলো দেখা যেত। না হয় ডেকেই জিজ্ঞাসা করতাম।

যাই হোক, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই জেনে আমি আবার ফিরলাম। গলি থেকে বেরুতে হবেই। আবার সেই নির্জন অন্ধকার গলি দিয়ে শুধু নিজের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম। গলিটা যেন ক্রমশঃ দীর্ঘই হয়ে চলেছে। আমার অজান্তেই কে যেন ইতিমধ্যে সেটা বাড়িয়ে আরো লম্বা করে দিয়েছে।

এবারও যখন দেখলাম গলির মুখ বন্ধ, তখন সত্যই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। একে আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক। ফাঁকা আকাশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে মানুষ হয়েছি। শহরে এলে অমনিই আমাদের হাঁপ ধরে। তার উপর এই ভাপ্‌সা গন্ধভরা অন্ধকার গলি—চারিদিক থেকে সে যেন আমাকে জেলখানার মত বন্দী করে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওপরে চেয়ে যে একটু আকাশ দেখতে পাবো তারও জো নেই। এমন একটা ধোঁয়াটে কুয়াশায় বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে একটা তারাও দেখা যায় না।

যত এই অদ্ভুত ব্যাপার ভাবছিলাম মাথাটা ততই গুলিয়ে আসছিল। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। সুটকেশটা বইয়ের ভারে বেশ ভারীই ছিল। সেটা বয়ে বেশ ক্লান্তই নিজেকে মনে হচ্ছিল। এমনি করে আর খানিকক্ষণ ঘুরতে হলে ক্লান্তিতেই ত বসে পড়তে হবে।

হঠাৎ বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল! দূরে একটা মিট্‌মিটে বাতির তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে না! তাড়াতাড়ি সেই দিকে এগিয়ে গেলাম—এই ত আমাদের অবিনাশ। এতক্ষণের ভয় ভাবনা নিমেষে ভুলে গেলাম।

আনন্দে চীৎকার করে তার নাম করে ডাকতেই সে চমকে তাকাল। বল্লাম, "কি আশ্চর্য! তোর খোঁজ করতেই এই এক ঘণ্টা এই গলির ভেতর ঘুরে হয়রান হচ্ছি যে! বাবা! কি অদ্ভুত গলিতে থাকিস্‌ তুই। ঢুকে আর বেরুন যায় না।"

অবিনাশ একটু হেসে বল্লে, "এসেছিস তাহলে ঠিক।"

বল্লাম, "এসেছি আর কই। তোর দেখা না পেলে এই গলির ভেতর তোর বাড়ি কি খুঁজে বার করতে পারতাম!"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অবিনাশ বল্লে, "আমায় তা হলে তোর মনে আছে ভাই!"

"মনে থাকবে না কেন রে?"

"না ভাই, মনে থাকে না। অথচ মানুষ যেটুকু মনে করে রাখে তার ভেতরই আমরা বেঁচে থাকি।"

আমি হেসে বল্লাম—"ছিলি ত ভূপর্যটক্, আবার দার্শনিক হলি কবে থেকে? যাক, এখন তোর বাড়ি চল দেখি। তোর সব গল্প শুনতে চাই।"

অবিনাশ কেমন যেন একটু নিরুৎসাহ হয়ে বল্লে, "আমার বাড়ি। আচ্ছা চল। আমার চিঠি পেয়েছিলি।"

"হ্যাঁ, সে ত তিন মাস আগে।"

"তোর জন্যে কতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম।"

"আবার! তা হলে ফির্‌লি কবে?"

অন্যমনস্ক ভাবে অবিনাশ বল্লে—"এই আজ।"

"এই আজ? এবারে গেছলি কোথায়?"

"বলছি চল।"

সেই নির্জন গলি দিয়েই তখন আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর তখন আগের কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না।

অবিনাশ বলতে লাগল—"এবারে ভাই গেছলাম বহুদূর। খিদিরপুরের ডকে বেড়াতে বেড়াতে একদিন সুন্দর একটি জাহাজ দেখলাম। সুন্দর বলতে নতুন মনে করিসনি যেন। জাহাজটা অনেক পুরানো। নোনা জল লেগে লেগে তার গায়ের রঙ চটে গেছে। মাস্তুলগুলো বহুদিনের পুরানো। চিমনিগুলো ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে। আগাগোড়া জাহাজটা দেখলেই মনে হয় বহুকাল ধরে পৃথিবীর কত সমুদ্রে সে যেন পাড়ি দিয়ে ঝুনো হয়ে গেছে। তার চেহারাতেই কেমন একটা ভবঘুরে রুক্ষুরুক্ষু ভাব। সেইটিই তার সৌন্দর্য। তার ওপর শুনলাম যে এখান থেকে মাল নিয়ে যাবে যবদ্বীপে তখন আর লোভ সামলাতে পারলাম না।

যবদ্বীপ! নারকেল আর তালগাছের সার তার তীর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করতে। বাতাস আর জঙ্গলে মসলাগাছের গন্ধ। তার উপর গভীর বনের মাঝে তার বোরাবুদর!

একেবারে মেতে উঠলাম ; যেমন করেই হোক যেতেই হবে জাহাজে। জাহাজেব ভাড়া দেবার মত পয়সা নেই। অনেক কষ্টে জাহাজের হেড-খালাসীকে খোঁজ করে, তার সঙ্গে ভাব করে তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে লুকিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলাম। জাহাজের একধারে বিপদের সময় ব্যবহার করবার জন্যে ছোট তেরপল ঢাকা বোট টাঙ্গানো থাকে। ঠিক হল তারই একটির

ভেতর আমি থাক্‌বো। কেউ তাহলে টের পাবে না। খালাসী কোন এক সময়ে লুকিয়ে এসে আমার খাবার দিয়ে যাবে।

গভীর রাতে জাহাজে চড়ে সেই বোটের ভিতরে গিয়ে হেড্‌খালাসীর নির্দেশ মত লুকিয়ে রইলাম। ভোর হবার আগে জাহাজ ছেড়ে দিল।

তারপর কদিন কি অদ্ভুত ভাবেই না কাটিয়েছি। সারাদিন তার ভেতর লুকিয়ে থাকি। তেরপল একটু ফাঁক করে আকাশ দেখি আর জাহাজের শব্দ শুনি। গভীর রাতে যখন সব নির্জন হয়ে যায়, জাহাজের খোলে কজন ইঞ্জিনিয়ার আর ফায়ারম্যান আর ওপরে হাল ঘোরাবার হুইলে একজন নাবিক ছাড়া আর কেউ থাকে না, তখন একবার করে বেরিয়ে নির্জন ডেকের একটি কোণে রেলিঙ ধরে দাঁড়াই।

এমনি করে ক'দিন বাদে জাভায় এসে পৌঁছোলাম। আগে ঠিক ছিল সবাই নেমে গেলে কোন এক সময় হেড্‌-খালাসী আমার নামার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার আগের রাত্রে সে এসে আমায় জানিয়ে গেল যে তা হবার উপায় নেই। এখানে মাল নামান হলেই জাহাজটাকে সটান ড্রাই ডকে রং করবার জন্যে পাঠান হবে ঠিক আছে। সুতরাং সে ভাবে নামা যাবে না।

তাহলে উপায়? খালাসী বল্লে উপায় আছে। সবাই যখন জাহাজ ভেড়াবার সময়ে সেই কাজে ব্যস্ত থাকবে তখন যদি আমি জাহাজ থেকে জলে পড়ে একটুখানি সাঁতরে যেতে পারি তাহলেই হয়। তাতেই রাজি হলাম।

জাহাজ জেটিতে লাগবার আয়োজন চলছে, এমন সময় সন্তর্পণে আমি বোটের ঢাকনি সরিয়ে নেমে পড়লাম। পুঁটলিটা আমার পিঠে বাঁধাই ছিল। রেলিঙের ধারে গিয়ে জেটির উল্টো দিকে ঝাঁপ দিতে আর কতক্ষণ। কেউ দেখ্‌তেও পেল না।

ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম ঠিক, কিন্তু সেই মুহূর্তে জাহাজটা জেটিতে ভেড়বার জন্যে পাশে সরতে আরম্ভ করল। জাহাজের বিশাল প্যাড্‌লের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে উঠল, কি ভীষণ তার টান। প্রাণপণেও আমি সে টান ছাড়িয়ে আসতে পারলাম না, সেই ঘূর্ণমান ভয়ঙ্কর প্যাড্‌লের দিকে তলিয়ে গেলাম।"

আমি শিউরে উঠে বল্লাম—"তারপর?"

"তারপর সেই প্যাড়লের ঘা! কি ভয়ঙ্কব লেগেছে দেখবি?"

সামনে একটা গ্যাসের বাতি তখনও জ্বলছিল। অবিনাশ তার জামাটা তুলে দেখালে।

একি! জামার নিচে যে কিছুই নেই, একেবারে ফাঁকা, শূন্য!

ভালো করে আবার চেয়ে দেখলাম—দেহ নেই, কিছু নেই; ওধারের গ্যাস পোস্টটা সে জামার তলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উপরের দিকে চাইলাম। সেখানে অবিনাশের মাথা নেই, শূন্য শূন্য সব শূন্য।

অস্ফুট চীৎকার করে সুটকেশ হাতে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম কিন্তু কোথায় যাব? যে দিকে যাই নির্জন গলির মুখ বন্ধ। চীৎকার করে একটা পোড়োবাড়ির দরজায় ঘা দিলাম। তার ভেতরের দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত সে আঘাতের প্রতিধ্বনিতে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। কিন্তু

কারুর সাড়া নেই। অন্ধকার। গলি মনে হল আমার চারিধারে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অসহ্য তার ভাপ্‌সা গন্ধ। তারপরে আমার আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি কে একজন আমায় বলছে,—"উৎরিয়ে বাবু, ইয়ে শিয়ালদা স্টেশন হ্যায়।"

শিয়ালদা স্টেশন। অবাক হয়ে দেখি আমি আমার সুটকেশ সমেত একটা রিকশ'য় বসে আছি। সামনে শিয়ালদা স্টেশন।

নেমে পড়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কখন কেমন করে যে আমি রিকশ'য় উঠেছি কিছুই মনে করতে পারলাম না।

—হ্যাঁ, তারপর খোঁজ নিয়ে জেনেছি অবিনাশ দুমাস আগে জাভার বন্দরে অমনি করেই মারা গেছল। ❑





দশনম্বর বাড়ীর রহস্য

শিবরাম চক্রবর্তী

দিব্যি একটা খালি বাড়ী পেয়ে গেলাম আলিপুরে। হার্ট ট্রাবলের জন্য ডাক্তার বলে দিল হাওয়া বদলাতে, বলে দিল—'কলকাতা ছেড়ে ঘুরে এসো গে কোথাও—দিন কতক বাঁচতে চাও যদি। তবে যদি না বাঁচতে চাও সে কথা আলাদা।' বাঁচতে কে না চায়? কাজেই ছাড়তে হলো কলকাতা। চলে এলাম আলিপুরে।

হ্যাঁ হাওয়া বদলাতে চাও তো আলিপুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাওয়া বদল হচ্ছে সেখানে। এমনকি মিনিটেও বলা যায়। আর তার রেকর্ড থেকে যাচ্ছে রীতিমত, আবহাওয়া আপিসটা সেখানেই কিনা।

উঠেছি এসে এখানে—আজ সকালেই। বিনি আর আমি। আমার উপর হাওয়া বদলের দায়, আর বিনির দায় খাওয়া বদলের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে আমাকে খাওয়াবে—পুষ্টিকর আর তুষ্টিকর যতো রকমের খাবার আছে। খাওয়াবার ভার তার ওপর, সে ভার বইবে ও। আর খাদ্যের ভার যা কিছু আছে সব বোঝা সইতে হবে আমায়—হয়তো একটু কষ্ট করেই এই রকমের বোঝাপড়া।

তা কষ্ট করলে কেষ্ট মেলেনা—এখানে অবশ্যি কেষ্টকে না পাবার জন্যই কষ্ট করা। কেষ্ট প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টির জন্যেই না এই খাদ্য বৃষ্টি? তা হোক্, যতই কষ্টদায়ক—হোক্ আর

খাদ্যের মধ্যে বাছ-বিছার করতে হ'লে খাদ্যকেই আমি বেছে নেব অম্লান বদনে, এমন কি, শ্রীমতী বিনির রান্না হলেও।

এক ঘণ্টাও হয়নি আমার। ইতিমধ্যেই আসরে খাদ্য এসে হাজির। এক বাটি দুধ আর একখানা খাম বিনি আমার টেবিলে এনে রাখলে।

—তোমার চিঠি দাদা—দুধটা খেয়ে ফ্যালো দেখি।

আমি আগে চিঠিখানাকে দেখি, এখনো তো কাউকে এখানকার ঠিকানা জানাইনি। আসতে না আসতেই তবে চিঠি আসে কি করে? কিন্তু? না সত্যিই এই ঠিকানারই চিঠি বটে। ওইতো লেখাই রয়েচে লেফাফার উপরে ১০ নং আলিপুর টেরেস। কিন্তু এর মধ্যেই আলিপুরে আমাদের ট্রেস পেলো কি করে আমাদের শত্রু মিত্ররা? খাম খুলতে খুলতে কেমন একটা চকচকে আওয়াজ পেলাম। খামটা চকচকে বটে, কিন্তু তা বলে যতই চাকচিক্য থাক, তা থেকে চক চক শব্দ কেউ আশা করে না। তা বরদাস্তও করা যায় না কখনোই। খাম-টামের অতো অহঙ্কার থাকা ভালো নয়। 'শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু-'

যুতসই ভণিতা দেখেই চট করে চিঠির শেষে চোখ বুলাতে গেলাম—কোন্ মহাত্মনের লেখা দেখা যাক্। না, নাম ধাম নেই কারো। বিলকুল একখানা চিঠি।

প্রতিবেশীর প্রতি বেশী রকম ভালোবাসা থাকে না সকলের, থাকবার কথাও নয় তা মানি, কিন্তু তা বলে, সে আসতে না আসতেই তার প্রতি এইরূপ বেনামা ছুঁড়ে মারা, এই বা কি রকমের ভদ্রতা? অ্যাঁ?

...শ্রীযুক্ত নতুন প্রতিবেশী সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী...

জানি মহাশয়, জানি—কিন্তু দুসংবাদ অমন বার বার বেশী বেশী করে মনে করিয়ে দেবার মানে কি বলুন তো? আসতে না আসতেই চান কি যে এখান থেকেই আমরা উঠে যাই?

চিঠিখানা রেখে দুধ খেতে যাই। দেখি বাটি ফাঁক। অজান্তে কখন খেয়ে বসে আছি। যাক বাঁচা গেল। দুধের মত একটা অখাদ্য যে অন্য জনে খেতে পেরেছে সেটা আমার সৌভাগ্যই।

কিন্তু যার বোন আছে, বিনির মত বোন আছে—তার সৌভাগ্য বলে কিছু নেই। তার হচ্ছে বনবাস। আরেক বাটি দুধ হাতে সে হাজির, আবার সাথে এক প্লেট হালুয়া।

—আরে এই তো খেলাম রে, আবার এখুনিই? আমি আপত্তি করি। এই ঘন ঘন পথ্যি করলে কি মানুষ বাঁচে? বিশেষ হার্ট যাদের খুব উইক? তাতে হার্ট ট্রাবলই সারে যদিও তার, শেষটায় হয়তো পেটের ট্রাবোল্সে সে মারা যায়।

—কিন্তু ডাক্তার বলেছে না ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াতে?

—তোর এর মধ্যেই এক ঘণ্টা হয়ে গেল?

তাক লাগে আমার। আলিপুরে আবহাওয়া মিনিটে মিনিটে বদলায় বলে শুনেছি বটে। কিন্তু তা বলে ঘণ্টারা কিছু আবহাওয়ার মতই বদলাতে পারে না। তাদের বদলাতে পাক্কা ষাট মিনিট লাগে, যেমন লাগতো কলকাতায়। অবশ্যি সময়তত্ত্বে আমি বিশেষজ্ঞ নই ঘড়ি দর্শনেও পোক্ত নই তেমন, তা ঠিক, কিন্তু তাহলেও আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির যদ্দুর ধারণা, এক এগজামিনেশনের হল ছাড়া আর কোথাও পনের মিনিটে ঘণ্টা কাবার কখনো হয় না।

তবে কিনা, এখানেও তো আমি একটা পরীক্ষার সম্মুখীন। জীবন-মরণই পরীক্ষা। আর সেই জন্যেই যদি—। সেজন্যেই কিনা বিনির কাছে আমি জানতে চাই। বিনির জবাবে যা পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—ডাক্তারের উপদেশ যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়, তাহলে দিনে রাতে চব্বিশবার খাওয়াতে হয় আমায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বার ঘণ্টাই নাকি আমি নাক ডাকাই। আর নাক থেকে হলে—'নাক থেকে নয় ঘুম থেকে'—আবার ভুল শুধরে দিই—যাক সেই নাকামো থেকে তুলে আমাকে কিছু গেলানোর মত দুঃসাধ্য কাজ আর দুটি নেই। আর তা নাকি ওর কম্মো না। তা ছাড়া রাত বিরেত সেও নাকি একটু ঘুমোতে চায়। ঘুম পেলেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সে—ও। আর আমার মত অতোটা না হলেও ঘুমোতে একটু ভালোই বাসে। তার ঘুমোনোর সময় আমাকে তুলেই বা কে আর খাওয়ায় বা কে? তাকে তোলে খাওয়ানোর জন্যেই মানে, তাকে নয় আমাকে খাওয়ানোর জন্যেই।

এই সব ভেবে চিন্তে সে ঠিক করেছে যতোক্ষণ আমি জেগে থাকি তার মধ্যেই উঠে প'ড়ে যেমন করে হোক্ বার চব্বিশেক আমায় খাইয়ে দেবে। এবং সেই মহাচেষ্টাতেই এই...

'খাওয়াও'। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বলি—'খাইয়ে যাও।' পড়েছি 'মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'। দুধের বাটিটা রেখে হালুয়ার প্লেটটা হাতে নিই। চামচে করে মুখে তুলে এক একটু করে চাখি। চাখতে চাখতে আবার শুনি সেই চকচকানো ধ্বনি। আমার খারাপ লাগে এবার। এই কালো ভূতের মতন হালুয়া কোনোই চাকচিক্য নেই এর কোনখানেই মুখে তুলতে না তুলতেই এও যদি চকচকে আওয়াজ ছাড়ে তো গা জ্বালা না ক'রে পারেনা। এমনি বিচ্ছিরি হালুয়ার মুখে এমন চোকা চোকা বুলি—বড্ডোই বাড়া-বাড়ি, নিতান্তই আদিখ্যেতা।

কিন্তু না, প্লেটে নয় দুধের বাটিতেই সেই চক্কার টেবিলের ওপরে শুধু সেই বাটিটা আর তিন সীমানায় কেউ নেই। এক সীমান্তে কেবল আমি। আর সেই বাটির সম্মুখেই অদ্ভুত উক্ত আওয়াজ চক্ চক্ করে যেন দুগ্ধ পান করছে। হক্‌চকানো ব্যাপার। বেশ করে রগড়ে খালি চোখে তাকালাম ভাল করে—টেবিলে শুধু সেই দুধের বাটিটা, কেউ নেই কিছু নেই তার কাছাকাছি—খালি সেই বাটিটা। দেখতে না দেখতে বাটিটা খালি হয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। বুক জ্বর জ্বর করতে লাগল। হার্ট ট্রাবল বাড়তে লাগলো নিজের থেকেই। অ্যাঁ এ আবার কি গো, এক চকরবতির সামনে এ আবার কোন চকরবর্তী? কোন চক্রান্ত কর্তা? এখনই মনে পড়লো ব্যাপারটা খুব অশ্রুতপূর্ব না একটু আগেই এমনি চক্‌চক্কার যেন আরেক বার শুনেছি। আগের বাটিটাও তাহলে...এমনি নিজ গুণেই? তবে কি আমি নিজে ফাঁক করিনি সেটাকে?

বিনি! বিনি! বিনি—! আমার আর্তনাদ ফোটে। আমার চীৎকারে সে ছুটে আসে—কি হয়েছে, কি হয়েছে দাদা?

কী আবার হবে ঐ দ্যাখ। আমি দেখাই। অদৃশ্য কিন্তু অশ্রুত মনকে দেখাতে যাই। দেখাতেই গিয়ে অন্য দৃশ্য দেখা এবার। ঘরের কোণে কতকগুলি অগ্নি শলাকা ছুটোছুটি করছে দেখতে পাই।

ওমা একি! বিনি গালে হাত দেয়। সে অবাক! আর আমি? আমি ত হতবাক তার আগেই। খানিক বাদে ওর কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজের গোঙানি আমার কানে আসে।

ভূতুড়ে বাড়ি নাকি দাদা!

—কে জানে বিনি। বলতে গেছি একথাটাই। কিন্তু সমস্ত বাক্যটা প্লুতস্বর হয়ে বেবিয়ে আসে এক কথায় গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ, আমি বলতে থাকি। আপ্লুত হয়ে।

তোমার গোঁয়াব তুমি থামাও তো। বলে বিনি এক জ্বালা ঠাণ্ডা জল এনে আমার মাথার উপব ঢেলে দ্যায়। এইসব কাণ্ডেই ভড়কে গিয়েই কিনা কে জানে জলন্ত ফলকগুলি ঘরময় ধুটোপাটি লাগিয়ে দেয়। ততক্ষণে আমার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।—

—বোন বলতে কি বহ্নি বলতে আমাদের বাড়ীতে তুই-ই ছিলি একমাত্র। এক মাত্রাই বল আর এক মাত্রাই বল...আমি বলি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ বাড়ীতে তোব প্রতিদ্বন্দ্বিনী আছে। অনেক আছে। মানে এটা ভূতুড়ে বাড়ী নয়। ঐ বহ্নি শিখারা ভূত নয় কখনোই পেত্নী।

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেত্নী বলা হচ্ছে আমায়? বটে? বুঝতে পারছি এখনও তোমার জ্ঞান সঞ্চার হয়নি ঠিক মতন। দাঁড়াও। বলে সে আরেক বালতি জল আনতে যায়—ভাল করে আমার চৈতন্য সম্পাদনেব মতলবেই।

যাবার মুখেই অযাচিত কার ল্যাজে যেন পা পড়ে যায় ওর আর সে (বিনি নয় সেই অদৃশ্য লাঙ্গুলধারী) ম্যাও-ও বলে চেঁচিয়ে ওঠে। মাগো বলে একলাফে চার পা পিছিয়ে আসে

আর চতুর্থ বারে আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

জীবটি অদৃশ্য হলে কি তার আওয়াজ বেশ সুশ্রাব্য—সুখশ্রবাই। বিনিব পায়ে তার আঁচডানি একেবারেই অদৃশ্য নয়। সুদৃশ্যই বলতে হয়। তাবপব আইডিন লাগাবার পর সেই পায়ের বাহার যা খোলে। দেখবাব মতোই।

- বেড়ালের ভূত। বিনি বলে।

—উঁহু। ভূতুড়ে বেড়াল। আমি তার ভ্রম সংশোধন করি। মাগো বেড়াল মরে ভূত হয় জানতুম না সাত জন্মে। আঁচড়িত আইডিন চর্চিত শ্রীচরণে সে হাত বুলোয়।—আবার মরে ভূত হবাব পরেও এমন বেঁচে জলজ্যান্ত থাকে তা কে জানতো।

বেড়ালের ভূত মানুষের কোন ক্ষতি করে না। করতে পারে না। বরং ভেবে দেখলে আমি ভেবে দেখি মানুষের উপকারেই লাগে। মনে কর তুই যেমন ঘণ্টায় চারবার করে আমায় দুধ গেলাবাব জন্য কোমর বেঁধেছিস, তাতে ঐ ভূতুড়ে বেড়ালটা এখানে না থাকলে আমার কি দশা হতো? আমি কি বাঁচতাম? ওর সাহায্য না পেলে কি—

—তোমার আদুরে বেড়াল নিয়ে তুমি থাকো। আমার বোনাব কাজ ফেলে এসেছি বলে আমার আদুরে বিনি ব্যাজার মুখে চলে যায়।

এবার আমি চিঠিখানা নিয়ে পড়ি—

মহাশয়, আপনি আমাদের নতুন প্রতিবেশী। ঐ দশ নম্বর বাড়ীর রহস্য হয়ত আপনার জানা নাই। সেই জনাই আপনাকে সমস্ত জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।

হ্যাঁ খুলেই বলি সব—যে বাড়ীতে আপনারা এসে উঠেছেন, বছর দুই আগে আমরা সেখানে থাকতাম। কিন্তু যে কারণে ঐ বাড়ী—অমন চমৎকার বাড়ী—আমাদের ছাড়তে হয় সেই কথাই বলছি।

মাঝের যে ঘরটায় এখন আপনি এসে আছেন ওইটায় আমার শোবার ঘর আর ... বরেটরী। আমার কাকা একজন পাস করা বৈজ্ঞানিক। নাম করলেই ... নাম আর জানালাম না। ঐ ল্যাবরেটারীতে বসে তিনি নানা রকমের গবেষণা করতেন ... ক্ষা-নিরীক্ষা চলতো। হাব ঐখানেই। এমনি করতে করতে ... উপায় আবিষ্কার করে বসলেন পরীক্ষায় লাগানোর কাজে ... ইঁদুর ... নি আনিয়েছিলেন।

ইঁদুরগুলো সাহেবদেরই মতো সাদা সেই শ্বেতকায়দের ... ত। সেদিনের কথা এখনো আমার স্মরণ আছে। হাঁকা হাঁকি করে ... সবাইকে। সবাই আমরা ছুটে গেলাম—তার গবেষণা ঘরে। তিনি বললেন—"দ্যাখ। ... খ।"

সবাই আমরা চোখ পিট পিট করে তাকালাম। না, দেখবার কিছু নেই কোথাও—কিছু ই।

দেখছিস না খাঁচাটা? চেয়ে দ্যাখ্ ভালো করে। বলে তার সাহেবী ইঁদুরের খাঁচাটা দেখালেন। ... খাঁচাটায় তার ইঁদুর সাহেবরা থাকত সেটা বিলকুল ফাঁকা। কোথায় গেল ইঁদুরগুলো? ... স করলাম আমরা।

- আছেরে ওইখানেই আছে ওর মধ্যেই রয়েছে—গর্বের হাসি হাসলেন কাকা। দৃশ্য হয়েছে সবাই।

আমার কাকা ভারি চালাক লোক। অদৃশ্য হয়ে যাবার পর পাছে ... কেউ অবিশ্বাস করে সেই জন্যে আগের থেকেই তাদের গায়ে জ্বলজ্বলে ... য়ে দিয়েছিলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম সত্যিই তো কতক গুলো উজ্জ্বল আলোকবিন্দু ... র ভেতর ঝলমল করছে জাজ্বল্যমান একপাল তিড়িং তিড়িং।

সবাই আমরা খাঁচার চারধার ঘিরে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে সেই আলোর কণাগুলি ... লাফঝাঁপ লাগালো যে বলবার নয়। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে একজন আমাদের খাঁচার ... খুলে দিলো একবার—কী মজা হয় দেখবার জন্য, তারপর আর দেখতে হলো না। দেখতে না দেখতে জ্বলন্ত ফোঁটাগুলি বেরিয়ে পড়লো খাঁচার থেকে— ছিটকে পড়লো ছড়িয়ে পড়লো। ছিটকে পড়লো চারধারে—ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল ঘরময়।

কাকা তখনি আমাদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল এটে দিলেন। তিনি খুব চটে ছিলেন আমাদের এই কাণ্ডে—এই অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে, তা বলাই বাহুল্য তারপর কি ... শুনুন তার দিনকতক বাদে। যখন সেই অদৃশ্য ইঁদুরের কথা আমরা ভুলে গেছি। কাকার ... বিদ্যার কাহিনী আর আমাদের মনে নেই, খেতে বসেছি আমরা সবাই গোল ঘরটায়। কাকীমা পরিবেশন করছেন। এমন সময়ে কাকীমার আদরের মেনি বেড়ালটা বেড়িয়ে ফিরলো বাহির থেকে। এসে জমলো আমাদের পাতের গোড়ায়। বসে খালি সে মুখ মুছতে লাগলো নিজেই। মুখের ভাব ভারী হাসি খুশী। কোথা থেকে তিনি যে বেশ কিছু সাঁটিয়ে এসেছেন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়।

তারপর কি বলবো মশাই—বসেছিলো বেড়ালটা আমাদের সবার চোখের সামনেই চোখে ওপরেই সেটা কেমন ছায়ার মত ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে সেই ছায়া [illegible] ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারে। দেবতারা যেমন অন্তর্হিত হন ঠিক সেই মতন

আমরা খাওয়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম।

কাকাবাবু খেয়ে দেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন তাঁর বেতের চেয়ারে। আমরা ছুটে [illegible] ঘটনা তাঁকে জানালাম—তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে। কিন্তু বিশদ করে সব বোঝবার আগেই তিনি লাফিয়ে উঠেছেন, তার সযত্ন সমুজ্জ্বল লাঙুলের কতোখানি কোন অদৃশ্য জীবের তাড়নায় তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো আচমকা। কাকীমার বেজায় আদরের ছিল বেড়ালটা, তার অন্তর্ধানে তার প্রাণে কিরকম ব্যথা লেগেছিল অনুমান করতে পারবেন নামজাদা বিজ্ঞানী। বৌ হলে কী হবে! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যাকে বলে তা তার আদপেই ছিলো না। বেড়ালের তিরোধানে মর্মাহত হয়ে কাকাবাবুকেই তার জন্য দায়ী করে তার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিলে

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না বলেই কাকীমার বুদ্ধি ছিলো একটু বেশী। একদিন [illegible] করলেন কি একটা বড় জামবাটিতে দুধ ভর্তি করে রেখে দিলেন ঘরের মেঝেয় আর আমাদে সবাইকে বলে দিলেন ম্যাও ম্যাও করে বেশ মৌজ করে গলা সাধতে।

আমরা সাধ্যমত সুর করছি। আমাদের সাধাসাধিতেই কিনা বলা যায় না। দেখালেন বাটির দুধ কমে আসছে—কমতে শুরু করেছে ক্রমেই। আমাদের সুরধুনি নামছেই না, বেড়ালটা [illegible] অদৃশ্য গোঁফ ডুবিয়েছে দুধ পাথারে। দুধের সেই কমতির মুখে কাকীমা করলেন কি—সুকৌশলে তার পুষিকে পাকড়ে ফেললেন। তাকে ধরে না তার গলায় একটি লাল রঙের রুমাল [illegible] দিলেন কায়দা করে।

তারপর থেকেই যতো অদ্ভুত কাণ্ড আরম্ভ হল আমাদের বাড়ীতে, নিত্য নতুন [illegible] কোথাও কিছু নেই। নাড়িময় একটা লাল রুমাল ঘুর ঘুর করছে—লাফিয়ে ঝাপিয়ে [illegible] চারধারে। কখনো বা দেখা যেত কতগুলো অগ্নিবিন্দু হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে আর তাদের [illegible] তাড়া করে চলেছে উদ্যত এক লাল ঝাণ্ডা। যাক দেখতে দেখতে এসব আমাদের গা সওয়া হয়ে গেল।

তারপর এলো আরেক উৎপাত—তার কিছুদিনের পরেই। মনে হলো অগ্নিপুচ্ছদের সংখ্যা ক্রমশঃ যেন বেড়ে চলেছে—এদিকে পুষির বংশবৃদ্ধিরও খবর পেলাম আমরা [illegible] [illegible] মিশানো মিঠে আওয়াজেই তা জানা গেল। চারধারে থেকেই অদৃশ্য কণ্ঠের অবিশ্রান্ত [illegible] আর অফুরন্ত আলোর ঝিলমিল দেখে সবাই আমরা কেমন মিইয়ে গেলাম—এমন কি আমাদের বৈজ্ঞানিক কাকাবাবুও। কুরুবংশ আর পাণ্ডুবংশ—দুই পক্ষই বাড়তে লাগল [illegible] সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে বাস করা আমাদের নিতান্তই কঠিন হয়ে [illegible] বাধ্য হলাম তারপর।

সেই [illegible] পড়ে ছিলো অ্যাদ্দিন। এখন আপনারা এসেছেন। যাইহোক আপনারা [illegible] আপনার আনাচে কানাচে অগ্নিশিখাদের নড়ে চড়ে [illegible] [illegible] ঝলকানি দেখতে পান বা কোন অলক্ষিত নখরের [illegible] তার সৃষ্টির আনন্দ—বৈজ্ঞানিক

শ। আর কাকীমার পুষির বংশ বিস্তার। তার জন্য ভয় পাবেন না যেন। অদ্ভুত হলেও ভূত ওসব। বেড়ালের ভূতটুত না—শুধু সেই একটি বেড়ালেই বেড়ে বেড়ে এখন প্রভূত রেছে. এইমাত্র। প্রীতি নমস্কার নিন,

ইতি আপনাদেরই এক অদূর প্রতিবেশী।

পুনশ্চ মাছ—আর দুধের পাত্র সব সময়েই ঢাকা দিয়ে রাখতে যেন ভুলবেন না। চিঠিখানা তে নিয়ে বিনির ঘরে যাই। এ বাড়ীর ওখানকার বাড়াবাড়ির সব রস সমস্ত রহস্য আবিষ্কার রতে চাই তার কাছে। গিয়ে দেখি বিনি দেবী বেতের চেয়ারে বসে বেতসের মতই কাঁপছেন—র দুচোখ ভয়ে বিস্ফারিত। আর তার আধ-বোনা ব্লাউজ খানা পড়ে আছে এক ধারে একান্ত বহেলায়। এবং তার উলের গুলতি নিয়ে—

গুলতি নিয়ে সাত দিক থেকে সাতটি অদৃশ্য খেলোয়াড় ফুটবল খেলতে লেগেছে খলাম। তারপর আর রহস্য বিস্তার করেও কোন ফল হ'ল না। বিজ্ঞানের মহিমা ফলাও রেও নয়—বিনি সেইদিনই সেইদণ্ডেই—আমাকে নিয়ে চলে এল সেখান থেকে। চলে এলাম মাদের পুরানো বাড়ীতে—আমার পুরাতন হার্ট ট্রাবলএ। সে বললে শুধু একটা কথায় লে—হ্যাঁ মানি এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তা বিজ্ঞানের সব দান আমাদের মাথা পেতে নিতে ব, এমন কি তা অ্যাটমবোমা হলেও একথা আমি মানতে রাজি নই।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভালো, খুবই ভালো, কিন্তু তার কাছাকাছি বাস করা কোনো মতেই লো নয়। ❑



ডাইনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের একালে ডাইনী নাই। ডাকিনী নাই। মায়াবিনী নাই।

সে হিসেবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আমলে, মানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনী ছিল। ডাইনী, ডাকি মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনী-ডাকিনীর কথা শুনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমা আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাইরের বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তালগা ঘেরা। তার উত্তর পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর।

একেবারে গ্রামের প্রান্তে। একপাশে জেলেপাড়া-অন্যপাশে বাউরীপাড়া—মাঝখানে খানিক খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘ তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ির পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি অ লালচে মাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে লালুকচাঁদা নামে পুকুরটা ছিল গ্রামের শ্মশান, এখা অবশ্য শবদাহ করা হ'ত না, মুখাগ্নি করা হ'ত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকত—মড়ার বিছা

মাদুর, বালিশ, ন্যাকড়া, বাঁশ, মাটির সরা, ভাঁড়, আধপোড়া কুঁচি-কাঠি। পুকুরটার উপরে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। দিনের বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জমাট অন্ধকারের মত থমতম করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত—সেই বটগাছটার দিকে।

আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে—প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেখানেই শুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনী কি সবুজ ভালবাসে? না—বাসতে পারে?

স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনা ডান'।

শুকনো কাঠির মত চেহারা, শক্ত দু'পাটি দাঁত, একটু কুঁজো, মাথায় একমাথা কাঁচাপাকা চুল। চোখ দুটো নরুণেচেরা চোখের মত ছোট। তাতে খয়েরী রঙের তারা। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি। ভাবলেশহীন শুষ্ক—যেন খটখট করে দুটো হলদে পাথর ওই শুকনো ডাঙ্গার বুকে। ডাইনীর দৃষ্টি!

এই দৃষ্টিতে ডাইনীরা কচি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের, তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্ম মেদ মাংস ভেদ করে—ভিতরে প্রবেশ করে—খুঁজত প্রাণপুতলী। তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝরে পড়ে, শুধু মানুষ কেন কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনিরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে।

স্তব্ধ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তালগাছের মাথায় চিল চ্যাঁচায়—চি-ই-ই-লো! চি-ই-ই-লো! চি-ই-ই-লো।

কান পেতে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়—ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী তার সুর মিলিয়ে সঙ্গীত গাইছে—অনুনাসিক মিহি সুরে গাইছে—হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-হঁ। হিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-হঁ।

রাত্রে—গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনীর ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়—শব্দ উঠছে—হুট-পাট, হুট-পাট, হুট-পাট।

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনী তারা ভগবানের অভিসম্পাতে রাত্রে মাটির উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

ভয় হয় না এর পর?

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। ওই ছিল তার জীবিকা। তিন-চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকারম্ভা, শাক, কুমড়ো এইসব। আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়িতে ঢুকতে সে চাইত না। কি জানি—কার অনিষ্ট সে কখন ক'রে বসবে। তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লক-লক ক'রে জিভ বার করে—তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে! ছি-ছি-ছি! ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়। সেই তো ওর জীবনের

মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনীটা—সে যে এক সিদ্ধবিদ্যা, তাকে কোন নূতন মানুষকে না দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণের মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী। মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল—কিন্তু কেউ যায়নি। ভয়ে যায়নি, যদি সে কোন কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ঐ সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিদ্যা! সে যে ডাইনী হয়ে যাবে।

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিত হয়েই গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে গিয়েছে। নইলে মরণ হ'ল কেমন করে? গিয়ে দেখলে—তখন মাসীর অনেক আত্মীয় এসেছে, আত্মীয়রা যা ছিল ভাগ ক'রে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা তরুণী স্বর্ণ বসে রইল দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট! হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ করে মাসীর পোষা বেড়ালটি তার গা ঘেঁষে বসল। ওটাকেই কেউ নিয়ে যায়নি। বেড়ালটা তার গায়ে গা ঘষলে, গরগর শব্দ করলে, লেজটা উঁচু করে তার নাকে-মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে—আমাকে তুমি নিয়ে চল। তুমি কিছুই পাওনি, আমাকেও কেউই নেয়নি।

স্বর্ণের মায়া হ'ল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলে পাড়ায় যায়, বাউরী পাড়ায় যায়।

সেদিন হইচই উঠল জেলে পাড়ায়।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে,—কাঁদছে যেন বেড়ালের মত আওয়াজ ক'রে!—এ্যাঁ-ও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এল। গুণীন দেখে বললে—ডাইনীর কাজ! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হ'ল না শেষটা—স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠনে, রোঁয়া ফুলিযে লেজ ফুলিয়ে—এ্যা-ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোন ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে—গেছে ডাইনী বিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণের মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই! কি সর্বনাশ!

একটা জোয়ান জেলের ছেলে—দুরন্ত ক্রোধে বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না। লেজ পাছড়াতে লাগল, নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বললে—সাবধান। কেউ যাবে না। ও এখন ডাইন মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে—বের ক'রে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল সে ওই পাপকে।

সন্ধ্যের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল—তারা ব'লে গেল—বেড়ালটা এখনও মরেনি। ইঃ—কি গোঙাচ্ছে। বাপ্ রে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ—রক্তে ধুলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে।—কি যন্ত্রণা-কাতর শব্দ!

স্বর্ণ এগিয়ে গেল—দু-পা, এক-পা ক'রে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের এ কি হল?

স্বর্ণের চোখে এ কি দৃষ্টি! এ কি হ'ল তার? এ সব সে কি দেখছে? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে—তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগলছানাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে কলা গাছটা—ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে—কলার মোচা!

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে! লকলক করে উঠছে!

একি হ'ল তার? হে ভগবান!

এমনি ক'রে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনী বিদ্যে দেবে—তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথা-ভাঙা বেড়ালটার মত কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না।

মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে—আমাকে নাও গো! আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে—কি ক'রে নেব? এই বিদ্যা তুই আগে কাউকে দে—তবে নেব। নইলে তো পারব না। স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর। সে কি গ্রামের কারুর বাড়ি যেতে পারে? বাপ্ রে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমি বলতাম—স্বর্ণ পিসী।

ছেলেবেলায় কখনও সামনে যেতে সাহস হ'ত না। বড় হবার পর ওপথে গিয়েছি এসেছি; নিজের ঘরের আধো-অন্ধকারে আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ ক'রে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে—তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হ'ল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত—সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ ক'রে সে মনে মনে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলে চোখ বন্ধ করত; চোখের ভাল লাগার অবাধ্যতাকে তিরস্কার করত। তার আশঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে;—হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠত। মনে হ'ত ডাইনীমন্ত্র-বিষাক্ত তার ভালবাসা—লোভ হয়ে তীরের মত গিয়ে তাকে বিঁধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে।

ডাইনীতে আজ আর বিশ্বাস করি না। এ-কালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীত্বের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই ক'দিন আগের দেখা ঘটনা। হঠাৎ শুনলাম—ও-পাড়ার অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইন খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে--দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে শুষে খাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় ক'রে উঠল। বিখ্যাত গুণীন ছিলেন আমাদেরই বাড়িতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইখানে থাকতেন এক সন্ন্যাসী, পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাঁকে বলতাম গোঁসাইবাবা ; অর্থাৎ গোস্বামীবাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এলেন ; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম, স্বর্ণ ডাইনের কীর্তি দেখতে এবং গোঁসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশদাদার, অবিনাশ মুখুজ্জের, বয়স তখন সতের-আঠারো। বাড়িতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশ দাদার মা—গোঁসাইবাবাকে বলেন গোঁসাই-দাদা। অবিনাশদাদা বলেন--গোঁসাইমামা। অবিনাশদাদার বাড়ি তখন লোকে লোকারণ্য ; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার উপরে অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। প্রবল জ্বর। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়রে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জল ফেলছেন। রামজী সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন--তার পাশেই আমি।

ডাকলেন—ভাগ্না। অবিনাশ ভাগ্না।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘুরে শুল। বললে—মর হা-ঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন?

—হুঁ। তু কৌন? মেয়েছেলে? কে রে তু?

অবিনাশ উত্তর দিল না।

—এ। তু কে রে? এ?

—বলব না।

—বলবি না।

—না।

মন্ত্র-পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন—ছু! ছু! ছু!

পরিত্রাহি চীৎকার করে অবিনাশ।—বলছি, বলছি, বলছি!

তবু মন্ত্র-পড়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকার।—ছু! ছু! ছু!

—বাবা রে, মা রে। মরে গেলাম রে! ও গোঁসাই, আর মেরো না! বলছি, আমি বলছি!

—বোল। বোল তু কে? বোল।

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি।--আমি স্বর্ণ! চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! থাক সে কথা।

গোঁসাই প্রশ্ন করলেন—স্বর্ণ? তু কাহে হিঁয়া? আঁ? এখানে কাহে?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ—হাঁ। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি---কাহে—কাহে খেলি?

—কি করব? আমার ঘরের সামনে দিয়ে এই বড় বড আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা, ভাগ্।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বোলো না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন—যা তু। হামি বলছে।

না! বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা! এ দিদি, আন সর্‌ষা।

সরষে এল। হাতেব মুঠোয় সব্‌ষা নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র প'ড়ে—ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবা রে, মা রে, ওরে মেরে ফেললে রে! ওরে বাবা রে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না। আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশ কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

পারছিস না? চালাকি লাগাইয়েছিস, আঁ? হাত তুললেন রামজী সাধু, মারবেন ছিটে। অবিনাশ চীৎকার করলে আবার—না না। যাব, যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

—তব্ এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে, দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশ উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন—না। ঘর থেকে অবিনাশ বের হ'ল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতালার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলো। দাঁতে ধ'রেই সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে

কলসীটা খ'সে প'ড়ে ভেঙ্গে গেল, সে নিজেও প'ড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্য-যুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলে ক'রে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি। এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ! মামা!

—অ্যাঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেক দিন পর, এখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান, তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।

স্বর্ণ আসত এর পর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, দেখতাম স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল, মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে, আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে ব'সে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গান-গল্প করছে, এমন সময় আকাশ-পথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলেছে। সকলে বিস্মিত হ'ল—এ কি? আশ্চর্য মেঘ তো!

গুণীন হেসে বললে—মেঘ নয়। গাছ উড়ে চলেছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে?—কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনী-বিদ্যা যারা জানে, তারা গাছে ব'সে বিদ্যার প্রভাবে গাছকে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তরে। ডাকিনী চলেছে আকাশ-পথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে—তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, এক সঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুরন্ত ক্রোধে আকাশের বুক-চিরে চীৎকার ক'রে উঠল, ঈ—!

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মত জিনিসটির গতি থামল না, কিন্তু সে সামনে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, একপিঠ এলোচুল, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে? আমি ডাকিনী হলেও মেয়েছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িয়ে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী—তাদের সবুর হ'ল না ; একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমক দিলে—না!

ততক্ষণে আর একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুড়ে দিলে। গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছাটার প্রান্তটা ধ'রে উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়াও পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশঃ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উল্টে গেল। চামড়া ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ ক'রে উঠল। ডাকিনীর খিলখিল হাসি উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে। গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল ; মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চ'লে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে। ওই অশ্বত্থ গাছটা সেই আধখানা গাছ।

আজ সে কালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজও ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সে কালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই—আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত, নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য ব'লে, আর ভগবানকে ডাকত—স্বর্ণের মত—আমার এ-লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু, এ ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান কর। চোখের জল মুছে ফেলত কাপড়ের আঁচলে ; মাটিতে কোনক্রমে একফোঁটা ঝরে পড়লে—শিউরে উঠত। মা বসুমতীর বুক যে জ্বলে উঠবে। ❑



ডাক্তারের সাহস

প্রবোধকুমার সান্যাল

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুয়েক গেলেই বরাহনগর. আজকাল শ্যামবাজার থেকে মোটর-বাসে যাওয়া যায়—আগে যেতে হোত হেঁটে কিংবা 'শেয়ারের' গাড়ীতে। শেয়ারের গাড়ী ছাড়ত কোম্পানীর বাগানের মোড় থেকে, এক-একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কল-কারখানা, মুটে-মজুর, দোকান-বাজার, পাট আর ভুষিমালের আড়ৎ—এইসবের ভীড় ছিল বেশী। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হৈ-চৈ, গরুরগাড়ীর দল, জন-মজুরের হল্লা. মালগাড়ীর আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগে থাকত। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই. পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি. রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না ; মাঝে মাঝে এক-আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চলে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেকদিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টীমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন. আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন. সেই

পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ী অনেকদিন থেকে পড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে সন্ধ্যার পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়ীটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার-বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই—কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে। কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের প্রবীণ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ীটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ বাদুড় আর চামচিকের বাসা, শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি। শুধু তাই নয়। লোকের বিশ্বাস এ বাড়ীতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের একটি মেয়ে নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ীর অন্দর-মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও-পাড়ার লোক বেশী মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হলে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যেদের জামাই এ-সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তী-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার করে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে এসেছেন। এ-পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোক্‌রাদের দলে তাঁর নাম-ডাক খুব। একদিন ভূতের বাড়ীর আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন—যদি একটা রাত আমি ও বাড়ীতে কাটিয়ে আসতে পারি, তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে,—একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দুঘণ্টার বেশী যদি আপনি থাকতে পারেন, তবে কি বলেছি!

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন—কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে—বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

—আচ্ছা সেই ভলো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হোল না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন—অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও-বাড়ীতে যেয়ো না, বাবা। একটা ভালোমন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন—আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

—আমাদের কথা তবে শুনবে না?

—আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ীর সকলে কান্নাকাটি করে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত জামাই তাদের না হালেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললেন—আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললেন—বাঁচলে ত সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শ[illegible] আছে—তাঁর ভয় কি? সকলের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সে-দিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যান্ট পরে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা ক[illegible] হেসে বললেন—রেডি!

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সোরগো[illegible] করে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিতরে তন্ন তন্ন করে দেখে এল। শীতের দিন, সুতর[illegible] বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হোলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলে[illegible] ওপর ; একটা জলের কুঁজো আর কাচের গেলাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডে[illegible] একটা উজ্জ্বল আলো। টমী—চিরবিশ্বস্ত টমী ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকা[illegible] করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে একসঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ীর ভয়ানক অন্ধকার গহ্[illegible] থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনো দিকে তাকাতে সাহস করলে না—পাছে কি[illegible] বিভীষিকা তাদের চোখে পড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্[illegible] নির্বাসিত হয়ে রইলেন, এবং তাঁর ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে[illegible] সবাই যে যার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল।

ঘরের দরজা-জানলা একে একে সব বন্ধ করে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই[illegible] বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারদিক নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ। এ[illegible] বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তা-ঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্ম-কোলাহলম[illegible] জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কে[illegible] কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে[illegible]

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিঃশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখ[illegible] ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তা[illegible] এই দুর্বলতা। মনে হোল, ঘড়িটায় যেন আরো একটু আস্তে শব্দ হোলে ভালো হয়। ওটা ভয়ান[illegible] জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানার ওপর বসে ডাক্তার একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। দেওয়ালগুলে[illegible] জীর্ণ, তার গায়ে নানারকম আঁজিবুঁজি কাটা—অনেকটা যেন মানুষের কঙ্কালের মতো।

খুট্ খুট্—

ডাক্তার চম্‌কে ফিরে তাকালেন। না, কেউ নয়—বাতাসের শব্দ। না, বাতাসের নয়—বোধহয় কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন্ দিকে? জানালায় না দরজায়?

খট্ খট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায়? টমী মুখ তুলে তাকালে। একবার সে একটু গোঁ গোঁ ক[illegible] উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয়—বাতাস। পুরানো দরজা, বাতাসে এক[illegible] নড়ে বৈকি। টমী তার প্রভুর কোলের কাছে আবার মুখ নীচু করে পড়ে রইল। ডাক্তার হা[illegible] বুলিয়ে দেখলেন, তাঁর বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়[illegible] চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হারিয়ে ফেলছেন। ত[illegible] অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেও কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মতো প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে। ও কি? দেওয়ালের সেই আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নড়ছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকার রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু করে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেওয়ালে উঠে দাঁড়াল। এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

হাত বাড়িয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধরবার চেষ্টা করলেন কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা ত তাঁর কাছে নেই? কে নিলে? ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরেছে! স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিঃশ্বাস নেই। তিনি নড়বার চেষ্টা করলেন কিন্তু সম্ভব হোল না, খাটের সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, কাচের গেলাসটা দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উড়ছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছেন। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আর্তনাদ করে উঠল।

খট্ খট্ খট্—

কিসের শব্দ? কই টমী ত আর গোঁ গোঁ ক'রে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমীর গায়ে একটা চিম্‌টি কাটলেন ; এত জোরে যে, টমীর গায়ের মাংস খানিকটা তাঁর আঙ্গুলে ছিঁড়ে উঠে এল। কিন্তু কই, টমী ত জাগলো না? তবে? তবে? বেঁচে আছে ত? টমী বেঁচে নেই, তার নিঃশ্বাস পড়ছে না, তার সর্বশরীরে একবিন্দু প্রাণ নেই—মরে সে কাঠের মতো পড়ে রয়েছে। এ-পাশে বন্দুক নেই, ও-পাশে টমী নেই।

ঘড়িটায় আর টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে। কে দিলে থামিয়ে? টেবিল্‌টা এইবার ন'ড়ে উঠল, পায়া চারটে ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমী, টমী? টমী বেঁচে নেই—বাঁ-হাতের কাছে তার মৃতদেহ অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাচের গেলাসটা উড়ছে, টেবিল্‌টা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা-জানলাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কারা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়—এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারদিকে ছুটছে। কে তাঁকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছেন না, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিঃশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিঃশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। তিনি কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলেও পারলেন না। গলা তাঁর বন্ধ, হাত-পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তাঁর

মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে—তাঁকে নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে। টমী টমী? টমী মরে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমীর মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমী নখর বিস্তার করে তাঁর দিকে মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমী দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো—আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাঁকে নিয়ে যাবে, ভূত-প্রেতের রহস্যরাজ্যে ঊর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খসে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছেন, হয়ত কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে পড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল,—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে। চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে। ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল-কুঁজো ও গেলাস, তাঁর বন্দুক আর টমী। গলার আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন—যাই হে, দাঁড়াও! ❑





রক্তের ফোঁটা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাচ্ছিল অনিমেষ। মুহূর্তে রেলিংটা ধরে ফেলে সামলাল নিজেকে।

নিচের দিকে তাকাল। কই কিছুই পড়ে-টড়ে নেই তো! কলার খোসা, আমের চোকলা, বেকেলের ছোবড়া—কিছু নেই তো! জলও তো নেই এক ফোঁটা। শুকনো খটখটে সিঁড়ি। জুতোর তলাটাও দেখল একবার। সেখানেও কিছু লেগে নেই।

মনে মনে হাসল অনিমেষ। খুব তাড়াতাড়ি করছিল বলেই হয়তো পা বেচাল হয়ে পড়েছিল। ছন্দ রাখতে পারেনি ঠিকমত।

চক্ষের পলকে কী দুর্ঘটনাই না হতে পারত। ভাঙতে পারত হাড়গোড়, মাথা, মেরুদণ্ড। এতক্ষণে তাহলে রেল স্টেশনের পথে না হয়ে হাসপাতালের পথে। ট্যাক্সিতে না হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে। সত্যি, এক চুলের ফারাক একটা সুতোর এদিক-ওদিক।

এত তাড়াহুড়োর কোনো মানে হয় না। অনিমেষের এখন বয়স হয়েছে। তার ধীর-স্থির হওয়া উচিত।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক সময়ে, সমর্থ হাতে রেলিংটা ধরে ফেলতে পারল। ঠিক অত ঃ রেলিং, পড়বার সময় হাতের হিসেব থাকল কী করে? মনে হল কে যেন হাতের ক রেলিংটা এগিয়ে এনে দিয়েছে।

কিছু বলেনি, তবু ট্যাক্সিটাও ছুটেছে প্রাণপণ। যেন ড্রাইভারেরও ভীষণ তাড়া। কিন্তু ে ছুটলেই আগে পৌঁছুনো যায় না সব সময়।

মনে হচ্ছিল, ট্যাক্সিটাই অ্যাক্‌সিডেন্ট করে বসবে। হয় কাউকে চাপা দেবে নয়তো হু খেয়ে পড়বে কোনো গাড়ির উপর, নয়তো কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ। অত শত না হয়, নি জ্যাম হবে রাস্তায়। ট্যাক্সিটা পৌঁছুতে পারবে না। ট্রেন ছেড়ে দেবে।

যেন এত সুখ সহ্য করবার নয়। ভাগ্য ঠিক বাদ সাধবে। বাগড়া দেবে। না, হন্তদন্ত ট্যা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। ট্রেনটা ছাড়েনি। কামরার খোলা দরজার উপর অনীতা দাঁড়ি

'বাবাঃ আসতে পারলে!' অনীতা খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

'কত বাধা, কত বিপদ—'

'বাঃ, আর বাধা-বিপদ কোথায়! সব তো খোলসা হয়ে গিয়েছে!' অনীতা নির্মুক্ত ম হাসল : 'এখন তো ফাঁকা মাঠ।'

'যাকে বলে, লাইন ক্লিয়ার।' অনিমেষও হাসল স্বচ্ছন্দে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা হুইসল দিয়ে উঠল।

অনিমেষ বুঝি উঠতে যাচ্ছিল, অনীতা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'আর উঠে কি হবে? গা ছেড়ে দিচ্ছে।'

'না, ওটা অন্য প্ল্যাটফর্মের ইঞ্জিন।'

'যা, ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।' বললে অনিমেষ।

'তোমার সবতাতেই ভয়।' একটু-বা ব্যঙ্গ মেশাল অনীতা।

'না, ভয় আর কোথায়?' কামরাতে উঠল অনিমেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ সামান্য্য কয়েক মিনিট বাকি আছে। বললে, 'কিছুক্ষণ বাকি।'

'কিন্তু কতক্ষণ?'

'ধরো এক বছর।' কথাটাকে অন্য অর্থে নিয়ে গেল অনিমেষ।

'না না, অতদিন কেন? এ কি আমরা ডিভোর্সের পর বিয়ে করতে যাচ্ছি যে এক ব অপেক্ষা করতে হবে!'

'না, তা নয়, তবে'—অনিমেষ আমতা-আমতা করতে লাগল।

'তবে-টবে নয়।' অনীতা অসহিষ্ণু হয়ে বললে,—'শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গিয়েছে, এখন ত তোমার দ্বিধা কী!'

'তবু লোকে বলে, এক বছর অপেক্ষা করা ভালো।'

'ছাই বলে! কেউ বলে না। আমি কত বছর অপেক্ষা করে আছি বলো তো!' কণ্ঠ অভিমান আনল অনীতা : 'আর আমি দেরি করতে প্রস্তুত নই।'

'কিন্তু চলেছ তো কলকাতার বাইরে!'

'কী করব! হঠাৎ বদলি করে দিল! তাতে কী হয়েছে, তুমি দিনক্ষণ ঠিক করে চিঠি
আমি ঝপ করে চলে আসব।' লঘুভাবে হাসল অনীতা ঃ 'বিয়ে করতে আর হাঙ্গামা

'শুনছি আমাকেও নাকি বাইরে ঠেলে দেবে।'

'দিক না। তাহলে মফঃস্বলে যাব। আর যদি না দেয়, কলকাতায়ই থাকো, চলে আসব খানে। মোট কথা চোখে তীক্ষ্ণ আকুতি নিয়ে তাকাল অনীতা ঃ 'শুভস্য শীঘ্রম্।'

'লোকে কী বলবে!'

'লোকের কথা ছেড়ে দাও।'

'লোকে বলবে বউ মারা যাবার এক মাস পরেই বিয়ে করল।'

'এক বছর পরে করলেও বলবে।' একটু-বা তপ্ত হল অনীতা ঃ 'লোকের হাতে সৃষ্টি-তি-প্রলয়ের ভার নেই। লোকে কী জানে আমার তপস্যার কথা।'

'তপস্যা?'

'হ্যাঁ, প্রতীক্ষা আর প্রার্থনাই তপস্যা।' অনীতা ঘড়ির দিকে তাকাল। 'তোমার বিয়ের প্রায় ছর পর আমাদের দেখা। তুমি আমাকে বললে, তুমি আমার পরম হয়ে এলে তো প্রথম হয়ে লে না কেন? সেই থেকেই প্রার্থনা করছি, প্রতীক্ষা করে আছি, কবে সে চরম দিন আসবে, ব পথ পরিষ্কার হবে। তিন বছরেব পর সেই সুযোগ আজ এল। এই তিন বছর সমানে কাঙক্ষা করে এসেছি আমাদের স্বাধীনতা।'

অর্থাৎ গত তিন বছর ধরেই অনীতা সুরভির মৃত্যুকামনা করে এসেছে।

বুকের মধ্যে একটা ঘা মারার শব্দ শুনল অনিমেষ। সে শব্দ কি তারও আকাঙক্ষার তিধ্বনি!

না, তা কি করে হয়! সুরভি বেঁচেছিল বলেই তো অনীতার প্রতি তার আকর্ষণ এত জ্বলন্ত ন জীবন্ত ছিল। সুরভি আজ বেঁচে নেই, তাই কি অনীতাও আজ স্তিমিত নিষ্প্রভ?

'এ কী, ট্রেন ছাড়ছে না কেন?' সময় কখন হয়ে গেছে, তবু ছাড়বার নাম নেই। ছাড়বার টা পড়লেই তো অনিমেষ নেমে যেতে পারে। রুমাল নেড়ে দিতে পারে বিদায়।

কি একটা গোলমালে ট্রেনটা থেমে আছে, ছাড়ছে না। দীর্ঘতর হচ্ছে এই নিষ্ফল সান্নিধ্য।

সব ট্রেনই ছাড়ে, ছেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অনীতারটাও ছাড়ল।

নামতে গিয়ে অনিমেষ আবার পড়ল নাকি পা হড়কে? না, সে অত অপোগণ্ড নয়। তার য়ের নিচে মোলায়েম প্ল্যাটফর্ম কে ঠিক পৌঁছে দিয়েছে।

মফঃস্বলে বদলি হয়ে এসেছে অনিমেষ।

ভালোই হয়েছে। বদল হয়েছে পরিবেশের। মেঝেতে পায়ে-পায়ে আলতার দাগ ফেলা ই, নেই আর স্মৃতির রক্তাক্ত কণ্টক।

ছোট ছাতওলা বাড়ি, উপরে দুখানা মোটে ঘর। একটা শোবার আরেকটা বসবার। নিচে চি-চাকর। এর চেয়ে আরো ছোট হলে চলে কি করে? তবু অনিমেষের যেন কি রকম কা-ফাঁকা লাগে। এদিক-ওদিক প্রতিবেশীদের বাড়িঘরগুলি কেমন দূর-দূর মনে হয়। মনে হয়

বাড়িটাকে ঘিরে যেন অনেক গাছপালা, অনেক হাওয়া, অনেক অন্ধকার। গাড়িঘোড়ার আওয় অনেক পর-পর শোনা যায়, ফিরিওয়ালারা এদিকে কম আসে। অথচ নদী কত দূরে, মধ্যরা একটু হাওয়া উঠলেই শোনা যায় গোঙানি।

কাজে-কর্মে লোকজন আসে কিন্তু তাদেরও আসার মানেই হচ্ছে চলে যাওয়া। স: ভিতর-বার আশ-পাশ একটা শূন্যতার শ্বাস দিয়ে ভরা।

না, আসুক অনীতা। ঘরদোর ভরে তুলুক।

আশ্চর্য সেই রকমই চিঠি লিখেছে অনীতা। এই মফঃস্বল শহরেই সে একটা উচ্চ চাকরির জন্যে আবেদন করেছে। কদিন পরেই ইনটারভিউ।

হ্যাঁ, কোথায় আর উঠবে, অনিমেষেরই অতিথি হবে অনীতা।

চিঠি লিখে বারণ করল অনিমেষ। তুমি এস, থাকো, চাকরি করো কিন্তু আমার বাড়ি উঠো না। অন্তত এখন নয়, একেবারে আজকেই নয়। জানোই তো, আমার বাড়িতে মেয়েছে কেউ নেই। তোমার অসুবিধে হবে। তা ছাড়া আমি দুর্বার একা।

আগে অধিষ্ঠিত হও, পরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পাল্টা জবাব দিল অনীতা। প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে। লিখলে, আমি একজন সম্ভ্র পদস্থ শিক্ষিকা, একটা চাকরির সম্পর্কেই তোমার কাছে একদিনের সাময়িক আশ্রয় চাইছি, অ কোনো উদ্দেশ্যে নয়। আর, নিজেকে অত দুর্বার বলে স্পর্ধা করো না। ভাববে আমার প্রতিরো: দুঃসাধ্য। অন্তত যতক্ষণ আমি সম্ভ্রান্ত, পদস্থ শিক্ষিকা।

না, তুমি এস। ঝগড়াঝাঁটির কী দরকার! তুমি এলে কত গল্প করা যাবে। কত হাসা য মন খুলে। স্তব্ধতাকেও কত মনে হবে রমণীয়।

আজ সন্ধ্যের ট্রেনে আসবে অনীতা। শুধু রাতটুকু থাকবে। কাল সকালে ইন্টারভি দিয়েই দুপুরের ট্রেনে ফিরে যাবে নিজের জায়গায়।

সকাল থেকেই মেঘ-মেঘ বৃষ্টি-বৃষ্টি। দুপুরে ঘনঘোর করে বর্ষা নেমেছে। সন্ধ্যের দি তোড়টা কমলেও হাওয়াটা পড়েনি। চলেছে জোলো হাওয়ার ঝাপটা।

স্টেশনে এসে অনিমেষ শুনল গাড়ি তিন ঘণ্টার উপর লেট।

ভীষণ দমে গেল শুনে। বাইরে দুর্যোগ থাকলেও অন্তরে বুঝি একটি আগুনের ভাণ্ড ছি সেটা নিবে গেল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে।

রাস্তায় জনমানব নেই। দোকানপাট বন্ধ। শুধু একলা এক পথহারা হাওয়া এলোমে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

সাইকেল রিকসা করে বাড়ি ফিরল অনিমেষ।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখল এ কী! তার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে! দরজা তালাব হাওয়ার দাপটে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়েছে, তারই মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলো। ত কি ঘর বন্ধ করে বেরুবার আগে ভুলে সুইচটা অন করে রেখেছিল? তাই হবে, নইলে আ জ্বলে কী করে? পথে আসতে দেখছিল, স্টেশনেও তাই, ঝড়ে উৎপাতে সারা শহরের কা অফ হয়ে গিয়েছিল। কে জানে, কারেন্ট হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বারান্দার সুই টিপল, আলো জ্বলল না। হয়তো বারান্দার বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই ঘরে আর আলো নেই।

মুখস্থ জায়গায় হাত রেখে সুইচ পেল অনিমেষ। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। না, আসে নি কারেন্ট। কিংবা এসে এখন আবার অফ হয়েছে।

হাতের টর্চ টিপল অনিমেষ। মনে হল ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন নড়ছে-চড়ছে, ঘোরাঘুরি করছে! অন্ধকার কোথায়! একটা লোক।

'কে?' ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল অনিমেষ।

দরজা খোলা পেয়ে লোকটা পালিয়ে গেল বুঝি! অনিমেষ প্রবল শক্তিতে দরজা বন্ধ করল। প্রায়ই কারেন্ট বন্ধ হয় বলে ক্যান্ডেল আর দেশলাই হাতের কাছে মজুত রাখে। তাই জ্বালাল এখন। হোক মৃদু, একটা স্থির অবিচ্ছিন্ন আলো দরকার।

কই, লোকটা যায় নি তো! খাটের বাজু ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে!

'এ কে?' একটা বোবা আতঙ্ক অনিমেষের গলা টিপে ধরল। 'এ যে সুরভি!'

পরনে কস্তাপাড় শাড়ি, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর, খালি পায়ে টুকটুকে আলতা, ঠোঁট দুখানি চুনে-খয়েরে রঙিন করা—সুরভি ডান হাতের তর্জনী তার ঠোঁটের উপর রাখল। যেন ইঙ্গিত করল, অনিমেষ যেন না চেঁচায়, না কথা বলে।

তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে দেয়ালের দিকে সরে গেল সুরভি। সরে গেল যেখানে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একটা তারিখের উপর আঙুল রাখল। দুই চোখে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনা পুরে তাকাল অনিমেষের দিকে।

সেই চিহ্নিত তারিখে টর্চের আলো ফেলল অনিমেষ। দেখল, আঙুলের ডগায় করে এক ফোঁটা রক্তের দাগ রেখেছে তারিখে।

কোন তারিখ? এ তো আজকের তারিখ। বাংলা আঠাশে আষাঢ়। বেস্পতিবার।

আঠাশে আষাঢ় কী? আঠাশে আষাঢ় অনিমেষ-সুরভির বিয়ের দিন। একদম ভুলে গিয়েছিল। আর আর বছর সুরভিই মনে করিয়ে দিত, এবারও তেমনি মনে করিয়ে দিতে এসেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছে সুরভি। কেমন মজা। যেতে না যেতেই মুছে দিয়েছ মন থেকে। মুছে দিয়েছ দেয়াল থেকে। ঘুরে ঘুরে চারদিকের দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল। আমার একটা ছবিও কোথাও রাখ নি।

'সুরভি!' তাকে ব্যাকুল হাতে ধরতে গেল অনিমেষ।

হা-হা-হা করে একটা বাতাস ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। বন্ধ দরজা-জানলা ঝরঝর ঝরঝর করে উঠল। সিঁড়িতে শোনা গেল নেমে যাবার পায়ের শব্দ। শুধু যেন সুরভি একা নয়, তার সঙ্গে আছে আরো অনেকে। একসঙ্গে নেমে যাচ্ছে। কেবল নেমে যাচ্ছে। ভারী পায়ে ক্লান্ত পায়ে নেমে যাচ্ছে।

ভয়ে আপাদমস্তক ঘেমে উঠল অনিমেষের।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। মনে হল এ আলো নয়, কে যেন সহসা হেসে উঠেছে খিলখিল করে।

তাড়াতাড়ি অল্প-স্বল্প খেয়ে শুয়ে পড়ল অনিমেষ। টর্চ, ছাতি, ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে চাকরকে পাঠালো স্টেশনে। যত টাকা লাগুক যেন রিক্সা ঠিক রাখে। যত দেরিই হোক, ঠিকমত আসতে পারে যেন অনীতা।

ঘড়িতে রাত বেশি হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্ত রাত। গাছগাছালির মধ্যে বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন রুদ্ধশ্বাস কবরের স্তূপ। কেবল বাতাসের হা-হা, ডালপালার কাতরতা।

বিছানায় জেগে বই পড়ছে অনিমেষ। জাগ্রত সমর্থ বন্ধুর মত আলোটা রয়েছে চোখের উপর।

খট-খট খট-খট। দরজায় কে আঙুলেব শব্দ করল।

চমকে উঠল অনিমেষ। নিশ্চয় মানুষ! অন্য কেউ হলে আলো নিবে যেত, হাওয়া উঠে দরজা-জানলা কাঁপাত, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হত, নয়তো কুকুর কোথাও কাঁদত মরাকান্না। মানুষ বলেই বারান্দার আলোটাও নেবে নি।

ভয়ের জন্যে লজ্জা হতে লাগল অনিমেষের। বালিশের নিচে হাত দিয়ে রিভলবারটা একবার অনুভব করল।

ধীরে ধীরে খুলে দিল দরজা।

'এ কী! তুমি—অনীতা?'

'উঃ, কী ভীষণ লেট তোমাদের গাড়ি। আর তারপর কী জঘন্য বৃষ্টি!'

'তোমার জন্যে স্টেশনে চাকর পাঠিয়েছিলাম, সে কোথায়?'

'কই কারু সঙ্গে দেখা হয় নি তো। একাই চলে এলাম।' ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনীতা।

'তোমার মালপত্র কোথায়?'

'সব স্টেশনে পড়ে আছে। শোনো, আমি ভীষণ ক্লান্ত। এক গ্লাস জল খাব।'

টেবিলের উপর ঢাকা গ্লাসে জল ছিল, তাই ঢক ঢক করে খেয়ে নিল অনীতা। বললে, 'শোবার জায়গা করেছ কোথায়?'

'পাশের ঘরে।'

'আমি যাই, শুয়ে পড়ি গে। দাঁড়াতে পারছি না!' ম্লানরেখায় হাসল অনীতা ঃ 'নিদারুণ ঘুম পেয়েছে।'

'বাঃ, সে কী! খাবে না?'

'না, পথে অনেক খাওয়া হয়েছে। আচ্ছা আসি।' পাশের ঘরে গিয়ে দ্রুত হাতে দরজায় খিল চাপাল অনীতা।

তবু দরজায় মুখ রেখে বলল অনিমেষ, 'ঘরের আলোটা জ্বেলে রেখো। আর দেখো, নতুন জায়গায় যেন ভয় পেয়ো না। ভয় পেলে আমাকে ডেকো।'

অনীতার যেন আর কিছুতে ভয় নেই, তার বুঝি অনিমেষকেই ভয়।

কেন, কেন দুজনে আজ ঝড়ের রাতে একসঙ্গে একঘরে থাকবে না? থাকলে জীবন্ত লোকের সংস্পর্শে পরস্পরের আর ভয় থাকত না। আব যে ভয়েব কথা অনীতা ভেবেছে সে যে কত অবাস্তব গায়ের উত্তাপে বুঝিয়ে দিত।

তখন কত রাত কে জানে? দুঘরের মাঝের দরজায় টুক করে একটা শব্দ হল। সে শব্দ স্পষ্ট চিনল অনিমেষ। সে খিল খোলার শব্দ।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বিছানায় বসে রইল অনিমেষ।

কই অনীতা এল না এ ঘরে।

না, অনিমেষকেই ডাকছে অনীতা। এক নির্জনতা ডাকছে এক নিঃসঙ্গতাকে। এক ভয় আরেক ভয়কে।

পা টিপে টিপে অনিমেষই উঠে গেল। খোলা দরজায় ঠেলা দিয়ে ঢুকল ওঘরে।

দেখল, আলোতে দেখল, একি, অনীতা কোথায়? তার বদলে খাটে পাতা বিছানায়, বিলোল ভঙ্গিতে সুরভি শুয়ে আছে!

'অনীতা, অনীতা কোথায়?' চিৎকার করে উঠল অনিমেষ। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

পরদিন সকালে হাসপাতালে অনিমেষের জ্ঞান হল। একটু সুস্থ হলে শুনল গতরাত্রে ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে অনীতা মারা গেছে আর ক্যালেন্ডারের তারিখে যে রক্তবিন্দুটা দেখেছিল সেটা আসলে লালকালির চিহ্ন, মরবার অনেক আগেই তারিখটা দাগিয়ে রেখেছিল সুরভি। ❑





প্রেতে ও মানুষে

তুষারকান্তি ঘোষ

সে আজ অনেক কালেব কথা। তখন বাংলার পল্লী অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং শহর অঞ্চলের এত উন্নতি হয়নি। তখন লোকের অভাব অভিযোগ কম ছিল, কারণ জিনিসপত্র ছিল খুব সস্তা। বাঙালী চাকরিব জন্য পাগল হয়ে শহরে ছুটে আসত না। গ্রামের নদী, পুষ্করিণী ও শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করত। গ্রামের জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকেরা তখন গ্রামেই থাকতেন। পরিবার সকল একান্নবর্তী ছিল এবং পুরুষেরা কেউ কেউ রোজগারের জন্য বিদেশে গেলেও বাকি সকলে গ্রামেই থাকতেন। সে সময় বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, সেই জন্য জমি পতিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের আশ-পাশ নির্জন থাকাতে, লোকের মন ডাকাত ও ভূত-প্রেতের ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল। তখন গঙ্গা ময়রার মত রোজারা বহু রোজগাব করতেন। শিকড়-বাকড়ে লোকের বিশ্বাস ছিল ; অবশ্য তাদের গুণ ছিল যথেষ্ট।

সেই কালে, আমাদেব যশোর জেলার কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ করতেন। গ্রামের নাম ছিল কল্যাণপুর আর দেবেনবাবু ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার। দু'মহলা চক-মিলান বাড়ি ছিল। বাইরের মহলে ছিল জমিদারবাবুর বৈঠকখানা, নায়েব গোমস্তাদের দপ্তর এবং বাইরের কোন অতিথি এলে তাদের থাকবার ঘর। বাইরের মহলের পর উঠোন, তার

পরেই অন্দর-বাড়ি। বাইরের উঠোনের রক থেকে অন্দরমহলে যাবার একটি গলিপথ ছিল। অর্থাৎ বাইরের উঠোনের অন্দরের দিকেব রক থেকে সেই গলিপথ দিয়ে অন্দরের উঠোনের বকে যাওয়া যেত। অন্দর-বাড়ির মস্ত উঠোন। সেই দিকেই রান্না-বাড়ি, ভাঁড়ার-ঘর, দাসীদের থাকবার ঘর ছিল। অন্দরের দোতলায় দেবেনবাবুর পরিবারবর্গ বাস করতেন।

কল্যাণপুরের দশ মাইল উত্তরে উষা গ্রামে দেবেনবাবুর জমিদারী ছিল। এই গ্রামে নায়েব তসিলদার ছিলেন রামচন্দ্র পাল। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নরেন বা নরু। সে সেই বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নরেন রামবাবুকে বললে, "বাবা, আমাদের বাড়িতে মোটে দুটি ঘর। আমার পড়াশুনোর বড় অসুবিধা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার আগে এই দুটো মাস আমি যদি অন্য কোন স্থানে থেকে পড়তে পারতুম, তা'হলে আমি পাস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।" রামবাবু কথাটা বুঝলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। উষা গ্রাম ছিল খুব ছোট। গ্রামটির তিন দিকে জঙ্গল ও একদিকে ছিল প্রকাণ্ড মাঠ। যদিও এই গ্রামে কয়েক ঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাস ছিল, কাহারও এমন বড় বাড়ি ছিল না যেখানে একটি খালি ঘর পাওয়া যায়। এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে জমিদার মশায়ের কথা রামবাবুর মনে পড়ল। দেবেনবাবু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্রলোক ও দয়ালু। রামবাবু নিশ্চিত জানতেন যে তাঁর ছেলেকে দু'মাসের জন্যে স্থান দিতে জমিদারবাবু কখনও আপত্তি করবেন না। তিনি তাঁর ছেলে নরুকে বললেন, "বাবা, আমি তোমার থাকবার স্থান স্থির করেছি। আমি আজই কল্যাণপুরে গিয়ে বাবু মশাইকে অনুরোধ করব তিনি যেন তোমাকে পরীক্ষার দুটো মাস তাঁর বাড়িতে রাখেন। কিন্তু বাবা, একটা কথা বলি। সেই বাড়িতে বাবু মশাইয়ের পরিবারবর্গ বাস করেন। হয়ত তাঁরা তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করবেন। তুমিও তাঁদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। তোমার আঠার বছর বয়স হয়েছে, তোমাকে বেশী কিছু বলা বাহুল্য। দেখো বাবা, কেউ যেন আমার নরুর নিন্দে না করে।" নরু বলল, "বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের মনিব বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কিরূপভাবে ব্যবহার করতে হয় তা আমি জানি। তা'ছাড়া আমি তো দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তোমার ভয় নেই, কেউ তোমার ছেলের নিন্দে করবে না।"

রামবাবু যা ভেবেছিলেন, তাই হোল। জমিদারবাবু অতি আনন্দের সঙ্গে নরেনকে তাঁর বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন। নরেন যে ঘরটি পেলে তার দরজার সামনেই রক, তারপরেই উঠোন এবং উঠোনের অপর দিকে অন্দরমহলে যাবার রক, যেখান থেকে অন্দরের উঠোনে যাবার শুঁড়ি-পথটি আরম্ভ হয়েছে। নরেন এই ঘরে থেকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সে অন্দরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করত এবং অতি শীঘ্রই জমিদার গৃহিণী ও তাঁহার কন্যাদের স্নেহ আকর্ষণ করে নিল। নরেন ছিল শান্তশিষ্ট ও বিনয়ী। সেই জন্যে সে সকলকার স্নেহ-ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারত। জমিদার গৃহিণী ও কন্যারা নরেনের সঙ্গে আপনজনের মত ব্যবহার করতেন। এইভাবে নরেন কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হল। নরেন তার লেখাপড়ার একটি প্রণালী স্থির করে, দিন-রাতে ক'ঘণ্টা কি বিষয়ে পাঠ করবে তা' ঠিক করে নিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরও সে ঘণ্টা-দুই লেখাপড়া করত। রাত ঠিক বারটা বাজলে লেখাপড়া বন্ধ করে তার ঘরের বাইরে রকে বসে হাত-মুখ ধুতো এবং ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত।

এইভাবে দিন যায়। একদিন রাতে ঠিক বারটার সময় রকে বসে, হাত-মুখে জল দিয়ে নরেন যখন উঠে দাঁড়াল, উঠোনের অপর দিকে, অন্দরে যাবার রকের দিকে তার নজর পড়ল। নরেন দেখলে যে সেখানে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন তাকে চিনতে পারলে না। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল।

পরদিন রাত্রে নরেন পড়ছে আর ভাবছে কে সে মেয়েটি? অত রাত্রে রকে দাঁড়িয়ে কি করছিল? আজও সে আসবে না কি? নরেন পড়ে, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েটির কথা ভাবে। এই দোনামনা করতে করতে রাত বারটা বাজল। নরেন বাইরে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে প্রথমেই ওদিকের রকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। দেখলে, ঠিক সেইখানে সে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। নরেন, লজ্জা পেল, কিন্তু অদম্য কৌতূহল বশতঃ মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিও নরেনকে একদৃষ্টে দেখছিল। ক্রমে মেয়েটি আস্তে আস্তে নরেনের দিকে এগুতে লাগল—যেন নরেনকে কি বলবে। ক্রমে মেয়েটি উঠোনে নেমে ধীরে ধীরে নরেনের দিকে আসতে লাগল। কিন্তু নরেন আর অপেক্ষা করলে না। তার বুক ধড়ফড় করছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নরেনের সে রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না। পরদিনও সারাদিন মনটা উচাটন হয়ে রইল। "কে এ মেয়েটি? কোথাও দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না। এত রাত্রে সে আমার ঘরের দিকে কেন আসছিল? গোড়ায় মনে করেছিলুম বাবুদের বাড়ির কোন মেয়ে। কিন্তু তাও তো নয়? মেয়েটি কি ভাল মেয়ে নয়? অথচ মুখ দেখে তো সে-রকম মনে হয় না! মুখে কেমন সরল ভাব, যেন আমাকে কি বলতে চায়! দেখি, আজও যদি আসে তো তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।" নরেন সারাদিন এইসব কথা ভাবল, কিছুতেই মেয়েটিকে মন থেকে সরাতে পারলে না। সেদিন একটুও পড়াতে মন বসাতে পারলে না।

রাত বারটা। নরেন ঘরের বাইরে গিয়ে দেখলে যে, মেয়েটি আজ রক থেকে নেমে উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নরেনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে অগ্রসর হয়ে এল। আজ আর নরেন তাকে ফেরাতে পারলে না। মেয়েটি নরেনকে অতি মিষ্টিস্বরে বললে, "তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, তাই একটু গল্প ক'রতে এলুম। চল তোমার ঘরে গিয়ে বসি।"

মেয়েটির চোখে কি ছিল জানি না, নরেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ কিংবা মোহগ্রস্তের মত হয়ে পড়ল। কেমন এক অবর্ণনীয় ভাব অনুভব করলে। সেটা আনন্দ, ভয়, মোহ না সুখ? নরেনের মন এবং দেহ দুই-ই যেন আর স্ববশে রইল না। সে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

নরেন বললে, "তুমি কে?"

মেয়েটি বললে, "আমি মালতী। তুমি আমায় চেন না! আজ ক'দিন তোমায় দেখছি। তোমায় বড় ভাল লেগেছে, তাই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলুম। তুমি রাগ করনি তো?"

নরেন—"আচ্ছা, তুমি এত রাত্রে আস কেন?"

মেয়েটি—"ঠিক রাত বারটার সময় আমার আসবার সুযোগ হয়। অন্য সময়ে আমি চেষ্টা করলেও আসতে পারি না। এই সব জিনিস একদিন আমি তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলব। আমি রোজ ঠিক রাত বারটার সময় আসব ও দু'টোর সময় চলে যাব। তোমার কোন ভয় নেই।

আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমার পরিচয় জানতে চেও না। আমি তোমার বন্ধু এই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?"

নরেনের তখন স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। তা নইলে হয়ত সে মেয়েটির পুরো পরিচয় জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু সে তা করলে না। সে মেয়েটির সাথে গল্প করতে লাগল। তার মনে অনির্বচনীয় আনন্দ, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক অপরিচিতা মেয়ে ঠিক রাত বারটার সময় আসে, এক মিনিট আগে কি পরে আসতে পারে না—এর মানে কি?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কোথায়?—এসব কোন কথা নরেনের মনে উদয় হল না। সে কেবল তার সঙ্গে কথাবার্তার আনন্দে ডুবে রইল।

রাত দু'টো বাজতেই মেয়েটি উঠে বললে, "আজ যাই, কাল ঠিক বারটায় আসব।" বলে মেয়েটি ঘরের বাইরে চলে গেল। নরেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে আর মেয়েটিকে দেখতে পেলে না। সারা উঠোন খাঁ খাঁ করছে আর রকে কোন জন-মনিষ্যি নেই।

পরদিন আবার ঠিক রাত বারটার সময় মালতীর আগমন হল, পড়া সেরে ঘরের বাইরে যেতেই দরজার কাছে মালতীকে সে দেখতে পেলে। তার পরে দু'জনে ঘরের ভেতরে এসে গল্প-গুজব আরম্ভ করলে।

এইরূপে দিন কাটছে, নরেনের লেখাপড়া চুলোয় গেছে। নরেন সর্বক্ষণ মেয়েটির কথা ভাবে,—এমনই তার আকর্ষণ। সে সারাদিন উদগ্রীব হয়ে থাকে—কখন রাত বারটা বাজবে। মেয়েটির সঙ্গ উন্মাদকর এবং রাত বারটা থেকে দুটো পর্যন্ত এই দু'ঘণ্টা সুখ স্বপ্নের মত কেটে যায়। কখনো কখনো নরেন ভাবে যে, কে এই মেয়েটি, কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কেন সে রাত্রি বারটার সময় আসে, কেন দুটার পরেই চলে যায়—কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে মালতী কেবল হাসে, বলে, "আমার পরিচয় নিয়ে কি হবে? কেন, আমাকে কি পছন্দ কর না? তুমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা কর—কেনই বা আমি বারটার সময় আসি ও দু'টোর সময় চলে যাই। তার কারণটা আজ তোমায় বলি। রাত বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত যে ক্ষণ, কেবল সেই সময়টাই আমি তোমার কাছে আসতে পারি। আমার এমন ক্ষমতা নেই, যে বারটার আগে আসি কিংবা দুটোর পরেও থাকি।"

নরেন এই সব কথা শোনে আর তার মনে কেমন একটা সন্দেহের উদয় হয়। এক একবার এ কথাও তার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারে যে, এ কি মানুষ নয়? আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলে যে মালতী চলে যাওয়ার পর তার দেহমনে একটি গভীর অবসাদ আসে। সে মড়ার মত ঘুমিয়ে পড়ে ও পরদিন উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সে আরও লক্ষ্য করলে যে তার শরীর দিনের পর দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে একথা তার মনে বদ্ধমূল হল যে মালতীর সঙ্গ তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। কিন্তু কি করা যায়? কি করে এর হাত থেকে উদ্ধার পাব? নরেন বেশ বুঝতে পেরেছে যে তার পক্ষে অসম্ভব এবং এভাবে আর দিন-কতক চললে তার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। নরেন উপায় ঠাওরাতে লাগল কি ক'রে মালতীর আসা বন্ধ করা যায়। সে ভাবলে যে, "মালতী যখন বলছে যে রাত বারটা থেকে দু'টো পর্যন্ত তার আসবার সময়, আমি কেন সেই সময়টা দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে শুয়ে থাকি না? সে দরজা বন্ধ দেখে বুঝতে পারবে যে আমি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছি।" নরেন প্রতিজ্ঞা করলে যে সেই রাত্রেই সে ঐরূপ করবে।

সেইদিন রাত্রে রাত এগারোটার সময় নরেন দরজা বন্ধ করে তার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে ঘুমোবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘুম কিছুতেই এল না। যখন জমিদার বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে তখন ঘরের মধ্যে খস্ খস্ করে কেমন একটা শব্দ হল। নরেন এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল। খস্ খস্ শব্দ শুনে নরেন চোখ মেলে দেখলে যে মালতী ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এই ব্যাপারে নরেন হতভম্ব হয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সে মালতীকে দেখে আবার মোহাবিষ্ট হ'ল এবং তাড়াতাড়ি উঠে বসে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালে। মালতী হাসিমুখে বললে, "আজ যে বড় দরজা বন্ধ করে রেখেছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?" নরেন বললে, "না না, শরীরটা খারাপ বোধ হওয়াতে বিছানায় শুয়েছিলুম, মতলব ছিল বারটা বাজলেই বাইরে যাব। কিন্তু তুমি ঘরের ভেতরে এলে কি করে?" মালতী হাসতে হাসতে বললে, "আমি এক ম্যাজিক জানি, দরজা বন্ধ থাকলেও কি করে ঘরের ভেতরে আসতে পারা যায়, সে কথা তোমাকে একদিন আমি বুঝিয়ে দেবো।"

সে রাত্রে মালতী চলে গেলে নরেন এক লহমাও ঘুমোতে পারলে না। সে কেবলই ভাবে যে মালতী কি করে ঘরের দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে আসতে পারলে! যেটা এত দিন তার মনে উঁকি ঝুঁকি মারছিল এখন সেই ধারণা বদ্ধমূল হল। মালতী যে মানুষ নয়, কোন মৃত স্ত্রীলোক এই ধারণা তার মনের উপর চেপে বসল। কিন্তু আত্মা ত অশরীরী, সে দেহ ধারণ করে কি করে। ক্রমে নরেনের মনে পড়ল যে মালতী বারবার বলছে যে, কেবল রাত বারোটা থেকে দু'টো পর্যন্ত সে নরেনের কাছে আসতে পারে। নরেন ভাবলে, হয়ত কেবল এই সময়টুকুর জন্যই সে স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। নরেনের এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না এবং কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারলে না। তবে এটা সে স্থির বুঝলে যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে—পাস করা দূরে থাকুক—তার প্রাণ সংশয় হবে।

এর দু-চার দিনের ভিতরই নরেন কঙ্কালসার হ'য়ে পড়ল। ভয় ও প্রেতসঙ্গ তার শরীর আর মনকে দগ্ধ ক'রে দিলে। দিন-রাত তার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কেবল রাত্রে ঐ দু'ঘণ্টা সে ভুলে থাকে, এমনি মালতীর আকর্ষণ আর এমনি নরেনের মোহ।

বাড়ির সকলে দেখলে যে, নরেন শুকিয়ে যাচ্ছে। একদিন গৃহিণী অনুযোগ করলেন যে, সে যেন রাত জেগে বেশী পড়াশুনা না করে। তার পুষ্টিকর খাবারেরও বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তখন গৃহিণী একদিন জমিদারবাবুকে নরেনের শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন।

দেবেনবাবু নরেনকে ডেকে পাঠালেন ও তাকে বহু প্রশ্ন করলেন। নরেন প্রথমটা লুকোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে শেষটা নরেন সেই মেয়েটির কথা বলে ফেললে। একটি ভদ্রলোকের মেয়ে রাত্রে ঘরে আসে শুনে জমিদারবাবু চমকে উঠলেন ও বার বার সে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। নরেন বললে, "আমি অনেক জিজ্ঞাসা করেছি, কোন পরিচয় দেয় না।"

জমিদার—"তুমি তাকে ঘরে ডেকে আন কেন?"

নরেন—"আমি ডাকি না, সে আপনি আসে।"

জমিদার—"তুমি দরজা বন্ধ করে থাক না কেন? তুমি ত বলছ যে, সে রাত বারোটার আগে আসতে পারে না। তুমি তার আগেই দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড় না কেন?"

নরেন—"আমি দরজা বন্ধ ক'রে দেখেছি। দরজা বন্ধ থাকলেও সে ঘরে আসে।"

জমিদারবাবু অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "তুমি কি গাঁজাখুরি কথা বলছ? দরজা বন্ধ থাকলে সে আসবে কেমন করে?"

নরেন—"তা জানি না। বোধ হয় তার কোন অমানুষিক ক্ষমতা আছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে খালি হাসে আর বলে, 'একদিন বুঝতে পারবে'।"

নরেনের কথা শুনে দেবেনবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এর রহস্যটা কি। তিনি নরেনকে ভালভাবে জানতেন যে সে সত্যবাদী ও সৎ। বিশেষতঃ তাঁর সামনে সে কখনই মিথ্যাকথা বলবে না। তিনি নরেনকে বললেন, "তুমি আমাকে এই ব্যাপারটা দেখাতে পার?"

নরেন—"নিশ্চয় পারি। আপনি রাত বারোটার কিছু আগে থাকতে আমার পাশের ঘরটায় লুকিয়ে থাকবেন, তাহলে সবই দেখতে-শুনতে পাবেন।"

দেবেনবাবু তখনই নরেনের ঘরে গেলেন ও দরজা, জানলা সব তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করে বুঝলেন যে, দরজা বন্ধ থাকলে বাইরে থেকে সে-ঘরে আসা একেবারে অসম্ভব। এই ঘরের পাশেই একটি ছোট ঘর ছিল এবং এই দুই ঘরের মধ্যে একটা ছোট জানালা ছিল। দেবেনবাবু ভেবে দেখলেন যে, ঐ জানালাটা খুলে যদি কেউ আলো নিবিয়ে ঐছোট ঘরটায় লুকিয়ে থাকে—তাহলে নরেনের ঘরের সব ব্যাপারই সে লক্ষ্য করতে পারবে। দেবেনবাবু মনে মনে এই প্ল্যান স্থির ক'রে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করলেন।

রাত বারোটার কিছু আগে দেবেনবাবু সেই ছোট ঘরটায় গিয়ে ছোট জানালাটার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন, কিন্তু নরেনের ঘরের ভিতর খর দৃষ্টি রাখলেন। নরেন দরজা বন্ধ ক'রে শুলে তিনি দরজাটির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন যাতে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে মেয়েটি ঘরের ভিতর না আসতে পারে।

দেবেনবাবু এইভাবে চেয়ে আছেন আর নরেনের ঘরে আলো জ্বলছে। ঠিক বারোটার সময় তাঁর চোখে কেমন ধাঁধা লাগল। তিনি মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলেন। তখনই চোখ চেয়ে দেখলেন যে একটি সুন্দরী মেয়ে নরেনের ঘরের ভিতর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কিসে কি হ'ল তিনি ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। তারপর মালতী ও নরেন যখন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলে দেবেনবাবু চুপিসাড়ে সে ঘর থেকে চ'লে গেলেন। মালতী যে প্রেতিনী সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন প্রত্যুষেই দেবেনবাবু নরেনের বাবাকে এক জরুরী পত্র লিখে ঘোড়সোয়ার দিয়ে উষা গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন, "তুমি এখনই এসে নরুকে তোমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, নইলে তার প্রাণ-সংশয়।" আর নরেনকেও ডেকে বললেন যে, তার বাপকে আনতে লোক গিয়েছে। তিনি এলেই যেন তার সঙ্গে নরেন গ্রামে ফিরে যায়। নরেন খুব রাজী, কারণ রাত্রের ঐ দু'ঘণ্টা ছাড়া নরেন স্ববশে সাধারণ মানুষের মতই থাকত। সে বুঝলে এর হাত থেকে বাঁচতে গেলে তার পালানই মঙ্গল।

সেই দিনই নরেনের বাবা এলেন। নরেনের শরীরের অবস্থা দেখে এবং সব কথা শুনে ভয়ে দুঃখে তিনি পাগলের মত হ'য়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে জমিদারবাবুকে বললেন যে, তিনি সেই দিনই নরুকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেবেনবাবু বললেন, "শুধু নিয়ে গেলে হবে না। একজন ভাল রোজাকে দিয়ে নরুকে দেখাও। ওকে পেতনীটা যেভাবে পেয়েছে তাতে ছাড়ান সহজ নয়।" রামবাবু বললেন যে, তিনি তাই করবেন। সেই দিনই তাঁরা উষা গ্রামে ফিরে গেলেন।

নরেনের মা সব কথা শুনে কেঁদে সারা। তিনি বললেন, "পরীক্ষা মাথায় থাকুক, ছেলের প্রাণ বাঁচান আগে দরকার।" নরেনও এত দূর চলে এসে আর বাবা-মাকে নিকটে পেয়ে মনে অনেকটা বল পেলে। সে ভাবলে পেতনীটাকে আর এত দূর আসতে হবে না! সে সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে তার ঘরে শুতে গেল।

কিন্তু ঘুম আর আসে না। ক্রমেই রাত হচ্ছে আর নরেন ভাবছে সে কি এখানেও আসবে নাকি! এইভাবে রাত বারোটা বাজল আর সঙ্গে সঙ্গে নরেন দেখল যে, মালতী ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। নরেন ভয় পেলে, কিন্তু সেই অদম্য মোহ। সে উঠে মালতীকে সম্ভাষণ করলে।

মালতী—"তুমি যে এখানে চ'লে এলে? তুমি কি ভাবছ?"

নরেন—"আমি ভাবছি তুমি কি ক'রে এখানে এলে? আমার শরীর খারাপ হয়েছে ব'লে বাবা আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

মালতী—"তুমি সত্যি বলছ? তোমাকে আমার কাছ থেকে ছাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না ত? সে কিন্তু কেউ পারবে না, তা যত চেষ্টাই না কর। তুমি কি এতদিনেও বুঝতে পারনি যে আমি কে? তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করব না। কিন্তু তুমি যেখানে যাবে আমিও যাব। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে এইভাবে আমি আসব। তোমার মৃত্যুর পর আমরা চিরকাল একসঙ্গে থাকব।

মালতীর কথা শুনে নরেনের বুক কেঁপে উঠল। যদিও সে আগেই বুঝেছিল যে মালতী মানুষ নয়, কিন্তু এমন খোলাখুলিভাবে সেকথা এর আগে কোনদিন হয়নি। যখন মালতী বললে যে, "কেউ তোমাকে আমার কাছে থেকে ছাড়াতে পারবে না।" তখন ভয়ে নরেনের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে এল। সে যদিও অন্যদিনের মত হাসিখুশির ভান করলে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার মু: শুকিয়ে উঠতে লাগল।

দু'টোর সময় মালতী চ'লে গেলেই নরেন পাগলের মত ছুটে গিয়ে তার বাবা-মার শোবা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। তাঁরা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সব কথা শুনলে ও হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগলেন। সে রাত্রে আর কেউ ঘুমোতে গেলেন না।

পরদিন সকালেই রামবাবু প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সব কথা বললেন। তাঁরা বললেন যত শীঘ্র পারা যায় একজন ভাল রোজাকে ডাকান হোক। আর যতদিন না রোজা আসে ততদিন নরু তার বাবা-মার মধ্যিখানে শোবে। একজন এ সংবাদ দিলেন যে, সাত ক্রোশ দূরে একজন সত্যিকার ভাল রোজা থাকে। তার ভূতপ্রেত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, আর সে দরকারী শিকড়-বাকড়েরও সন্ধান রাখে। সেইদিনই সেই রোজাকে আনতে লোক পাঠানো আর তাকে বলে দেওয়া হল যাতে তার পরদিনই সে রোজাকে নিয়ে আসে। রোজা যা তাই তাকে দেওয়া হবে—একথাও তাকে বলে দেওয়া হল।

সেদিন রাত্রে নরেন বাবা-মার সঙ্গে একঘরে শুল। দু'পাশে বাবা-মা. আর নরেন শুয়েছে মধ্যে, একই বিছানায়। তিন জনই জেগে আছেন, আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় কেউই ঘুমোতে পারছেন না। এইভাবে রাত বারোটা বাজল।

নরেন চোখ বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ নরেন অনুভব করলে কে যেন তাকে ঠেলছে। নরেন চমকে চোখ মেলে দেখলে যে মালতী মাথার কাছে বসে আছে। নরেন চুপি চুপি বললে, "তুমি কি কবছ, বাবা-মা জানতে পারবেন যে।" মালতী স্বাভাবিক সুরে বললে, "তোমার সে ভয় নেই, ওঁরা কিছু জানতে পারবে না।" নবেন উঠে দেখলে যে তার বাবা মা মড়ার মত পড়ে আছেন। তারা তখন পাশের ঘরে গেল। একথা বলাই বাহুল্য যে, মালতীই রামবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অজ্ঞান করে রেখেছিল।

পরদিন সব কথা শুনে নরেনের বাবা-মা পাগলের মত বুক চাপড়াতে লাগলেন। নরেনও বুঝলে যে আর তার নিস্তাব নেই। আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের আর কিছু নেই। দেহ কঙ্কাল-সার, সব সময় বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে। বহুকষ্টে হাঁটে, এমন কি বসে থাকতেও কষ্ট হয়, সব সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সে ভাবছে এ অবস্থার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। গ্রামের লোকেরাও দুঃখিত। সকলের শেষ আশা সেই রোজা। যদি সে কিছু করতে পারে।

সেদিন বিকেলে রোজার আগমন হল। সে ধীরভাবে আগাগোড়া সব কথা শুনলে আর নরেনের শরীরের অবস্থাও দেখলে। রোজা বললে যে সে একবার সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনে ভেবে দেখবে যে এর কোন উপায় আছে কি না। সে স্পষ্টই বললে যে মেয়েটা যেভাবে নরেনকে গ্রাস করে বসে আছে তাতে তাকে ছাড়ান খুব শক্ত। এই বলে রোজা এক নির্জন গাছতলায় গিয়ে বসল। ঘণ্টা-দুই বাদে রোজা ফিরে এসে বললে যে সে একটা উপায় বার করেছে, সেটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক উপায়। সে রামবাবুকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং প্রবীণ প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে বললে। রোজা তাঁদের সামনে তার কথা বলবে এবং যদি সকলের মত হয় তা'হলে নরেনের ব্যাপারের ভার নেবে। রোজার কথামত তখনই আত্মীয়-স্বজনদের এবং প্রতিবেশীদের ডাকা হল। তাঁরা সকলেই রামবাবুর হিতৈষী এবং নরুর মিষ্ট স্বভাবের জন্য তাকে ভালবাসেন। তাঁরা সকলেই রোজাকে বিশেষ অনুরোধ জানালেন যে, যে উপায়েই হোক নরুকে যেন এই ভীষণ বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়। রোজা তাঁদের বললে, "আপনারা নরেনবাবুর অবস্থা তো দেখছেন। এইভাবে চললে একমাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কেবল একটি মাত্র উপায় আছে যাতে এঁকে বাঁচান যায়. কিন্তু সেই উপায়ের আর একটি দিক আছে—সেটাও আপনারা ভেবে দেখুন! আমার মতলব যদি সফল হয় তাহলে চিরকালের জন্য নরেনবাবু প্রেতিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাবেন। কিন্তু যদি অকৃতকার্য হই তা'হলে এখনি ওঁর প্রাণ যাবে। এখন আপনাদেব ভেবে দেখতে হবে যে আপনারা একমাসের মধ্যে নরেনবাবুর নিশ্চিত মৃত্যু চান অথবা তাঁকে চিরতরে বিপদমুক্ত করতে চান, যদিও এতে আজই ওঁর প্রাণ যেতে পারে। আপনারা বেশ করে ভেবে জবাব দিন।" রামবাবুর স্ত্রী দবজার আড়ালে বসে শুনছিলেন, তিনি কেঁদে উঠলেন ও অস্ফুটস্বরে বললেন, "বাপ রে, যাতে আজই আমার ছেলের প্রাণ যেতে পারে তাতে আমি কখনই মত দেব না।" রামবাবুও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছেন, কিন্তু তিনি পুরুষ

মানুষ, তিনি রোজার কথাটি ভাল করে বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী রোজাকে অনুরোধ করলেন, সে যাতে তার সমস্ত মতলবটা ভেঙে বলে। রোজা বললে, "আমি বলব না, আমি কাউকে কিছু জানতে দেব না, আমি শুধু নরেনবাবুকে যা যা করতে হবে বুঝিয়ে দেব, তবে এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ব্যাপারও কিছু আছে তা কিন্তু আপনাদের করে দিতে হবে।"

এরূপ জীবন-মরণের কথায় বাপ-মার মতি স্থির করা খুব শক্ত, তাঁরা একবার এদিক ভাবেন, একবার ওদিক ভাবেন। প্রতিবেশীরা তখন তাঁদের বোঝাতে লাগলেন। "তোমরা কি চাও না যে নরেন সুস্থশরীরে সুস্থমনে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকে? দিনকতকের মধ্যে ওর প্রাণ তো যাবেই, এরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় দিনকতক বেশী বেঁচে থেকে লাভ কি? আমাদের মত হচ্ছে রোজার কথামত চলা। যখন আর কোন উপায় নেই তখন এই উপায়ই নিতে হবে।" যদিও কথাটা তাঁরা বুঝলেন তবুও মা-বাপের মন, রামবাবু তার স্ত্রী দোনামোনা করতে লাগলেন। যে কাজে আজই ছেলের মৃত্যু হতে পারে কেমন করে তাঁরা তাতে মত দেন? কিন্তু নরেনই এ সমস্যার সমাধান করে দিলে। নরেন বললে, যে তার বর্তমান অবস্থায় সে একদিনও বেঁচে থাকতে চায় না। সে রোজাকে পরিষ্কার বললে, "আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন ভাল, নয়তো আজই আমার জীবন শেষ করে দিন, আমি এ নরক-যন্ত্রণা আর একটা দিনও সহ্য করতে পাচ্ছি না।" নরেনের বাবা-মা কাঁদতে লাগলেন আর আত্মীয়-স্বজনরা বোঝাতে লাগলেন। শেষে, সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল যে, রোজার উপরে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক। রোজা বললে, "আজ সন্ধ্যে হয়ে গেছে আজ আর কিছু হবে না, আর একটা রাত্রি নরেনবাবু এইভাবেই থাকুন, কাল আমি এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করব। তবে এখানে হবে না। যেখানে নরেনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল সেখানে যেতে হবে।" শেষকালে স্থির হল যে, রোজা ও নরেন রামবাবুর সঙ্গে পরদিন সকালে কল্যাণপুরে জমিদার বাড়িতে যাবে।

সে রাত্রে মালতী নরেনকে বললে, "তোমায় আগেও বলেছি এখনও বলছি যে কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না, আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করব না, তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও, আমার এখানে আসতে কিছু কষ্ট হয়।" নরেন তাকে বললে, "তাই হবে। কালই আমি কল্যাণপুরে ফিরে যাব।"

পরদিন কল্যাণপুরের জমিদার বাড়িতে রামবাবু, নরেন ও রোজা উপস্থিত হল। রোজা দেবেনবাবুকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিলে এবং বললে, "আপনাকে কিছু সাহায্য করতে হবে।" দেবেনবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে সব কথা শুনলেন আর বললেন, "তুমি যা চাও করব। নরু আমার ছেলের বাড়া। তা'ছাড়া মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও এই পৈশাচিক ব্যাপারের যাতে অবসান হয় তাতে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে বাধ্য।"

রোজা—"আপনাকে বেশী কিছু করতে হবে না, আপনি শুধু নরেনের ঘরটি খুব ভাল করে সাজিয়ে দিন। ঘরটি ঝেড়ে মুছে তক্তপোশ সরিয়ে সেখানে একটি খাট পেতে দিন। আর ঘরটি আর বিছানাটি নানা রকম ফুল ও মালায় সজ্জিত করুন, সব বন্দোবস্ত সন্ধ্যের মধ্যে শেষ করতে হবে।"

জমিদার—"এতে আর কষ্টটা কি, সন্ধ্যের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।"

রাত দশটার সময় রোজা নরেনকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। সেখানে রোজা নরেনকে তার মতলবটা ভেঙ্গে বললে আর খুব ভাল করে নরেনকে বুঝিয়ে দিলে, তাকে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে। শেষকালে রোজা বললে, "আপনার জীবন এখন আপনার হাতে, ভূতনাথ মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি আপনার বুকে বল দিন।"

রাত্রি বারোটার কিছু আগে রোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঠিক রাত বারটায় মালতীর আগমন হল, নরেন খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে আহ্বান করলে এবং সাজান খাটে বসতে বললে।

মালতী—"আজ একি ব্যাপার? এমন খাট, এত ফুলের মালা, এ কার জন্যে?"

নরেন—"কেন, তোমার জন্যে আর তার পুরস্কারও তো পেলুম।"

মালতী—"কি পুরস্কার পেলে?"

নরেন—"কেন, কখনও যা করনি তা আজ করেছ। এর আগে তো কখনও তুমি দু'বার আসনি।"

মালতী—"দু'বার মানে কি? আমি আবার কখন এলুম?"

নরেন—"তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে? তুমি রাত সাড়ে দশটার সময় এলে আর বললে যে, তুমি ফুল দিয়ে সাজান ঘর দেখে আজ আগেই এসেছ, আমার সঙ্গে ফুল নিয়ে মালা নিয়ে কত কাড়াকাড়ি করলে, এই দেখ বিছানাতে ছেঁড়া মালা ছেঁড়া ফুল পড়ে রয়েছে। এইতো মাত্র পনেরো মিনিট হল তুমি গিয়েছ এর মধ্যে সব ভুলে গেলে, না আমার সঙ্গে তামাসা করছ?" নরেনের কথা শুনতে শুনতে মালতীর হাসি মিলিয়ে গেল, মুখ হল অসম্ভব গম্ভীর আর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

মালতী—"তুমি তো আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছ না? তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল যে আমি আজ রাত্রে আবার এসেছিলুম?"

নরেন তখনই তাই করলে। মালতী আর কোন কথা না বলে এক মনে ভাবতে লাগল। মালতীর মুখের সৌন্দর্য গেছে মিলিয়ে, মুখ রাগে কালো হয়ে গেছে আর থমথম করছে। কিছুক্ষণ পরে মালতী নরেনকে বললে যে, এর আগে সে আসেনি আর কেউ তার মত সেজে এসেছিল। নরেন যেন কত দুঃখ আর ভয় পেয়েছে এইভাবে বললে, "যদি তাই হয়ে থাকে তবে তুমি তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও, আমার তোমাকেই ভাল লাগে আর তোমারই বন্ধুত্ব কামনা করি। যদি আর কেউ এভাবে আসে তাহলে আমি আর বাঁচব না, যে করে হোক তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচাও।" মালতী কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বললে, "এর এক উপায় আছে, কিন্তু তা কি তুমি পারবে? আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে কি? আমি কে তা ত জান, এই গভীর রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি এক জায়গায় যেতে পার?" নরেন বুঝলে যে এতক্ষণে তার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল এবং বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগলো। সে কষ্টে হেসে বললে, "তোমার সঙ্গে যাব তাতে ভয়টা কি? কিন্তু তুমি কি করতে চাও আমাকে বুঝিয়ে বল।"

মালতী—"এখান থেকে দু'মাইল দূরে উত্তর দিকে যে জঙ্গলটি আছে সেখানে তোমায় নিয়ে যাব। সেখানে এক জায়গায় এক রকমের লতা আছে সেই লতার শিকড় তোমাকে আনতে হবে।"

নরেন—"তা তুমি কেন নিজেই নিয়ে এস না, তুমি তো সব জায়গায় যেতে পার, বাইরে কী ভীষণ মেঘ করেছে দেখ, তুমি তো জান, আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়।"

মালতী—"আমি যদি আনতে পারতুম তাহলে কি তোমাকে কষ্ট দি। আমি সে লতা গাছের কাছেও যেতে পারি না। তোমাকেই সে শিকড় আনতে হবে। সেই শিকড় দিনরাত তোমায় হাতে বেঁধে রাখতে হবে। ঠিক রাত বারটার সময় সেই শিকড় খুলে অন্য ঘরে তফাত করে রেখে আসবে, আর রাত দুটোর সময় আমি চলে গেলে আবার পরে থাকবে, তাহলে কেউ আর তোমার কাছে আসতে পারবে না।"

নরেন আর কিছু বললে না এবং তারা দু'জন ঘর থেকে উঠোনে নামল, ক্রমে উঠোনের বাইরে এসে গ্রামের উত্তর দিকে যেতে লাগল। আকাশ গভীর মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, পল্লী-পথ জনহীন, নরেনের সঙ্গী কেবল মালতী। সে মানুষ নয়, নরেন জানে। শুধু তাই নয়, নরেন দুর্বল বলে মালতী তার হাত ধরে আছে। মালতী তাকে বললে, "এখন তুমি বেশী পরিশ্রম করো না, তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল, মনে রেখ, আসবার সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না, তোমাকে নিজেই আসতে হবে।"

এইভাবে তারা দুজনে যাচ্ছে, গ্রাম্যপথ ছেড়ে তারা ধানক্ষেতের দিকে গেল এবং সরু আলের উপর দিয়ে যেতে লাগল, গভীর অন্ধকারে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আলোতে নরেন পথ দেখতে পাচ্ছে, অন্য সময়ে সম্পূর্ণ মালতীর উপর নির্ভর। ক্রমে তারা নদীর ধারে পৌঁছলো। সামনেই শ্মশান, যার নাম কালাপেড়ের দেয়াড়। ক'টি তেঁতুল গাছ দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে কি নির্জন স্থান! নরেনের বুক সবলে স্পন্দিত হতে লাগল, কিন্তু রোজার কথা তখন তার কানে বাজছে, "নরেনবাবু, আপনার জীবন আপনার হাতে, ভূতনাথকে স্মরণ করবেন, কোন ভয় নেই।"

এইবার জঙ্গল আরম্ভ হল, এখন আর পথ নেই, প্রেতিনী যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ সেদিকে যাচ্ছে। একটু পরে ডানদিকে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ দেখা গেল। মালতী নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বললে, "ঐ গাছটার ওপারে আগাছার জঙ্গল আছে। সেখানে গোটাকতক লতানে গাছ আছে, তারই একটা শিকড়সুদ্ধ তুলে নিয়ে এস, তোমাকে একলাই যেতে হবে।" প্রেতিনীর নির্দেশমত নরেন অগ্রসর হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি লতানে গাছ দেখতে পেল। মূলসুদ্ধ একটি লতানে গাছ তুলে এনে নরেন পূর্বস্থানে ফিরে এল, কিন্তু মালতীকে সে-স্থানে দেখতে পেলে না। সে ভয়কম্পিত স্বরে ডাকলে, "মালতী... ।" প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর থেকে মালতী জবাব দিলে, "আমি এখানে আছি। এখন তো মেঘ খানিকটা কেটে গ্যাছে এবং অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, আমার সাদা কাপড় তো তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি পেছনে পেছনে এস।"

নরেন দ্রুতপদে মালতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আগে তুমি শিকড়টি দেখ তো যে ঠিক জিনিসটি এনেছি কিনা।" মালতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক

জিনিসই এনেছ, তুমি আমার অত কাছে এস না।" মালতী এগিয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ হাত পিছু পিছু নরেন আসছে। আবার সেই নদীর ধার—সেই কালাপেড়ের দেয়াড়। সেই ধান ক্ষেত, আর সরু আলের রাস্তা। আবছা আলোতে নরেন মালতীকে দেখতে পাচ্ছে। ক্রমে গ্রামাপথে এসে পৌঁছলো এবং অবশেষে বাড়ি। মালতী চেঁচিয়ে বললে, "তুমি শিকড়টা অন্য ঘরে রেখে এস, এখনও দু'টা বাজতে আধ ঘণ্টা দেরি আছে।" নরেনের রোজার কথা মনে হল। পরিত্রাণের উপায় পেলে তা এক মুর্হূতের জন্য ত্যাগ করবে না, তাই নরেন মালতীকে বললে, "আজ আমি বড় ক্লান্ত, আজ তুমি যাও, কাল তুমি এস।" মালতী বললে, "বেশ, তাই হোক্। এখনই শিকড়টি হাতে বেঁধে ফেল, কাল রাত বারোটার সময় আবার খুলে রেখ।"

নরেন বাড়িতে পৌঁছেই জমিদারবাবুর বৈঠকখানা ঘরে গেল। সেখানে রোজা, দেবেনবাবু ও তার বাবা গভীর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলেন। নরেনকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে কলরব করে উঠলেন। রোজা জিজ্ঞাসা করলে, "ওষুধ পেয়েছেন? কি জিনিস পেলেন দেখি?" নরেন শিকড়সুদ্ধ লতাটি রোজাকে দিলে আর মালতী তাকে যা যা বলে দিয়েছিল তাও বললে। রোজা বললে, 'আর ভয় নেই, জয় ভগবান!' সেই রাত্রেই এক বালার ভিতরে সেই শিকড় রেখে নরেনের বাহুতে মোক্ষম করে বেঁধে দেওয়া হল। সে এমন বজ্র বাঁধন যে নরেন নিজে হাজার চেষ্টা করলেও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সে বালা খুলতে পারবে না। এ বালা রোজাই সঙ্গে এনেছিল এবং এর গঠনও একটু বিশেষ রকমের। নরেনকে বালা পরিয়ে রোজা বললে, "এখন দিনকতক রাত্রে ও রোজ আসবে এবং অনুনয়, বিনয়, এমন কি ভয় প্রদর্শনও করবে। কিন্তু এই বালাই আপনার 'ইষ্টকবচ'। সে যাই বলুক, আর যাই করুক, আপনি প্রাণান্তেও এই বালা খোলবার চেষ্টা করবেন না।" রোজা যা বলেছিল তাই হল। নরেন পরদিন রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়েছে আর মালতী ঘরের বাইরে থেকে শিকড়টি খুলে ফেলবার জন্য অনুনয়-বিনয় করছে। আজ আর সে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে ঘরে আসতে পারলে না। নরেন মালতীর কথার কোন জবাব দিলে না। প্রথম দু'তিন রাত্রি অনুনয়-বিনয় ও পরে ভয় প্রদর্শন, "আমার কথা না শুনলে, আমি তোমার প্রাণ নেব, কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।" কিন্তু নরেন নিরুত্তর। এই উপদ্রব আট-দশ দিন চলেছিল তার পরে মালতী আসেনি। নরেন তার বাবার সঙ্গে গ্রামে ফিরে গেল এবং মা-বাবার আদর-যত্নে অতি শীঘ্রই তার পূর্ব স্বাস্থ্য ও মনের বল ফিরে পেল। নরেনের আনন্দ, মা-বাবার আনন্দ, আত্মীয়-স্বজনের আনন্দ, প্রতিবেশীর আনন্দ, জমিদারবাবু ও তাঁর পরিবারবর্গের আনন্দ, আর সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে রোজার। শুধু সে যে একটি অমূল্য জীবন রক্ষা করেছে তাই নয়, সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। শুধু তাও নয়, জমিদারবাবু তার কোঁচড় টাকায় ভরে দিয়েছিলেন।* ❑

---

*এই গল্প আমি খুব ছেলেবেলায় শুনেছিলাম।—লেখক



ম্যমির জীবন্ত হাত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

সকাল থেকে সেদিন কাজের আর বিরাম ছিল না, যখন বিশ্রাম পেলাম, রাত তখন বারোটা। যেখানে আমার আস্তানা ছিল, সে জায়গাটার চারধারে দশ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকালয় নেই, গাছপালাও বড় একটা দেখা যায় না, কেবল শুষ্ক পাষাণ ও তার এধারে-ওধারে অতি প্রাচীন সমাধিগুলি নীরবে পড়ে আছে। এইসব কারণে জায়গাটা স্বভাবতই নির্জন ও নিস্তব্ধ। দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যার পর থেকে তার নীরবতা যেন গুরুভার পাষাণের মত বুকের উপর চেপে বসে। রাত যত বাড়ে, মনে হয়, এখানে মাটির নিচে যারা ঘুমিয়ে আছে তারা জেগে উঠে রাত্রির মত অতি চুপে চুপে পা ফেলে এবং বাতাসের মত লঘু ও স্বচ্ছ দেহে এদিক-ওদিক চলা-ফেরা করছে।

আমার কাজ ছিল সমাধির নিচের শুষ্ক ও প্রাণহীন মৃতদেহগুলি নিয়ে। এক-এক রাতে মনে হত, কে যেন আমার পিঠের উপর দিয়ে ঝুঁকে বা সামনে দাঁড়িয়ে আমার রচনাটা খুব কৌতূহলের সঙ্গে পাঠ করছে। কখনো কখনো সচকিত হয়ে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকিয়েছি। কিন্তু কিছুই দেখতে পাই নি।

সেজন্যে ভাবতাম, ওটা মনের ভুল। রাতদিন মৃতের সম্বন্ধে চিন্তা করছি, মৃতের নানারকম সামগ্রী নাড়া-চাড়া করি ; আমার চারধারেই যে সমাধি। এ অবস্থায় প্রেত বা ছায়া অথবা ওই ধরনের কিছু যে দেখব কিংবা অনুভব করব, এতে আর বিচিত্র কী!

যাই হোক, কাজ সেরে আমি আস্তানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পরদিন আমাদের দেশে যেতে হবে, সেজন্যে আমার সঙ্গী জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত। আমাদের বৃদ্ধ আরব অনুচরটি তখন কোথায় জানি না।

আমি আস্তানার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু সেই ঘন অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না ; কেবল কিছু দূর থেকে নাইলের অস্পষ্ট কলধ্বনি ও চারধারের অশ্রান্ত ঝিল্লিরব একসঙ্গে মিশে একটি অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি করে আমার কানে বাজতে লাগল এবং মনকে স্পর্শ করতে লাগল! আমি স্তব্ধ হয়ে সেই শব্দের দিকে কান পেতে রইলাম।

সম্ভবত ক্ষণিকের জন্যে তন্ময় হয়ে থাকব। হঠাৎ দেখি, আমার একেবারে সমুখে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি সচকিত হয়ে এক পা পিছিয়ে যেতেই আমারও বিস্ময়ের ঘোর কাটল, সেই মূর্তিও কথা বলে উঠল। সে অতি মৃদু কণ্ঠে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

তার সুরে, কথায় ও ভাব-ভঙ্গিতে এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল যে, সে আমাদের অনুচর হলেও তা উপেক্ষা করতে পারলাম না ; কেবল বললাম, 'কোথায়?'

সে হাত বাড়িয়ে পুব দিকটা দেখিয়ে দিলে। আমি নীরবে তাকে অনুসরণ করে চললাম।

দুজনে চলেছি। আমাদের পথের এদিকে-ওদিকে ভগ্ন সমাধিস্তম্ভগুলো পড়ে আছে। মাঝে-মাঝে পায়ে বাধা পাই, কোন সমাধিস্তম্ভ-চূড়ায় বা আর কোথাও বসে হঠাৎ দুটি-একটি পেচক ডেকে ওঠে, মাথার উপর দিয়ে বাতাসকে পাখার আঘাতে বিক্ষুব্ধ করে কখনো কখনো বাদুড় উড়ে যায়। সেই ঘন অন্ধকার, সেই আচম্বিত শব্দ, সেই জনবিরল সমাধি-প্রান্তর ও বৃদ্ধ অনুচরটির রহস্যপূর্ণ ব্যবহার আমাকে ক্রমে যেন অভিভূত করে ফেলতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, আমি কোন অভূতপূর্ব ঘটনা বা কোন রহস্যের সম্মুখীন হতে চলেছি।

তার সঙ্গে কতক্ষণ যে চলেছি, তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। তবে দূরত্বের অনুমানে বুঝলাম, আমার আস্তানা থেকে প্রায় এক মাইল পার হয়ে এসেছি। এর মধ্যে অবশ্য আমরা দুজনে কেউ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলি নি।

এক জায়গায় এসে আমার অনুচরটি হঠাৎ দাঁড়াল। তারপর বললে, 'অপেক্ষা করুন।'

আমার চোখে অন্ধকার এতক্ষণে সয়ে এসেছিল। তার উপর তিথি অনুসারে আর-একটু পরেই চাঁদ উঠবে। পুব আকাশের কোল একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার ফলে জায়গাটার একটা অস্পষ্ট ছবি আমার চোখে ফুটল। মনে পড়ল, এর আগে এখানে দিনের বেলায় একবার এসেছিলামও। দেখলাম, আমার সমুখে সেই জীর্ণ স্ফীংক্স্ ; তার নিচে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাটা সুড়ঙ্গ ও খাদ।

অনুচরটি সেখানে আমাকে রেখে সেই খাদের মধ্যে নেমে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। দূর শৈলশিখরে ধীরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠল। তার ম্লান আলো সেই নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা, সমাধিগুলি ও স্ফীংক্স্টাকে এমন একটি রূপ দান করলে যে আমার মনে হতে লাগল, চারধার থেকে কারা যেন ঘুম থেকে ধীরে জেগে উঠছে। চিন্তাটা মনে উঠতেই আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে কেমন একটু শিহরণ বয়ে গেল।

ঠিক তখনই পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে দেখি, আমাদের অনুচরটি ফিরে আসছে। তার হাতে যেন একটি কি।

সে কাছে আসতেই দেখি, জিনিসটা কাপড়ে জড়ানো। সাধারণত 'ম্যমি'গুলি যে ধরনের কাপড়ে জড়ানো থাকে এ কাপড়খানাও সেই ধরনের। আমার কৌতূহলের সীমা থাকল না।

সেও কোন কথা না বলে, কাল-বিলম্ব না করে জিনিসটার উপরের জড়ানো কাপড়টা খুলে ফেলল। ততক্ষণে চাঁদ আর একটু উপরে উঠেছে।

জিনিসটার কাপড়খানা সে সম্পূর্ণ খুলে দিতেই আমার কৌতূহল চরম বিস্ময়ে পরিণত হল। দেখলাম, সেটা একখানি হাত।

হাতখানার গঠন এবং সুন্দর ও সরু আঙুলগুলি দেখে বুঝলাম, সেটি কোন নারীর! তার কোথাও এতটুকু বিকৃতি ঘটেনি। তার নখগুলি চমৎকার করে কাটা ; প্রত্যেক নখের উপর যে খুব পাতলা সোনালি পাত মোড়া রয়েছে, সেগুলি পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। দেখে মনে হতে লাগল, হাতখানা এই মুহূর্তে কোন সুন্দরী নারীর দেহ থেকে কেটে আনা হয়েছে। তার ক্ষতস্থান থেকে যে দুটি হাড় বেড়িয়ে আছে, চাঁদের আলো পড়ে সে দুটি আরও সাদা দেখাচ্ছে। ততক্ষণে চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল ও নির্মল হয়ে উঠেছিল। অনুচরটি হাতখানা আমার আর-একটু কাছে আনতে দেখলাম, তার তর্জনীতে একটি উজ্জ্বল সোনার আংটি ; তার উপর প্রাচীন ইজিপ্টের কয়েকটি সাঙ্কেতিক অক্ষর খোদাই করা।

আমার বৃদ্ধ অনুচরটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চেহারায় কেমন একটা পরিবর্তন এসেছে। তাকে আমরা আরব বলে জানতাম। কিন্তু এখন তার মুখ-চোখের আরবীয় গঠনের পাশে আর একটি অন্য ভাব ফুটে উঠে সে ভাবটিকে ম্লান করে দিয়েছে। সে পরম স্নেহভরে সেই হাতখানি দু-হাতে তুলে ধরে বলল, 'এখানা ফারাও আখ্‌নাটেনের সপ্তম কন্যার দক্ষিণ হাত।'

'আখ্‌নাটেন তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্মত্যাগ করে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। সে ধর্ম ছিল, সূর্যের উপাসনা। তাঁর মৃত্যুর পর টুটেনখামেন ফারাও হন। তিনি আখ্‌নাটেন যে ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন তা দেশ থেকে দূর করে দেশের যা পুরাতন ধর্ম তা আবার প্রতিষ্ঠা করেন। তার ফলে ইজিপ্টের পুরোহিত সম্প্রদায় আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে, থিবিস নগরের মন্দিরের পুরোহিতগণ আবার অবাধে ইজিপ্টের সর্বত্র প্রভুত্ব করতে থাকে।

'কিন্তু ফারাও আখ্‌নাটেনের সপ্তম কন্যা মাকিটাটেন তাঁর পিতৃ-ধর্ম তখনও ত্যাগ করেননি। সে ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল বড় গভীর। রাজকুমারী পিতার মৃত্যুর পর একদল সৈন্য সংগ্রহ করে থিবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

'থিবিসের মন্দিরের পুরোহিতগণ তখন রাজকুমারী যে হাতে তাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃতদেহ থেকে সেই দক্ষিণ হাতখানি মণিবন্ধের একটু উপরে তরবারি দিয়ে ছিন্ন করে এবং কয়েকটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে হাতখানিকে 'ম্যমি' করে এই মন্দিরটিতে রেখে দেয়। এই নৃশংস কাজ করবার উদ্দেশ্য এই ছিল, যাতে আর কেউ রাজকুমারীর মত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা না করে, তাহলে তাদেরও দশা হবে রাজকুমারীর

মত। থিবিসের এই মন্দিরটাই ছিল তখন প্রধান। এখানা সেই।' বলে বৃদ্ধ পরম স্নেহের সঙ্গে হাতখানা একটু দোলালে।

তারপর আবার বললে, 'এই কাহিনী আমি শুনেছি আমার পিতার মুখে ; তিনি শুনেছিলেন তাঁর পিতার কাছে। এইভাবে কাহিনীটি পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। আমার পূর্বপুরুষেরা থিবিসের এইসব মন্দিরে পৌরোহিত্য করতেন। এই হাতখানি যে কোথায় লুকোনো ছিল তাঁরা ছাড়া আর কেউ তা জানত না। আমার পিতা আমাকে এর গোপন সন্ধান দিয়ে গেছেন। তোমার কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। তাই আজ আমি সেই হাতখানা তোমায় উপহার দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'কিন্তু হাতখানা আমায় না দিয়ে কোন যাদুঘরে তোমার দেওয়া উচিত। তারা সযত্নে এটাকে রক্ষা করবে।'

সে কঠোর স্বরে বললে, 'তা হতে পারে না। এই হাতের উপর যে অভিসম্পাত আছে, তা আজও পূর্ণ হয়নি। আর সেই অভিসম্পাতটি পূরণ করবার জন্যে ভাগ্য তোমাকেই নির্বাচিত করেছে।'

আমি চমকে উঠলাম ; বললাম, 'অসম্ভব! আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কী? আমি তো বিদেশী।'

সে একটু হেসে বললে, 'বন্ধু, নিয়তির চলা-ফেরা বড় বিচিত্র। আমি যা বলছি, তা সত্য। রাজকুমারী মাকিটাটেনের দেহটা 'ম্যমিতে' পরিণত করে তাঁর পিতা আখ্‌নাটেনের ম্যমির কাছে রাখা হয়েছে। সেটা এখন শান্তিতেই আছে। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হাতখানার উপর যে অভিসম্পাত আছে, তা আজও পূর্ণ হয়নি। সেজন্যে এটার শান্তি নেই। এটা তোমার সঙ্গে পৃথিবীর নগরে নগরে ঘুরে বেড়াবে, লক্ষ-লক্ষ লোকের চোখের সমুখে প্রদর্শিত হবে। হাতখানার উপর যে অভিসম্পাত আছে, তা পূর্ণ হবে তোমার দ্বারাই। নিয়তির এই বিধান।'

'অসম্ভব!'

'পৃথিবীতে "অসম্ভব" বলে কিছু নেই। তুমিও কোথাও শান্তিতে বাস করতে পারবে না। আজ থেকে এক বছর পরে তোমার ভ্রমণ শুরু হবে। আর আজ থেকেই ত্রিশ বৎসর পরে এক মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে রাজকুমারী মাকিটাটেনের ভগ্নীপতি ফারাও টুটেনখামেনের সমাধি আর মমি যে সময় আবিষ্কৃত হবে, ঠিক তার পূর্বেই রাজকুমারীর আত্মা এসে তোমার কাছ থেকে তাঁর দক্ষিণ হাতখানা উদ্ধারের চেষ্টা করবে। হাতখানাও তখন হয়ে উঠবে জীবন্ত। যতকাল তোমার কাছে থাকবে, ততকাল তোমার কোন বিপদ-আপদের ভয় থাকবে না! তুমি এখানা সযত্নে রক্ষা করবে, তাহলে এই হাতও তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। আমার কাছে শপথ কর, যে, হাতখানা তুমি সব সময়ে খুব সাবধানে রাখবে!' বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখমুখের ভাব, গলার স্বর, দেহের ভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেল।

আমার তখন মনে হতে লাগল, একজন ইজিপ্টীয় পুরোহিত সেই অতি প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আমাকে কঠোর স্বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে আজ্ঞা দিচ্ছে। সেই নিস্তব্ধ নির্জন সমাধি-প্রান্তরে, শান্ত বাতাসে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তার সেই মূর্তির সম্মুখে আমি ক্রমে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছাশক্তি মনের মাঝে মিলিয়ে গেল। বোধ হতে লাগল, আমি তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আমার মাথা আপনা হতেই তার সম্মুখে নত হয়ে পড়ল।

সে বললে, 'কেবল এইটুকু প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নয়। এই আমরা দুজনে আমেনের জীণ ভগ্ন মন্দিরতলে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে নতজানু হয়ে বসে আকাশের দিকে তোমার দক্ষিণ হাত তুলে সকলের যিনি ঈশ্বর, তাঁকে সাক্ষ্য করে শপথ কর যে তোমার কথা তুমি পালন করবে

তার অনুজ্ঞা উপেক্ষা করবার শক্তি আমার তখন ছিল না ; আমি যথাযথ তা পালন করলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমার হাতে রাজকুমারীর ছিন্ন হাতখানি ধীরে রেখে দিলে।

অতঃপর দুজনে পূর্বের পথ ধরে আস্তানায় ফিরে এলাম। আমার মন এক অভূতপূ ভাবে ভরে গেল।

দেখলাম, আমার সঙ্গী তখনও তেমনি ব্যস্ত আছেন। আমি যে কাপড়ে জড়ানো একটা কিছু নিয়ে কুটীরে ঢুকলাম, সেদিকে তাঁর খেয়ালই হল না। আমিও তাঁকে হাতখানির বিষয় কোন কথা বলা আবশ্যক বলে মনে করলাম না। হাতখানিকে আর-একখানা কাপড়ে ভাল করে জড়িয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে তাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু অন্য দিনের মত আমায় সে রাতে কিছুক্ষণ জেগে থাকতে হল না। শোবার প্রা সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে তন্দ্রা নেমে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন যথাসময়ে আমরা জিনিসপত্র নিয়ে আস্তানা ছেড়ে চলে এলাম। আমাদের বৃদ্ধ অনুচরটিও স্টিমারঘাট অবধি আমাদের সঙ্গে এল।

আমি যখন স্টিমারে উঠছি, তখন সে একবার তীক্ষ্ণ চোখে আমার চোখের দিকে তাকাল আমার মনে হল, সেই দৃষ্টির অর্থ, 'তোমার শপথ পালন করো।'

যাই হোক আমাদের স্টিমার যথাসময়ে থিবিস ছেড়ে নাইল দিয়ে সুদূর উত্তরে সমুদ্রের দিকে চলতে আরম্ভ করলে।

সেই সময়ে ফিরে দেখলাম, আমাদের বৃদ্ধ অনুচরটি ঘাটের একধারে স্থির হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ছায়ামূর্তি। ক্রমে সেই ছায়া থিবিসের বিলীয়মান তীরভূমির সঙ্গে আমার চোখের সম্মুখ থেকে চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল।

তারপর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে আমি পৃথিবীর নগরে নগরে ভ্রমণ করেছি, কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমি হাতখানাকে কখনও আমার কাছছাড়া করিনি। সকলেই রাজকুমারী মাকিটাটেনের সেই হাতখানিকে আমার বসবার ঘরে আমার পাশে দেখে গেছে ও তার চমকপ্রদ কাহিনীটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে।

হাতখানিও এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাকে যে কত বিপদ-আপদে রক্ষা করেছে, ত বলতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যাবে।

একবার এক চোর আমার ঘরে ঢুকে এক জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তার মতলব, রাত যখন গভীর হবে, তখন সে আমার মূল্যবান যা কিছু চুরি করে পালাবে।

সে রাতে তার কাজ হাসিল করবার সুযোগেরও অভাব হল না। ঘর অন্ধকার হল, রাত গভীর হয়ে এল। সে আমার সোনার ঘড়িটা সংগ্রহ করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের উপর থেকে টাকার থলিটা নিতে গিয়েই তার হাতখানা রাজকুমারীর হাতের উপর পড়ল।

তৎক্ষণাৎ সে ভয়ে আঁতকে উঠে সব ফেলে প্রাণ-ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

আর একবার এক হোটেলে থাকবার সময় হঠাৎ সেখানে আগুন লাগে! অন্য সকলের সঙ্গে আমিও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালাতে পালাতে মনে পড়ল, রাজকুমারীর হাতখানা আনা হয়নি, সেটা টেবিলে লাল মখমলের গদির উপরে রয়েছে। না আনলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমি ঘরের দিকে ফিরলাম। ঘরে এসে হাতখানা নিয়ে আবার ছুটতে ছুটতে লিফ্টের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি, লিফ্টটা পুড়ে ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল। তার ফলে অনেকগুলি লোক জখম হল ও প্রাণ হারাল।

এরপর এক রাতে স্বয়ং রাজকুমারী এলেন, তাঁর ওই হাতখানি নিতে।

তখন ইউরোপের মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি ইউরোপের যে নগরে সে সময় বাস করছি, মনস্থ করলাম সেখানেই জীবনের শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাস করব। কিন্তু থিবিসের জীর্ণ ভগ্ন মন্দির-তলে দাঁড়িয়ে আমার বৃদ্ধ অনুচরটি যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিল, তা তখনও পূর্ণ হয়নি বলেই বোধহয় আমার সঙ্কল্প সফল হল না। আমি নগরটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম।

যাবার সমস্ত আয়োজন করছি। কতক জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, কতক তখনও আছে। সেগুলোর মধ্যে রাজকুমারীর হাতখানিও একটি।

সত্য কথা বলতে কি, হাতখানি নিয়ে আমি কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছিলাম, যে হাত এতকাল লোহার মত শক্ত ও অসাড় ছিল, তা বেশ কোমল হয়েছে। তার সরু সরু আঙুলগুলোকে সহজেই এধারে-ওধারে সঞ্চালন করা যায়। তারপর ক্রমে সমস্ত হাতখানার আকৃতিও সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সেখানা হয়ে উঠল জীবন্ত মানুষের হাতের মত।

সেখানার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে সময়ে সময়ে আমি নিজেই চমকে উঠি। মনে হয় টেবিলের উপর লাল মখমলের গদিতে একটি সুন্দরী নারীর দক্ষিণ হাতখানি কেটে রাখা হয়েছে।

একদিন সকালে উঠে রাজকুমারীর হাতের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। দেখলাম, হাতখানার আঙুলের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ফোঁটা-ফোঁটা তাজা রক্ত। প্রত্যেকটি আঙুলের ডগা দিয়েও রক্ত বার হচ্ছে।

এমন অলৌকিক ঘটনা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। ভয়ে আমার মন ভরে গেল। তবুও মনকে শান্ত করবার জন্যে ভাবলাম, ওই লাল, তরল ও ঘন জিনিসটা রক্ত না হতেও পারে।

কিন্তু একজন রাসায়নিক যখন তার কয়েক বিন্দুকে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন জিনিসটা মানুষের রক্ত ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিন হাজার বছরের পুরাতন একখানি শুষ্ক কঠিন 'ম্যমি' হাত সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল!

রক্তাক্ত হাতখানার দৃশ্য আমাকে এমন পীড়া দিতে লাগল যে রাসায়নিককে বললাম, ওই হাতখানার রক্ত পড়া কি কোন রকমে বন্ধ করতে পারেন না? ওটা কি আবার আগের মত শক্ত হতে পারে না? যে রকমেই হোক ওটাকে আগের অবস্থায় পরিণত করুন। চোখের সম্মুখে এ দৃশ্য বড় অসহ্য!'

তিনি বললেন, 'তরল গালা ও পিচের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে হাতখানা আবার আগের মত শক্ত ও অসাড় হওয়া সম্ভব এবং ওর রক্ত পড়াও নিশ্চয় বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় তো আমার জানা নেই।'

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে বললাম, 'অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তেই ওটা নিয়ে যান।'

রাসায়নিক হাতখানা নিয়ে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে হাতখানা আমায় দিয়ে বললেন, 'দেখুন, এটা আগের মতই শক্ত ও অসাড় হয়ে গেছে, রক্ত পড়াও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মমির হাত দিয়ে কী করে যে রক্ত পড়তে পারে, আমি তো কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। এ ব্যাপারটা নিতান্ত অভাবনীয়।'

এই কথাটা আমিও মনে মনে ভাবছিলাম ; কাজেই তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমি রাজকুমারীর হাতখানা হাতে নিয়ে দেখি, তার কোন জায়গা দিয়েই আর রক্ত পড়ছে না।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাতখানা যথাস্থানে, সেই লাল মখমলেব গদির উপর রেখে দিলাম।

সারা দিন গেল ; সন্ধ্যা নামে নামে। এর মধ্যে আমি এমন একটু সময় করতে পারিনি যে হাতখানাব দিকে একবার মনোযোগ দিই। অবশ্য তার দরকারও ছিল না। কেননা গালা ও পিচের কঠিন ঘন আবরণের নিচে হাতখানা আগের মতই অসাড় হয়ে আছে বলে আমি নিশ্চিন্ত।

সেই সময় কাজের ফাঁকে একবার আমাব বসবাব ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ হাতখানাব দিকে আমার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

আমার পা দুটো আপনা থেকেই গতিহীন হয়ে গেল, হৃৎপিণ্ডটা ভয়ানক দুলতে লাগল। যে হাতকে আমি অসাড ও কঠিন ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম, আবার তার গ্রন্থি ও আঙুলের আগা দিয়ে পিচ এবং গালার আবরণ ভেদ করে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘবখানা ততক্ষণে ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায একটু কালো হয়ে উঠেছে, কোণে কোণে অন্ধকার জমা হচ্ছে। আমি অনুভব করলাম, সন্ধ্যার সেই ম্লান ছায়ায় আরও একটি ছায়া যেন কায়া মিলিয়ে বড় নিঃশব্দে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সাহসী বলে আমার খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যেও আমার মন গভীর শঙ্কায় ভরে উঠল।

সৌভাগ্যবশত আমি একেবারে চেতনা হারাই নি। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করে, মনে প্রচুর সাহস এনে হাতখানার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, আগের চেয়েও সেটা কোমল হয়ে এসেছে, যেন ধীরে গলে যাচ্ছে। বুঝলাম, আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ।

মনে পড়ল, ত্রিশ বৎসর পূর্বে নাইলের তটভূমিতে সেই স্তব্ধ জ্যোৎস্না রাতে থিবিস নগরে আমেনের জীর্ণ মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমার বৃদ্ধ অনুচরটির কথা—'আজ থেকে ত্রিশ বৎসর পরে একদিন।'

সেই ক্ষণটি আজই এল কি? কালসাগরের তিন হাজার বৎসরের দুস্তর ব্যবধান পার হয়ে রাজকুমারী জীবনের পরপার থেকে আজই তাঁর শুষ্ক দক্ষিণ হাতখানি নিতে এলেন?

কিন্তু আমি হিসেব করে দেখলাম, ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের তখনও একটি দিন বিলম্ব। এদিকে আমিও আর সময় নষ্ট করতে পারি না। নগরে তখন পূর্ণ অরাজকতা। আমার জিনিসপত্র যা ছিল সেইদিনই সব গুছিয়ে নিলাম। তবে, হাতখানার অবস্থা দেখে, সেটা আর সঙ্গে নেওয়া হবে না ভেবে স্থির করলাম, কালই আগুনে ওটাকে পুড়িয়ে ফেলব। কথাটা ভাবাতেই আমার মনের কোণে একটু ব্যথা বেজে উঠল। ওই হাতখানি যে আমার জীবনের এক অংশের একটি পাশ এতকাল ধরে রেখেছিল। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে? কিন্তু তা ছাড়া উপায়ই বা কী? আবার ভাবলাম, ওটাকে যদি সমাধিস্থ করি? কিন্তু তারই বা সুযোগ কোথায়!

আমি আর হাতখানার প্রতি মনোযোগ দিলাম না ; নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে রাতে আবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

রাত তখন গভীর ; প্রায় সারা নগরী ঘুমে অচেতন। কেবল দূর থেকে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী সৈন্যদের উন্মত্ত উল্লাস, সঙ্গীত ও দুটি একটি বন্দুকের আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই সময় চারজন সশস্ত্র দস্যু আমার ঘরে হানা দিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই তাদের চোখ পড়ল রাজকুমারীর অঙুলের সোনার আংটিটার উপর।

দস্যুসর্দার তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর হাতখানি মখমলের গদির উপর থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলে, তার হাত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সে সভয়ে চিৎকার করে হাতখানা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ঘর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

পরদিন আমার আরও জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলাম। বাকি রইল কেবল রাজকুমারীর হাতখানি, কয়েকটা কাঠের খালি বাক্স ও আমার একটা বড় পোর্টম্যান্টো।

যথারীতি দিন শেষ হয়ে নগরীর প্রাসাদ-শ্রেণীর মাথায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আর একটু পরেই সে-অন্ধকার দূর করে উঠল চাঁদ।

আমার হাতে তখন আর কোন কাজ নেই। মন বিষণ্ণ। কাল থেকে আর এই গৃহ ও ওই হাতের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

আমি বার বার হাতখানিকে দেখতে লাগলাম। রক্তে সেখানা ভেসে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল, থিবিসের বিশাল প্রান্তরে নাইলের তীরভূমিতে রাজকুমারীর মৃতদেহটি যেন পড়ে আছে। আর, তাঁর দক্ষিণ হাতখানি সদ্য কেটে এনে ওইখানে রাখা হয়েছে।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল। ঘরের চিমনিতে সন্ধ্যা থেকেই আগুন জ্বলছিল। আমি তাতে আরও কাঠ দিয়ে প্রখর ও প্রদীপ্ত করে দিলাম, যাতে রাজকুমারীর হাতখানি নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আকাশে তখন জ্যোৎস্নার বন্যা এসেছে ; নগরীর চোখেও তন্দ্রা নেমেছে। আমার ঘরে সন্ধ্যা থেকেই কোন আলো জ্বালিনি। খোলা জানলা-পথে জ্যোৎস্না এসে শূন্য ও নিস্তব্ধ ঘরখানির মেঝেয় ঘুমিয়ে আছে। এই আলোছায়ায় আমি একা দাঁড়িয়ে।

আমার বাড়ির গেটে খিলানের উপর একটা সুগন্ধ ফুলের লতা লতিয়ে উঠেছিল। গাছটি তখন সাদা ফুলে ভরা। জ্যোৎস্নায় সেগুলো আরও সাদা. সুন্দর ও স্বপ্নময় বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ আমার মন নীল সিন্ধুপারের সুদূর ইজিপ্টের দিকে ছুটে গেল। চোখের সামনে ছায়ার মত ভেসে উঠল বিশাল নাইল, তার তীরভূমিতে পামশ্রেণী, দূরে আকাশের গায়ে পিরামিড, তার উপর নির্মেঘ নীল আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। সব যেন নির্মল জ্যোৎস্নায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

হঠাৎ দূরে গীর্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং-শব্দে রাত্রি বারোটা বাজল। সেই শব্দে আমারও চমক ভাঙল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার দরজায় খিল আটকে, আমার ঘরেরও দরজাটা বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দিলাম। ওক কাঠের ভারী দরজা ; কাপে কাপে বসে গেল।

চিমনির চুল্লিতে তখন খুব তেজে আগুন জ্বলছে। আমি সেটা আরও উসকে দিয়ে টেবিলের কাছে সরে এসে রাজকুমারীর কোমল ও রক্তাক্ত হাতখানি দুহাতে তুলে নিলাম। সেই সময় হাতখানির স্পর্শে আমার সারা শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটা শিহরণ বয়ে গেল। সেইসঙ্গে মনে পড়ল, আজই রাতে রাজকুমারী হাতখানি আমার কাছ থেকে নিতে আসবেন।

আমার মন আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে হাতখানিকে প্রদীপ্ত চুল্লির ঠিক মাঝখানে ফেলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারধার থেকে খর জিহ্বা মেলে শত-শত অগ্নি-শিখা তাকে ঘিরে ধরে দগ্ধ করতে লাগল। যে সুগন্ধি আরক মাখিয়ে হাতখানি মমি করা ছিল, অগ্নিস্পর্শে তার সুন্দর বাসে ঘরখানি ভরে গেল।

আমি স্থির দৃষ্টিতে চুল্লির দিকে তাকিয়ে রইলাম। নিস্তব্ধ নির্জন ঘর। কেবল চুল্লি থেকে একটু একটু শব্দ হচ্ছে। ক্রমে হাতখানাকে নিঃশেষে জীর্ণ করে অগ্নিশিখাগুলি সাপের মত ফণা নত করে রক্তোজ্জ্বল অঙ্গাররাশির উপর দিয়ে লতিয়ে এক-এক দিকে যেন মিলিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে কেবল তপ্ত ও গাঢ় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল অঙ্গাররাশি ছাড়া চুল্লিতে আর কিছু দেখা গেল না। আমি নিশ্বাস ফেলে চেয়ার থেকে উঠতেই বাইরের দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শুনে স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

প্রথমে মনে হল, প্রবল বাতাস দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। সে সময় কোথাও এতটুকু বাতাস ছিল না ; সব শান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন। বোধ হল, কে যেন বারান্দার ভারী দরজাটা প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে ফেললে। তারপরেই দেখলাম, আমার ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজাটাও হঠাৎ এক ধাক্কায় সশব্দে খুলে গেল।

ভাবলাম দস্যুদল ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে জনপ্রাণী নেই, কেবল খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে অনেকখানি জায়গা আলোকিত করে তুলল।

এই দৃশ্যে ভয়ে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এল। সেখান থেকে একেবারে গেট অবধি পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। আমার এই দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেবল গেটের খিলানের উপর জ্যোৎস্নাঢালা পুষ্পিত লতাটি ছাড়া আর কিছু নেই।

হঠাৎ দেখলাম, সেখানে যেন স্বচ্ছ বাতাসের একটি ক্ষীণ ছায়া একটু একটু করে কায়া নিচ্ছে, যেন কোন অশরীরী ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ক্রমে সেটি সেখান থেকে আমার ঘরের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং সেইসঙ্গে তার কায়া আরও স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। শেষে সেটা যখন আমার ঘরের অন্ধকারে এসে পৌঁছল তখন দেখলাম, একটি সুন্দরী নারীমূর্তি। তার মাথা থেকে কটিদেশ অবধি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চলার বেগে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একটু একটু দুলছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মূর্তিটি আরও এগিয়ে এল। তার উজ্জ্বল ও আয়ত চোখদুটি এবার আরও উজ্জ্বল হয়ে দুটি স্থির নক্ষত্রের মত জ্বলছে ; তাঁর সারা মুখে ও দেহ-ভঙ্গিমায় রাজকীয় ভাব পরিস্ফুট। আমার বোধ হতে লাগল, আমি যেন তিন হাজার বৎসর আগে ইজিপ্টের এক রাজকুমারীর সম্মুখে অতি সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে আছি।

রাজকুমারী ঘরখানা পার হয়ে আমার পাশ দিয়ে চুল্লিটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এবার দেখলাম, তাঁর মাথায় উজ্জ্বল সোনার মুকুট চুলের উপর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, তার মধ্যখানে কপালে একটি উদ্যত-ফণা সোনার সাপ, আর তাঁর কটিদেশ ঘিরে উজ্জ্বল রত্নাভরণ ঝলমল করছে।

রাজকুমারী মরাল গতিতে চুল্লির কাছে গিয়ে নত হয়ে সেই উজ্জ্বল অঙ্গাররাশির মধ্য থেকে কি যেন দুহাতে তুলে নিলেন। তারপরই আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ, চোখদুটি ও দেহখানি যেন পরম উল্লাসে দুলে উঠল। তাঁর সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই চোখদুটি আজও আমার চিত্তাকাশে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই সময়ে তাঁর ক্ষীণ অধরদুটি কি যেন বলতে গিয়ে একবার মৃদু কম্পিত হল। সে কথা আমার কানে পৌঁছল না বটে, কিন্তু তার মর্ম আমার অন্তর স্পর্শ করলে। বুঝলাম তিনি এই হতভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ; আমারও মাথা আপনা হতেই সম্ভ্রমে নত হয়ে এল।

তারপর রাজকুমারী হাত দুখানি ধীরে লীলায়িত ভঙ্গিতে তাঁর মাথার উপর তুলে আমার দিকে অতি ধীরে মাথা নুইয়ে আবার গর্বিতভাবে সোজা হয়ে উঠে একটু একটু করে দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে লাগলেন।

আমিও যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে চললাম।

ক্রমে সেই ছায়ামূর্তি ঘর থেকে বার হয়ে বারান্দা দিয়ে খোলা চাঁদের আলোয় ফুলের মৃদুগন্ধ-ভরা শান্ত বাতাসে ভাসতে ভাসতে খিলানের কাছে পৌঁছল। সেই সময়ের মধ্যে তাঁর দেহ একটু ক্ষীণ হয়ে এসেছিল ; তখন আরও ক্ষীণ হয়ে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু চোখদুটি তখনও তেমনি উজ্জ্বল।

ক্রমে তাঁর সারা দেহ অদৃশ্যালোকে লীন হয়ে গেল, বাতাসে ভেসে রইল কেবল নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল চোখ দুটি। শেষে সে-দুটিও ম্লান হয়ে রাতের আকাশে মিলিয়ে গেল, আমার চোখের সামনে ফুটে রইল কেবল সাদা স্বপ্নালস ফুলগুলি, আর মনের মধ্যে সেই জ্যোৎস্না রাতের বিচিত্র স্মৃতিখানি। ❑



রাতের অতিথি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা জান না, সে অনেক দিনের কথা, তখন ভারতবর্ষে প্রথম রেল এসেছে। সেই সময় একবার মৃত্যু দেবতার ক্রুর দৃষ্টি এই বাংলা দেশের উপর পড়েছিল। দেয়ালীর সময় যেমন পোকা মরে তেমনি মানুষ মরে দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছিল।

নির্জিত নিস্তেজ জাতির উপর বিধাতার এই ক্রোধ যে মহামারীরূপ ধরে দেখা দেবে এ কেউ কল্পনা করতে পারেনি। শুধু পশ্চিমবাংলায় গঙ্গার ধারের একটি গ্রামে একজন লোক তার ইসারা পেয়েছিল।

গ্রামটি বেশ বর্ধিষ্ণু। মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ এই গ্রামের সবচেয়ে বড় গৃহস্থ। তার ক্ষেত খামার পুকুর বাগান হাল গরু অনেক আছে। গ্রামের সকলে তাকে ভারি শ্রদ্ধা করে। সে ভারি ভাল লোক, বিষয়-বুদ্ধিও যেমন আছে তেমন শরীরে দয়া-মায়ারও অভাব নেই।

সে সময় গ্রামের পাশ দিয়ে রেল লাইন যাবার উঁচু বাঁধ তৈরি হচ্ছিল—হাজার হাজার কুলি তাতে কাজ করত, গ্রামের কাছেই তারা ছাউনি ফেলে থাকত ; দিনের বেলায় তাদের কোদাল কুড়ুল গাঁইতির শব্দে চারিদিক চঞ্চল হয়ে উঠত আর রাত্রে তাদের ছাউনির হাজার হাজার আলো গ্রাম থেকে আলেয়ার মত বোধ হত।

গ্রামের লোকেরা হাঁ করে তাদের কাজ দেখত আর ভাবত, না জানি এসব কি হচ্ছে। ...েল তারা কখনো দেখেনি তাই এই উঁচু পাড়ের অর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারত না ; কিন্তু ...ত্যুঞ্জয় ঘোষ বুদ্ধিমান লোক ছিল, সে মাথা নেড়ে বলত, 'এসব ভাল ব্যবস্থা নয়, কোম্পানী ...টি কেটে জঙ্গল তৈরি করছে, বর্ষার জল বেরুতে পাবে না ; তখন দেশের কি অবস্থা হবে!'

কিন্তু তার কথা কে শুনবে? ক্রমে কুলিরা কাজ করতে করতে এগিয়ে গেল, পড়ে রইল ...ধু তাদের তৈরি লম্বা উঁচু বাঁধটা। তার পাশে ছোট ছোট গাছ গজাতে শুরু করল, গাঁয়ের ...লেরা তার উপরে উঠে খেলা করত। আস্তে আস্তে জিনিসটা সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেল।

এমনিভাবে চার-পাঁচ মাস কেটে গেল।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয় নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসে থেলো হুঁকোয় ...মাক খাচ্ছিল আর ঝিমোচ্ছিল। এক পায়রা-মটর প্রমাণ আফিম্ খাওয়া তার অভ্যাস ছিল—...ার উপর হুঁকোয় মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে মৌতাত বেশ জমে এসেছিল। এমন সময় খট্ খট্ ...ব্দ শুনে চমকে উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক লাঠি হাতে করে সামনে এসে ...াঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তার চেহারা দেখা গেল না, মৃত্যুঞ্জয় ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'কি চাও? ...ক তুমি?'

'অতিথি।'

অপরিচিত লোকটার গলার আওয়াজ শুনে মৃত্যুঞ্জয়ের হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত ...ন জমে গেল, এমন আওয়াজ সে জীবনে কখনো শোনেনি। 'তুই খুলি মুই খুলি' পাখির ...াক শুনেছ? ঠিক সেই রকম আওয়াজ—কানে গেলেই গা শিউরে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় কোন ...কমে হাতের হুঁকোটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথা থেকে আসা ...চ্ছে?'

'ওপার থেকে।'

মৃত্যুঞ্জয় মনে করলে গঙ্গার ওপার থেকে। সে তখন চাকর ডেকে আলো আনতে ...লে। অতিথি অভ্যাগত মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে প্রায়ই আসত—কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যেত ...া, আগন্তুকদের থাকবার জন্যে একটা ঘর ছিল—তারা যতদিন ইচ্ছা থেকে খাওয়া-দাওয়া ...রে নিজের গন্তব্যস্থানে চলে যেত।

চাকর আলো নিয়ে এল। তখন অতিথির চেহারাখানা দেখা গেল। মাথার উপর মস্ত ...কটা পাগড়ী, তার ল্যাজটা মুখের চারিদিকে এমনভাবে জড়ানো যে মুখের কোনো অংশই ...খা যায় না, শুধু চোখ দুটো যেখানে থাকা উচিত সেখান থেকে যেন একটা কালো আভা ...রুচ্ছে। সর্বাঙ্গে একটা কালো চাদর ঢাকা, পায়ে নাগরা জুতো। লাঠিটা যে হাতে ধরে আছে হাতের কব্জি পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে—আবলুশের মত কালো! মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে বড় ভয় ...। এই গ্রীষ্মকালে লোকটা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে আছে কেন? মুখ দেখাচ্ছে না কেন? ...ার ডাকাত নয় তো? মনে মনে সে এই কথা ভাবছে এমন সময় অতিথি খল্‌খল্ করে হেসে ...ল! হাসি শুনে মৃত্যুঞ্জয় চমকে উঠে বললে, 'তা বেশ, আজ রাত্তিরে এখানেই থাকুন—বসুন ওরে, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দে।'

'দরকার নেই। আলোটা নিয়ে যেতে বলুন।'

চাকর আলো নিয়ে চলে গেলে অন্ধকারে লোকটা মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে এসে বসল মৃত্যুঞ্জয়ের গা ছমছম্ করতে লাগল, কিন্তু সেভাব প্রকাশ না করে মুখে বললে, 'আপনার কোথায় যাওয়া হবে?'

'পুবের দিকে যাচ্ছি।'

তারপর দুজনে আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ। এই বৈশাখ মাসের গরমেও মৃত্যুঞ্জয়ের গা একটু শীত শীত করতে লাগল। হুঁকোয় বড় বড় গোটাকয়েক টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে 'তামাক ইচ্ছে করবেন কি? আনিয়ে দেব?'

আবার সেই খল্‌খল্ হাসি! আগন্তুক বললে, 'তামাক বহুকাল খাইনি। কিন্তু থাক, এযাত্রা আর কাজ নেই।'

এতক্ষণে মৃত্যুঞ্জয়ের মনে পড়ল যে আগন্তুকের নাম জানা হয়নি; সে বললে, 'মশায়ের নামটি কি?'

অতিথি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, অন্ধকারে মনে হল যেন তার চোখ দিয়ে কালো আগুন বেরুচ্ছে, সে বললে, 'অত খবরে দরকার কি, যা বলেছি তাই যথেষ্ট, এখন আমি কোথায় শোব দেখিয়ে দাও, অনেক দূর থেকে এসেছি ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।'

অতিথির এই রূঢ় কথায় মৃত্যুঞ্জয়ের রাগও হল আবার ভয়ও হল। একবার ভাবলে, হয়ত কোনো রাজারাজড়া গোছের বড়লোক ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই পরিচয় দিতে চায় না, যা হোক, সে বললে, 'কিন্তু আহারাদি করবেন না?'

'না, আমার পেটের ক্ষিদে তোমরা মেটাতে পারবে না। আবার যখন আসব তখন হবে।

অতিথির কথার মানে মৃত্যুঞ্জয় কিছুই বুঝতে পারলে না, কিন্তু তবু বাড়িতে অভুক্ত অতিথি থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। তাই সে আবার বললে, 'কিন্তু, অনেক দূর থেকে আসছেন বললেন, ক্লান্তও হয়েছেন, একটু আহার করে শুলে হত না?'

অতিথি অধীর ভাবে বললে, 'না, কোথায় শোব দেখিয়ে দাও।'

মৃত্যুঞ্জয় তখন তাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিলে। অতিথি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর আর তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

নানারকম দুর্ভাবনা মৃত্যুঞ্জয়ের মনে আনাগোনা করতে লাগল। লোকটা কে? যদি ভাল লোকই হবে তবে অমন মুখ ঢাকা দিয়ে বেড়ায় কেন? লোকটার গলায় আওয়াজ কি ভয়ঙ্কর----শুনলেই গা কেঁপে ওঠে, আর গায়ের রঙ কি কালো। শুধু একটা হাত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সেটা যেন আলকাতরার মত! যদি সত্যিই ডাকাত কি বদমায়েস হয় তাহলে উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় বাড়ির ভিতর গিয়ে চাকরবাকরকে সাবধান করে দিলে যেন তারা রাত্রে সতর্ক থাকে। আর নিজে ঠিক করলে ওই অজ্ঞাত অতিথির গতিবিধির উপর নজর রাখবে। মনে মনে এই সঙ্কল্প এঁটে সে রাত্রির মত খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার চণ্ডীমণ্ডপে এসে বসল বাড়িতে একটা বহুকালের পুরনো মরচে-ধরা তলোয়ার ছিল, সেইটে সঙ্গে রইল।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বিশ হাত দূরে অতিথির ঘর—সেখান থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। এদিকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে মৃত্যুঞ্জয় ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে আর মাঝে মাঝে চোখ

অতিথির ঘরের দিকে চাইছে। ক্রমে রাত্রি বেড়ে চলল, গ্রাম একেবারে নিশুতি হয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশের বড় বড় তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল।

একবার মৃত্যুঞ্জয় পা টিপে টিপে উঠে অতিথির দরজায় আড়ি পেতে শোনবার চেষ্টা করলে অতিথি জেগে আছে কিনা। কিন্তু কোন শব্দই সে পেল না—এমন কি অতিথির নাক ডাকার শব্দ পর্যন্ত নয়! তখন সে ফিরে এসে আবার তামাক সেজে টানতে লাগল। এমনি ভাবে রাত-দুপুর পার হয়ে গেল।

হুঁকো হাতে করেই মৃত্যুঞ্জয় ঝিমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কিসের শব্দে চট্‌কা ভেঙে চোখ চেয়ে দেখলে আকাশে হলুদ রঙের এক টুকরো চাঁদ উঠেছে—তারই আলোতে বাইরের প্রকৃতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল সে ধরতে পারেনি, কান খাড়া করে রইল। কিছুক্ষণ বাদে খুট্ করে আবার শব্দ হল। যেন কে খুব সন্তর্পণে অতিথির ঘরের দরজা খুলছে। মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে হাতের হুঁকো নামিয়ে রেখে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ আবার নিস্তব্ধ। তারপর অতিথির ঘরের দরজা দিয়ে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল! চাঁদের আবছায়া আলোতে তার চেহারা দেখে মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের স্পন্দন যেন হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই আবার উন্মত্ত বেগে ছুটতে আরম্ভ করল। সে দেখল, মানুষ না, একটা আস্ত মানুষের কঙ্কাল উলঙ্গ হয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার হাড়গুলো সাদা নয়—কুচ্‌কুচে কালো। পাঁজরার ভিতর দিয়ে এপার ওপার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আর হাতে সেই লম্বা লাঠিটা।

চণ্ডীমণ্ডপের অন্ধকারে বসে মৃত্যুঞ্জয় অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপতে লাগল। কঙ্কালটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকে ফিরে দেখলে—তার মাংসহীন মুখে সারি সারি দাঁতগুলো চাঁদের আলোয় বিকট হাসির মত মনে হল। তারপর সে উঠান পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

তার মূর্তিটা বাইরে মিলিয়ে যেতেই মৃত্যুঞ্জয় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চেঁচামেচি করে লোকজন জড় করবার ক্ষমতা ছিল না, গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই কঙ্কালটা কোথায় গেল জানবার অদম্য কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে অথচ কঙ্কালের পিছন পিছন যাবার ইচ্ছা—এ এক আশ্চর্য মনের অবস্থা। বাঘের পিছু পিছু যখন ফেউ ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের মনের ভাবও বোধহয় ওই রকম হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে দেখলে কঙ্কালটা লাঠি কাঁধে করে অনেক দূরে এগিয়ে চলেছে। সেও সেইদিকে চলল। ক্রমে কঙ্কাল শ্মশান-ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। মৃত্যুঞ্জয় তখন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে তার কার্যকলাপ দেখতে লাগল।

শ্মশানে অনেক ভাঙা কলসী আর মড়ার হাড়গোড় পড়েছিল। চিতা জল দিয়ে নিভিয়ে দেবার পর যেমন সেখানে একটা লম্বা গর্ত হয়ে যায়, সেই রকম একটা জায়গায় কঙ্কালটা গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কাঁধ থেকে লাঠিটা নামিয়ে তার মুণ্ডটা সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির মুণ্ডটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। তখন পৈশাচিক অট্টহাসির মত একটা চিৎকার করে কঙ্কালটা সেই জ্বলন্ত লাঠি কাঁধে ফেলে দৌড়তে আরম্ভ করলো।

মৃত্যুঞ্জয়ও মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে ছুটতে লাগল। তখন তার আর বাহ্যজ্ঞান নেই স্বপ্নে যেমন নিজের দেহ মনের উপর কোনো অধিকার থাকে না তেমনি অসহায়ভাবে সে কঙ্কালকে অনুসরণ করে ছুটে চলল।

লাঠির আগাতে আগুন জ্বলছিল বটে, কিন্তু তা থেকে আলোর চেয়ে ধোঁয়াই বেশি বার হচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় দেখলে, ধোঁয়াটাও ঠিক যেন ধোঁয়া না যেন রাশি রাশি কালো পোকা বেরিয়ে চারিদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে যেন অগণ্য অসংখ্য মশা সেই আগুনে জন্মগ্রহণ করে আকাশ ছেয়ে ফেলছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে রেলের বাঁধের উপর উঠে কঙ্কালটা ছুটতে লাগল আর এক অপার্থিব হাসি হাসতে লাগল। যেন সে হাসি অন্যান্য অশরীরী সঙ্গীদের ডেকে বলছে—আয় আয়, মানুষের রক্ত শুষে খাবি তো আয়! হা হা! বড় মজা! শীগ্‌গির আয়! শীগ্‌গির আয়!

রেলের পাড়ের উপর উঠে মৃত্যুঞ্জয় দেখলে—তার বাড়ির দিকটাতে যেন অনেক আলো জ্বলছে, সেদিকটা রাঙা হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে কথা ভাববার তার সময় ছিল না, সে অন্ধভাবে কঙ্কালের পিছনে ছুটে চলল।

কঙ্কাল সমস্ত গ্রামটাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে। তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়িতে আগুন লেগেছে, সমস্ত বাড়িখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কঙ্কাল তার হাতের জ্বলন্ত লাঠিটা সেই আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে। তারপর হঠাৎ গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের সামনে দাঁড়াল।

মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণে আর তখন ভয় ছিল না, সে কঙ্কালকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?'

কঙ্কাল খল্‌খল্ করে হেসে বললে, 'কে আমি? আমি অগ্রদূত, আমার সঙ্গীরা সব আসছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আসছে। বাংলাদেশ ছেয়ে যাবে—ঘরে ঘরে মড়াকান্না উঠবে, তারপর চিতায় দেবার লোকও থাকবে না—ঘরে ঘরে পচা মড়া পড়ে থাকবে। রাস্তায় শেয়াল-কুকুর মড়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে। হাঃ হাঃ হাঃ! আসছে—তারা আসছে! আমিও যাই—এগিয়ে চলি!' এই পর্যন্ত বলে কঙ্কাল যেন হঠাৎ হাওয়ায় মিশিয়ে গেল।

পুবদিক তখন ফর্সা হয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে, মনে হল যেন ধোঁয়ার মত প্রকাণ্ড একঝাঁক মশা সঙ্গে করে নিয়ে লম্বা পা ফেলে কঙ্কালটা পুবদিকে এগিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

গাঁয়ের লোকে এসে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির আগুন নেভাবার চেষ্টা করলে ; কিন্তু আগুন নেভানো গেল না—বাড়ি একেবারে ছাই হয়ে গেল।

মূর্ছা ভেঙে উঠে মৃত্যুঞ্জয় পাগলের মত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সব কথা বললে। তার গল্প শুনে গাঁয়ের লোকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারপর যে-যার বাড়ি ফিরে গিয়ে এই কথাটাই আলোচনা করতে লাগল যে কাল রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের আফিমের মাত্রা নিশ্চয় এক-মটর থেকে দু-মটরে উঠেছিল। ❑



ভূতুড়ে কাণ্ড

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যে কাজ যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, কিংবা যে কাজ আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটে যায়, তাকে আমরা বলি ভূতুড়ে কাণ্ড।

আবার ভূতেরা নিজে যে কাজ করে তাকে তো ভূতুড়ে কাণ্ড বলেই।

আমাদের পরিবারে এমনই এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেছিল।

পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছি। দিদিমা আর মামাদের আদরের সঙ্গে প্রচুর আম জাম জামরুল খাচ্ছি। তোফা আনন্দে সময় কাটাচ্ছি।

তিন মামা। বড়মামা রেল অফিসে কাজ করতেন। বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের বাসাবাড়িতে থাকতেন। মাসে একবার বাড়িতে আসতেন।

তিনি মেজমামাকে তাঁরই অফিসে চাকরি করে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মেজমামা রাজী নন। ছেলেবেলা থেকে মেজমামা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সব ব্যাপারেই বেপরোয়া।

তিনি বলেছিলেন, চাকরি-বাকরি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি স্বাধীন ব্যবসা করব।

তা মেজমামা স্বাধীন ব্যবসাই শুরু করেছিলেন। পাঁচ মাইল দূরের মাছের ভেড়ি থেকে মাছ কিনে গঞ্জের হাটে ব্যাপারীদের কাছে সেই মাছ বিক্রি করা। পরিশ্রমের কাজ কিন্তু ভাল টাকাই হাতে থাকত।

ছোটমামা কিছু করত না। মামাদের চাষ বাসের জমি দেখত আর অবসর সময়ে জাল দিয়ে পাখি ধরত, কাঠি দিয়ে খাঁচা তৈরি করত আর তাতে পাখিগুলোকে রাখত। তবে বেশিদিন নয়। হঠাৎ একদিন খাঁচার দরজা খুলে পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিত। এক নম্বরের খেয়ালি লোক।

আমাদের গল্প অবশ্য মেজমামাকে নিয়ে।

গল্পই বা বলি কেন, একেবারে আমার চোখে দেখা ঘটনা।

মেজমামা খুব ভোরে উঠে সাইকেলে রওনা হয়ে যেতেন। খুব ভোরে, তখন ভাল করে আলোও ফুটত না। রাস্তাটা অনেকটা পাকা নয়। মানুষের পায়ে পায়ে চলে সরু একটু রেখা বেশ কিছুটা যাবার পর ইউনিয়ন বোর্ডের পাকা রাস্তা।

একদিন ভোরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। বোঝা যাচ্ছে একটু পরেই ঝড়জল শুরু হয়ে যাবে।

মেঘের ডাকে আমিও ভোর ভোর উঠে পড়েছি। উঠে মেজমামার যাওয়ার তোড়জোড় দেখছি।

দিদিমা বললেন, ওরে, এই আবহাওয়ায় আজ না হয় নাই বেরোলি। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। এখনই জোর তুফান উঠছে।

ঝড়কে দিদিমা তুফান বলতেন।

মেজমামা হাসলেন, তাহলে তো বর্ষাকালে বাড়ির বাইরে যাওয়া যায় না। আমার কাছে বর্ষাতি আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

মেজমামা যখন বের হলেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাতাসও বেশ জোর।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দারুণ ঝড় উঠল। চারদিক অন্ধকার। বাজের শব্দে কান পাতা দায়। সেই সঙ্গে তুমুল বর্ষণ। এধারে ওধারে বড় বড় গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কি বাড়ির চালা উড়ে গেল। ধসে পড়ল মাটির দেয়াল। দিদিমার কথাই ঠিক। তুফানই বটে।

আমি জানলার ধারে চুপচাপ বসে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছি। একটু পরেই দিদিমা এসে আমার পাশে বসলেন।

বসেই আক্ষেপ করতে লাগলেন, এই দুর্যোগে বাড়ির কুকুর বেড়াল বাইরে বের হয় না, আর এত বারণ করা সত্ত্বেও ছেলেটা রাস্তায় বের হল।

সত্যিই চিন্তার কথা। এই ঝড়জলে বর্ষাতি আর মেজমামাকে কতটুকু বাঁচাতে পারবে। হাওয়ার দাপটে সাইকেল চালানোই মুশকিল। সাইকেল থেকে নেমে যে কোন গাছের তলায় আশ্রয় নেবেন, তাও নিরাপদ নয়। মাথার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লেই হল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা ঝড়বৃষ্টি চলল। দিদিমা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে বিছানা নিলেন, মেজমামার নাম করে অঝোরে কান্না।

মেজমামা ফিরলেন রাত আটটা নাগাদ। সাইকেল নেই। হেঁটেই এসেছেন। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। পরনের জামা কাপড় ছিন্নভিন্ন। বর্ষাতির খোঁজ নেই।

দিদিমা মেজমামাকে জাপটে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না। শুধু কি জাপটে ধরা, ভেউভেউ করে কান্না।

মেজমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ ছাড়! জাপটাজাপটি আমার ভাল লাগে না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মেজমামা তোমার সাইকেল?

বটগাছ চাপা পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বটগাছ চাপা?

হ্যাঁ, কাঞ্চনতলার কাছে দারুণ ঝড় উঠল। বটগাছের ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল আমার ওপর। সাইকেল চুরমার হয়ে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম মাটির ওপর। এই দেখ না।

মেজমামা চুল সরিয়ে দেখালেন। মাথার এক জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে।

তারপর থেকে মেজমামা কেমন বদলে গেলেন।

মাছের ব্যবসা বন্ধ। সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন। রাত্রে বেরিয়ে যেতেন। কখন ফিরতেন কে জানে।

দিদিমা অনেক বলতেন, কিন্তু মেজমামা নির্বিকার।

শেষকালে দিদিমার নির্দেশে আমি শুতাম মেজমামার সঙ্গে। অবশ্য আলাদা খাটে।

একদিন খুব ভোরে মেজমামার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

এই, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস?

ঘরের কোণে স্টোভ ছিল। তাকের ওপর চা, চিনি কাপ ডিশ। আগে আগে ভোরে বের হবার সময় মেজমামা নিজে চা করে খেতেন।

ঘুম জড়ানো গলায় বললাম, তুমি নিজে করে খাও না।

মেজমামা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, না, আমি আগুনের কাছে যেতে পারব না। ভয় করে।

ভয় করে কথাটা মেজমামার মুখে নতুন শুনলাম। মেজমামা চিরকাল দুর্দান্ত প্রকৃতির। দারুণ সাহস।

সেই দুর্ঘটনার পর থেকে মেজমামা যেন কুঁকড়ে গেছেন। কারও সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন না। কেউ ডাকতে এলে বলে দেন, বল, আমি বাড়িতে নেই।

আরও আশ্চর্যের কাণ্ড মাথার একদিকের রক্ত জমে থাকাটা একই রকম রয়ে গেল। ওষুধপত্র মালিশ কিছুতে কিছু হল না।

অগত্যা উঠে চা তৈরি করে দিলাম। নিজেও খেলাম এক কাপ।

আর এক রাতে এমন এক ব্যাপার ঘটল, তাতে একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। কদিন গুমোট গরম পড়েছে। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি।

বহুকষ্টে যাও-বা একটু ঘুম এল, সেটা পেঁচার কর্কশ আওয়াজে ভেঙে গেল।

ভয় পেয়ে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। কোথাও একটু অন্ধকার নেই।

মেজমামার দিকে চোখ ফিরিয়েই চমকে উঠলাম। আমার মামার বাড়ির সবাই বেশ একটু খর্বকায়। মেজমামা আবার সবচেয়ে বেঁটে।

সেই মেজমামাকে দেখলাম, বিরাট চেহারা। দেহ খাটের বাইরে গিয়ে পড়েছে।

দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলাম একই দৃশ্য।

খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই দৃশ্য বদলে গেল। মেজমামা যেন নিজের সাইজে ফিরে এলেন।

মনকে বোঝালাম ঘুম চোখে নিশ্চয় ভুল দেখেছি। না হলে এমন ব্যাপার হতে পারে নাকি।

একথা কাউকে কোনদিন বলি নি, জানি কেউ বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু পরে যা ব্যাপার ঘটল, তাতে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, মেজমামা বিছানায় নেই। ভাবলাম প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছেন এখনই ফিরবেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, মেজমামা ফিরলেন না।

উঠে পড়লাম। জানলা দিয়ে বাইরে চোখ ফিরিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মেজমামা রোয়াকে বসে আছে। জানলার দিকে পিছন ফিরে।

একটু দূরে গোটা কয়েক গাছ পার হয়ে একটা জাম গাছে ছোটমামা জাল পেতে রেখেছে পাখি ধরবার জন্যে। জালের এক জায়গায় ফুটো ছিল, ছোটমামা বোধ হয় লক্ষ্য করেনি। সেই ফুটো দিয়ে আটকে থাকা পাখিগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মেজমামা বসে বসেই হাত বাড়ালেন। কি বিরাট হাত। রোয়াক থেকে জাম গাছটার দূরত্ব কম পক্ষে ত্রিশ গজ তো হবেই।

হাতটা সোজা গাছের ওপর চলে গেল। যেখানে জালের ফুটো সেখানে। মেজমামা আঙুল দিয়ে জালে গিঁট বেঁধে দিলেন। পাখিদের পালানো বন্ধ হল।

আমি বুকের ওপর হাত চেপেও দুপদুপ শব্দ বন্ধ করতে পারলাম না। মনে হল এখনই অজ্ঞান হয়ে যাব। কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর শুয়ে পড়লাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ভোরে উঠে দেখি মেজমামা খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আশ্চর্য কাণ্ড, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। কাল রাতে মেজমামা যখন রোয়াকে বসে তখন লক্ষ্য করেছি, দরজায় ছিটকানি।

তাহলে মেজমামা বাইরে গেলেন কি করে? বন্ধ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বা কি করে ঢুকলেন?

ঠিক করে ফেললাম, আর মামার বাড়ি নয়। কোন একটা অছিলায় বাড়ি পালাব।

এটাও কি চোখের ভুল? দু দুবার এরকম চোখের ভুল হতে পারে কখনও!

দুপুরবেলা কিন্তু মত বদলে গেল। ছোটমামা জালে আটকানো পাখিগুলো নিয়ে খাঁচায় পুরছিল। আমি বসে বসে দেখছিলাম। মেজমামাও বসেছিলেন।

বেশির ভাগই মনুয়া আর টুনটুনি পাখি। একটা শুধু বড় আকারের টিয়া। গাঢ় সবুজ রং। লাল চোখ। কিছুতেই ধরা দেবে না। ছোটমামার হাতে ঠুকরে রক্ত বের করে দিল।

আমি তো তখন দেখছিলামই, আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম। আড়চোখে দেখছিলাম উঠোনে মেজমামার ছায়া পড়েছে কিনা, আব ার পায়েব আঙুলগুলো উল্টোদিকে কিনা!

দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। উঠোনের ওপর মেজমামার রীতিমত ছায়া পড়েছে আর তাঁর পায়ের আঙুলগুলো একেবারে স্বাভাবিক।

তার মানে রাত্রে নিশ্চয় আমি বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছি। পেট গরম হলে যা হয়। পেট ঠাণ্ডা করার জন্যে রোজ সকালে একটা করে ডাব খেতে হবে।

আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার বিপদও আছে। এখানে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি, আর ওখানে বাবা রোজ পাঁচপাতা হাতের লেখা আর দশটা অঙ্ক কষাবে।

বেশ কিছুদিন অলৌকিক কিছু চোখে পড়ল না। বুঝতে পারলাম নিজের ভয়ের বিকৃত রূপটাই দেখেছি।

মেজমামা যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন তাতে দিদিমা খুব খুশি। তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে।

কিন্তু আমি ভাবি মেজমামার চলবে কি করে।

একদিন জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম।

হ্যাঁ মেজমামা, তুমি যে মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিলে? কি হবে?

মেজমামা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, ফিরে বললেন, কেন, তোর অসুবিধাটা কি হচ্ছে?

মুশকিলে পড়ে গেলাম। সামনে গিয়ে বললাম, না, অসুবিধা আর কি! আগে তুমি মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আনতে —

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মেজমামা বললেন, ও, এই কথা। তোকে আজই বড় মাছ খাওয়াচ্ছি।

মেজমামা বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন, হাতে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ নিয়ে।

আমি তো অবাক!

হ্যাঁ মেজমামা, এর মধ্যে এত বড় মাছ পেলে কোথায়?

মেজমামা হাসলেন, একজন জেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মাছের ঝুড়ি নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। আমার তো সবই চেনা। বলতেই দিয়ে দিল।

দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। বঁটি নিয়ে এসেই মাছ কুটতে বসলেন। আমি কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোজ ছাই রঙা একটা উটকো বেড়াল এ বাড়িতে আসত। আহারের সন্ধানে। সেদিনও সে এসে হাজির।

বঁটির পাশে আঁশের স্তূপ। বেড়ালটা এগিয়ে এসে আঁশে মুখ দিয়েই বিকট স্বরে ম্যাঁও করে উঠল। অস্বাভাবিক স্বর। কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

তারপর ল্যাজটা খাড়া করে সোজা পাঁচিলের ওপর গিয়ে উঠল। দিদিমাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন।

তিনি বললেন, বেড়ালটার কি হল বল তো? ওভাবে চেঁচিয়ে উঠল! গলায় কাঁটা ফুটল না কি?

কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছি বেড়ালটা একটা আঁশও মুখে তোলে নি। খাওয়া তো দূরের কথা!

কেবল শুঁকেই ওই রকম চিৎকার করে উঠল। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

এমন কি দিদিমা যখন একটা কলাপাতায় বড় মাছের টুকরো ভেঙে আমাকে খেতে ডাকলেন তখন একটু ইতস্তত করেছিলাম।

তারপর মনে সাহস এনে মাছের টুকরো মুখে দিয়ে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। না, কোন গোলমেলে ব্যাপার নেই। দিব্যি সুস্বাদু মাছ।

কত অল্পেতে আমরা ভয় পেয়ে যাই। বেড়ালটার ওভাবে চিৎকার করে ওঠার হাজার কারণ থাকতে পারে।

তবে সেদিন থেকে বেড়ালটাকে আর ধারে কাছে দেখতে পাই না। বোধ হয় অন্য কোন বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।

এতদিন কথাটা দিদিমা কিংবা ছোটমামাকে বলি নি। কারণ, প্রথমত সব ব্যাপারটা নিজেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। হয়তো আমারই চোখের ভুল কিংবা ভয়ের ছায়াটা রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত প্রয়োজন হলে এই অলৌকিক কাণ্ড যে কাউকে দেখাতে পারব, এমন সম্ভাবনা কম।

তাছাড়া দিদিমাকে নিজের ছেলের সম্বন্ধে কি করে এসব কথা বলি।

তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আর একবার এরকম বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়লেই মামার বাড়ি থেকে পালাব। এখানে আদরযত্নের লোভে তো আর বেঘোরে প্রাণ দিতে পারি না।

বেশ কিছুদিন সব স্বাভাবিক। কোথাও কোন গোলমাল হল না। মেজমামা অবশ্য মাছের ব্যবসায় আর গেলেন না। বাড়িতেও বিশেষ থাকতেন না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতেন কে জানে।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, একটা কিছু করবার চেষ্টায় আছি। কতদিন আর চুপচাপ বসে থাকব।

তারপরই অঘটন ঘটল।

মাঝরাতে বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে দেখি, ছোটমামা রোয়াকের এককোণে দাঁড়িয়ে। একেবারে পাথরের মূর্তির মতন নিস্পন্দ, নিশ্চল।

আমি কাছে যেতেই আঙুল দিয়ে বাগানের দিকে দেখাল। যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।

একটা গাছের ডালে মেজমামা পা ঝুলিয়ে বসে। মেজমামা মানে মুখটা মেজমামার, কিন্তু দেহটা বিরাট। মাথাটা প্রায় গাছের মগডালে ঠেকেছে। পা দুটো মাটির অল্প ওপরে।

কি খেয়ে খেয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছেন। একটা ছিটকে এসে রোয়াকের ওপর পড়তে নিচু হয়ে দেখেই চমকে উঠলাম। রক্তমাখা হাড়ের টুকরো।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। মনে হল এখনিই বুঝি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ব।

ছোটমামা আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছিল।

তারপর দিন পনের কি হয়েছে আমি জানি না। দারুণ জ্বরে আমি প্রায় বেহুঁশ।

দিদিমা চেয়েছিলেন আমার বাবাকে খবব দিতে, কিন্তু ছোটমামা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিরস্ত করেছিল। ছোটমামা বলেছিল, শুধু ভয় পেয়ে আমার এই জ্বর। ডাক্তারেরও তাই মত। এর মধ্যে বাবাকে টেনে নিয়ে এলে আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বাবা বিশ্বাস করবেন, এটা আশা করা যায় না।

অথচ তার পরের দিন সকালে দিদিমার পোষা ছাগলটা নিখোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে বাগানের মধ্যে তার ছিন্নমুণ্ডটা পাওয়া গিয়েছিল। চারদিকে রক্তমাখা যে সব হাড়ের টুকরো পাওয়া গেল সেগুলো যে ছাগলেরই হাড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এমন কথা কে বিশ্বাস করবে? বিশেষ করে শহরের লোক।

মেজমামা নাকি আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে চুপচাপ বসে থাকতেন ঘরের মধ্যে। হাজাব ডাকে সাড়া দিতেন না। খেতে ডাকলে রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিতেন, খিদে নেই। শরীর খারাপ।

দিদিমা যে মেজমামাকে এত ভালবাসতেন, সেই দিদিমা ছোটমামার কাছে সব শুনে মেজমামার ধারে কাছে ঘেঁষতে চাইলেন না।

আমি যখন সেরে উঠলাম, তখন ব্যাপাবটা অনেক দূর এগিয়েছে।

শোবার ব্যবস্থা পালটে গেছে। একঘরে আমরা তিনজন শুতাম। একপাশে দিদিমা, অন্যপাশে ছোটমামা মাঝখানে আমি। সারারাত ঘরে আলো জ্বলত।

ছোটমামা দরজায় ভিতর থেকে ডবল তালা লাগিয়ে দিত। আমরা সবাই জানতাম অলৌকিক শক্তির পক্ষে এ তালা কোন বাধাই নয়, কিন্তু তবু বারণ করতে পারিনি।

ছোটমামা আর আমি ওই দৃশ্য দেখার পর, আমি আগে যা দেখেছি সব দিদিমা আর ছোটমামাকে বলেছি।

ছোটমামা বলল, কথাটা আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, তাহলে আরও আগে ব্যবস্থা নিতে পারতাম।

কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাও ছোটমামা বলল।

বদনপুর এখান থেকে আড়াই মাইল। সেখানকার ভৈরব রোজা খুবই বিখ্যাত। তার খড়মের আওয়াজে ভূতপ্রেত থরথর করে কাঁপে।

তাকে পাওয়া একটু মুশকিল। লোকের ডাকে প্রায়ই ভিনগাঁয়ে চলে যায় আর দক্ষিণাও এক মুঠো টাকা।

দিদিমাকে ছোটমামা অনেক কষ্টে রাজী করাল। দিদিমা সব বুঝেও একটু ইতস্তত করলেন। হাজার হোক ছেলে তো।

ছোটমামা বোঝাল, বেশ তো, ভৈরব রোজা এলেই সব বোঝা যাবে।

খুব ভোরে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। বদনপুরের ভৈরবকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে অন্য গাঁ থেকে তাকে ধরে আনতে হবে।

ছোটমামা যখন বের হয় তখন মেজমামা বাড়ি ছিলেন না। আধঘণ্টা পরে কোথা থেকে ফিরে এলেন।

চেহারা দেখে মনে হল অনেক দূর থেকে যেন ছুটতে ছুটতে আসছেন, হাঁটু পর্যন্ত কাদা। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ফতুয়াটা গাছের ডালে লেগে ছিঁড়ে গেছে।

দিদিমা রোয়াকে বসে তরকারি কুটছিলেন, আমি পাশে বসেছিলাম।

মেজমামা সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের দু পাশে ফেনা। লাল চোখ পাকিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছোনে কোথায় গেছে?

ছোনে ছোটমামার ডাকনাম।

আমার বুকের দুপদাপ শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ভয় হল অবশ হয়ে বঁটির ওপর না পড়ে যাই।

দিদিমা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, নিজের কি একটা দরকারে গেছে।

নিজের দরকার না ছাই। মেজমামা দাঁত কিড়মিড় করে উত্তর দিলেন, ভাই তো নয়, শত্তুর—শত্তুর! আচ্ছা, ঠিক আছে।

কথাগুলো বলেই মেজমামা জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, দুটো হাত পিছনে, কেবল মাথা নাড়ছেন, থুতু ফেলছেন আর ঘুরছেন।

ব্যাপার দেখে দিদিমা আর সাহস পেলেন না। আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিলেন।

দিদিমার দিকে চেয়ে দেখি তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনের কষ্টটা বুঝতে পারলাম।

যতক্ষণ মেজমামা বাড়ির চারদিকে ঘুরতে লাগলেন, ততক্ষণ আমি আর দিদিমা ঘরের এককোণে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেজমামাকে আর দেখা গেল না। দিদিমা উঠে জানলা দিয়ে দেখে যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে মেজমামা ধারে কাছে কোথাও নেই, তখন আমাকে খেতে দিলেন।

নিজে কিছু খেলেন না। ছোটমামা এলে এক সঙ্গে খাবেন।

আমি খাব কি! তখনও শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, কোন রকমে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাড়ি রওনা হব। এখানে এভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে শীঘ্রই শক্ত অসুখে পড়ে যাব।

ছোটমামা ফিরল বেলা আড়াইটে নাগাদ। সাইকেল রিকশায়। সঙ্গে ভৈরব রোজা।

আমি জানলা দিয়ে দেখতে লাগলাম।

ভৈরবের পরনে লাল টকটকে কাপড়। গায়ে কোন জামা নেই। গলায় অনেকগুলো রুদ্রাক্ষের মালা। দু হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা।

লাল দুটি চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। ঝাঁকড়া পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়েছে।

ভৈরব নেমে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাতাসে কি যেন শুঁকল, তারপর ছোটমামার দিকে ফিরে বলল, কেউ গৃহবন্ধন করেছে।

ছোটমামা অবাক।

গৃহবন্ধন কি?

কেউ মন্ত্র পড়ে গৃহবন্ধন করে দেয়, তাতে এই গৃহের মধ্যে কোন কাজকর্ম করলে তা ফল দেয় না।

কে এ কাজ করবে?

যাকে তাড়াতে চাও সেই করবে।

কিন্তু তার পক্ষে তো কিছু জানা সম্ভব নয়।

ছোটমামার কথায় ভৈরব খুব জোরে হেসে উঠল।

প্রেতাত্মার পক্ষে সব কিছু জানতে পারাই সম্ভব। মানুষের চেয়ে তারা অনেক বেশি শক্তির অধিকারী হয়।

তাহলে উপায়?

উপায় আছে বইকি। তুমি আগে সাইকেল-রিকশাকে বিদায় কর।

ছোটমামা সাইকেল-রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ভৈরব পাশে রাখা ঝোলা থেকে একটা মাটির সরা বের করল। তার ওপর চারটে পাকা লঙ্কা, একমুঠো সর্ষে, কতকগুলো কুশের ডগা রাখল। তারপর রাস্তার ওপরই বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল।

মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই লঙ্কা, সর্ষে আর কুশের ডগা আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়তে লাগল।

পিছনে নিঃশ্বাসের শব্দ হতে ফিরে দেখলাম দিদিমা এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখে এখনও জল।

আধ ঘণ্টা পরে ভৈরব উঠে দাঁড়াল।

ঠিক আছে। এবার বাড়ির মধ্যে চল।

ভৈরবের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যেই রাস্তার ওপর গাঁয়ের কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। ভৈরবের পিছন পিছন তারা বাড়ির মধ্যে এসে ঢুকল।

উঠানে মাটি দিয়ে বেদী করা হল। তাতে কাঠ, শুকনো ডালপালা নিয়ে আগুন জ্বালানো হল। ভৈরব সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতে করতে মাঝে মাঝে কাঠি করে ঘি ছিটিয়ে দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে লাগল।

ততক্ষণে সাহস পেয়ে আমি রোয়াকে গিয়ে বসেছি। দিদিমা আমার পাশে। ছোটমামা ভৈরবের কাছে। তার ফাইফরমাশ খাটছে।

আধ ঘণ্টা কিছু হল না। সব নিস্তব্ধ। শুধু ভৈরবের রুক্ষ গলায় মন্ত্র পাঠের শব্দ শোনা গেল। হিং টিং ছট করে অদ্ভুত ভাষা।

আমি যখন ভাবতে শুরু করেছি যে সবটাই বুজরুকি, তখন হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঠিক অনেক দূর থেকে ঝড় এলে যেমন হয়।

পশ্চিম দিকের গাছপালাগুলো ভীষণভাবে দুলতে লাগল। গাছের ডালে বসা কাকের দল চিৎকার করে আকাশে পাক খেতে লাগল।

একটু পরেই গাছপালার পিছন থেকে মেজমামা এসে হাজির। দুটি চোখ বনবন করে ঘুরছে। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। মুখে একটা মুরগি। বেচারি মরণযন্ত্রণায় পাখা ঝটপট করছে। মেজমামার দু কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মেজমামার সেই মূর্তি দেখে আমি ভয়ে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরলাম। দেখলাম উত্তেজনায় দিদিমাও ঠকঠক করে কাঁপছেন।

মেজমামা এসে দাঁড়াতে ভৈরবেরও চেহারা বদলে গেল। সে আরো জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে লাগল। আগুনে মুঠো মুঠো কি ফেলল, তাতে আগুন আরো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

মেজমামা এগোতে পারলেন না। গাবগাছের তলা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিশ্রীভাবে ভৈরবকে গালাগাল দিতে লাগলেন। আধখাওয়া মুবগিটা ছুঁড়ে দিলেন তার দিকে। মুরগিটা এসে পড়ল আগুনের মধ্যে।

কে তুই? ভৈরব চেঁচিয়ে উঠল।

আমি দয়াল বাঁড়ুজ্জে। মেজমামা আবও জোরে চিৎকার করে বললেন।

না, তুই দয়াল ন'স। ঠিক করে বল, কে তুই?

দয়াল বাঁড়ুজ্জে মেজমামার নাম। ডাকনাম টোনা।

বলব না।

মেজমামার সে কি গর্জন। ঠোঁটের দুপাশে ফেনা এসে জমল।

বলবি না? আচ্ছা দেখি বলিস কি না।

ভৈরব পাশে পড়ে থাকা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে ঘটের ওপর মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মেজমামা আর্তনাদ করে উঠলেন। মনে হল ঝাঁটার প্রত্যেকটি ঘা যেন তাঁর দেহেই পড়ছে।

বলছি, বলছি, আর মারিস না।

মেজমামা গাছতলায় বসে পড়লেন।

বল। ভৈরব ঝাঁটা আছড়ানোব শব্দ করল।

আমি মহিন্দর ডোম।

ভৈরব দিদিমার দিকে চোখ ফেরাল, চেনেন মহিন্দর ডোমকে?

দিদিমা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আমি কখনও দেখিনি। বাবার কাছে শুনেছি মহিন্দর পুজোর সময় ঢাক বাজাত। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে গণ্ডগোল হওয়াতে তারা পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠি মেরে লোকটাকে শেষ করে দিয়েছে।

মেজমামা আর বলব না। মহিন্দরই বলি।

মহিন্দর চুপচাপ সব শুনল। দিদিমার কথা শেষ হতে বলল, মাঠাকরুণ ঠিক বলেছেন। শিবে আমার মাথায় লাঠি মেরেছিল। আমিও শোধ নিয়েছি। শিবের গুষ্টির ঘাড় মটকে পগারে ফেলে দিয়েছি। ওর বংশে বাতি দিতে আব কেউ নেই।

তুই দয়ালেব দেহে এলি কি করে?

সেদিন খুব ঝড়জলের সময় দয়াল সাইকেলে চেপে বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওটাই মোর আস্তানা। হঠাৎ মোটা একটা ডাল ভেঙে পড়ল দয়ালের মাথার ওপর। দয়াল খতম। তার সাইকেল চিড়েচ্যাপ্টা। আমি দেখলাম এমন সুযোগ আর পাব না। অমাবস্যায় বামুনের মড়া। অনেক বছর দেহহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লাম।

এ দেহ তোকে ছাড়তে হবে। ভৈরব বলল।

মাথা খারাপ। আমি ছাড়ব না।

তবে রে।

আবার ঘটের ওপর ঝাঁটার আছড়ানি।

মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে মহিন্দর যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

একটু পরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব।

কি করে বুঝব তুই গেছিস?

কি করতে হবে বল?

ভৈরব এদিক ওদিক দেখল। উঠোনের একপাশে মরচে ধরা একটা বরগা পড়েছিল। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে ভৈরব বলল, ওটা দাঁতে করে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা কথা।

বল।

গাঁ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

ঠিক আছে। কাসুন্দিপুরের শ্মশানে আস্তানা বাঁধব। এদিকে আর আসব না।

যা তবে।

লোহার ভারী বরগা, যেটা তুলতে অন্তত জন চারেক লোকের দরকার, সেটা মহিন্দর অবলীলাক্রমে দাঁতে করে তুলে নিল।

আবার সেই ঝড়ো হাওয়া। গাছপালার মধ্য দিয়ে বরগা নক্ষত্রবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে নজর পড়তে দেখলাম মেজমামার প্রাণহীন দেহটা গাবগাছতলায় পড়ে আছে। দেহ থেকে বিশ্রী পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

ভৈরব বলল, এখনই দেহটা সৎকারের ব্যবস্থা কর। অনেক দিনের বাসি মড়া।

দুম করে একটা শব্দ। দিদিমা অজ্ঞান হয়ে রোয়াকের ওপর ঢলে পড়লেন।

* * *

এসব অনেক দিনের কথা।

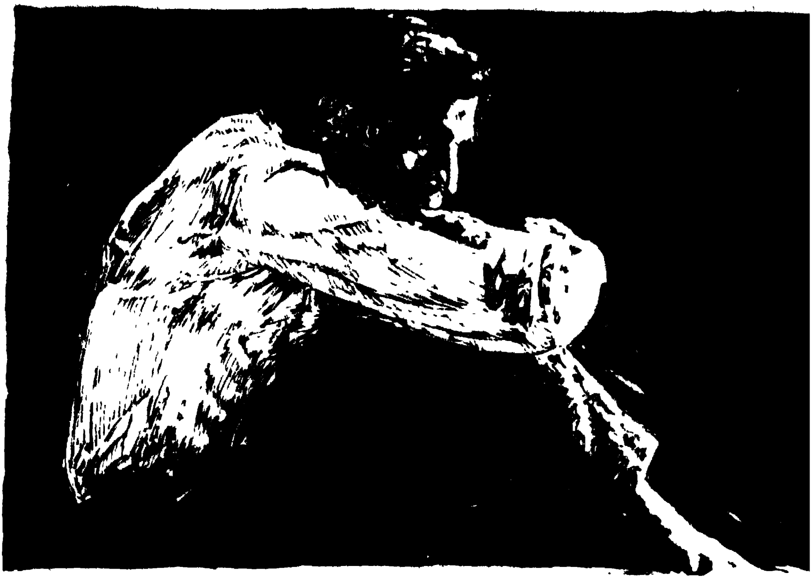
দিদিমা কবে মারা গেছেন। মামারাও কেউ বেঁচে নেই। মামাতো ভাইবোনেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, খবর রাখি না।

আমারও বেশ বয়স হয়েছে।

খুব ঝড়জল শুরু হলে সব ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যিই কি এসব অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছিল!

কিন্তু চোখের সামনে দেখা সব কিছু অস্বীকারই বা করি কি করে! ❑



"—সাথে সাথে ঘুরবে"

প্রমথনাথ বিশী

অল্পদিনের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যুতে আমাদের বাড়ীতে একটি অনৈসর্গিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

প্রথমে মারা গেল বাড়ীর একটি ছোট ছেলে, খেলা করিবার সময় ছাদ হইতে পড়িয়া। সেই ঘটনায় বালকের মাতা এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে, সে শয্যাগ্রহণ করিল। সেই শয্যা আর সে ছাড়িল না। মৃত্যু আসিয়া শোকাতুরার সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিল। এই দুটি মৃত্যুর মধ্যে দেড় মাস কালেরও ব্যবধান নয়। তৃতীয় মৃত্যুটি আরও আকস্মিক। তখন বর্ষাকাল। বিদ্যুতের তারে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছিল, কেহই জানিত না। বাড়ীর একটি বয়স্ক বালক সুইচ টিপিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। সেই ঘরটিতে অপর কেহ ছিল না, কেহ তাহাকে সাহায্য করিবার অবকাশও পাইল না। চতুর্থ বা শেষ মৃত্যুটি ঘটিল বাড়ীর একটি চাকরের। অনেকদিনের পুরানো চাকর, আমাদের পরিবারের স্বাঙ্গীভূতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় সুস্থ শরীরে সে শুইয়াছিল ভোরবেলায় দেখা গেল তাহার দেহ প্রাণহীন। ডাক্তার আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। আমরা বলিলাম, লোকটির তো হার্টফেল

বিয়া মরিবার বয়স হয় নাই। ডাক্তার বলিল, আর সবেরই বয়স আছে, মরিবার বয়স নাই। ভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া এমন আর কে বলিতে পারিত।

তিনচার মাসের মধ্যে এই চারিটি মৃত্যু বাড়ীতে ঘটিল। পবিবারের বালকবালিকা হইতে বয়স্কগণ অবধি সকলেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু শোক যতই তীব্র ও ব্যাপক হোক না কেন, সংসার তাহার প্রাত্যহিক দাবী ছাড়ে না। সেই দাবী মিটাইবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া শক্ত থাকিতে হইল। শোক করিবাব অবকাশ আমার ছিল না।

সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিতান্ত অভ্যাসের তাগিদেই আপনার চিহ্নিত পথে চলিতে লাগিল। সকাল হয়, চাকর বাজারে যায়, যথাসময়ে আহারের ডাক পড়ে, অফিসগামীরা অফিসে যায়।—এইভাবে সবই চলিতেছে, কিন্তু কাহারও মনে আনন্দ নাই, জীবনে উৎসাহ নাই, এমন কি সবাই যেন স্বল্পভাষী হইয়া পডিয়াছে। কেহ অপরের মুখেব দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে সাহস করে না, কি জানি দুই দৃষ্টির ঠোকাঠুকিতে সুপ্ত শোকের আগুন যদি জ্বলিয়া উঠে!

আরও একটা ভীষণতর সম্ভাবনা ছিল। এবার কার পালা?—এই আশঙ্কা প্রত্যেকের মনেই গুপ্ত ছিল। হঠাৎ যদি চোখে চোখে ঠেকিয়া প্রশ্নরূপে ঝলকিয়া ওঠে, তাই সকলে পরস্পরের চোখ এড়াইয়া চলিত। আর এতবড় বাড়ীটা কেমন যেন অদ্ভুতরকম নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। লোকে যে কথাবার্তা বলিত না, কিম্বা বিশেষ করিয়া ধীরপদেই চলিত এমন বলি না, কিন্তু কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ মনে হইত যেন অনেকটা দূর হইতে আসিতেছে, মনে হইত সিঁড়ির উপরে কে যেন অদৃশ্য গদি পাতিয়া রাখিয়াছে—নতুবা ওঠা-নামার শব্দ এত ক্ষীণ কেন?

এই সময় একদিন একজন পশ্চিমা চাকর নিযুক্ত হইল। হঠাৎ রাত্রিবেলা তাহার আর্তস্বর শুনিয়া সকলে নিচের তলায় ছুটিয়া গেলাম, কি ব্যাপার! দেখিলাম যে লোকটা জাগিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। "কি হয়েছে রে?" সে কেবল একটি কথা বলিল, "দেও!" এই বলিয়া সে জানালার বাহিরের বকুলগাছটাব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। দেখিলাম যে, বাহিরের দিকে অন্ধকারের মধ্যে বকুলগাছটা একটা বৃহৎ তোড়া-বাঁধা অন্ধকারের মতো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে দেও অর্থাৎ ভূতটূত কিছু নয়, হঠাৎ ওই গাছটা দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে চায় না। সে বলে, দেও একটা নয়, দুইটা। একটা লেড়কা, আর একটা আওরৎ জানলার দিকে মুখ করিয়া ওই গাছটার তলায় দাঁড়াইয়াছিল।

আমি বলিলাম—তাহারা দেও নয়, সত্যকার মানুষ।

সে মানিবে কেন? পাছে আরও কিছু বলিয়া ফেলে, তাই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তাহাকে উপরতলায় লইয়া গিয়া আমার ঘরের বারান্দায় শুইতে বলিলাম। ভোরবেলা উঠিয়া সে একটা লম্বা ধরনের সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বলিল যে, এ বাড়ীতে দেও আছে।

এই ঘটনায় সকলের মনে শোকের সহিত ভয়ের যোগ হইল। আমি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, বেটার পলাইবার ইচ্ছা ছিল, তাই ভূতের একটা অবতারণা করিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, কেহ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক অবধি করে না, করিলে আমার যুক্তির স্বপক্ষে দুচার কথা বলিবার অবকাশ পাইতাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে চুপ করিয়া থাকে। বেশ বুঝিতে পারি, সকলেই মনের ভিতরে শোক ও ভয়কে একশয্যায় সযত্নে লালন করিতেছে। আমি

বুঝিলাম, সকলের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হইবার মুখে, অতঃপর দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িবে। তখন আমি একদিন প্রস্তাব করিলাম যে, কিছুদিনের জন্য সকলে একবার শিমুলতলা ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। কেউ উৎসাহ প্রকাশ না করিলেও আপত্তি করিল না। শিমুলতলায় আমাদের একটি বাড়ী ছিল। কয়েকদিন পরে আমি সকলকে লইয়া গিয়া শিমুলতলায় রাখিয়া আসিলাম। কলিকাতার বাড়ীতে আমি একা থাকিলাম, আর থাকিল একটা নূতন চাকর। সে পূর্বেতিহাসের কিছুই জানিত না।

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি অসুখে পড়িলাম। অসুখ এমন কিছু নয়, প্রথমটা কিছুদিন সর্দিজ্বর না ইনফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া চালাইলাম। কিন্তু আট দশ দিন পরেও শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলে ডাক্তারকে কল দিলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোন বিশেষ রোগের লক্ষণ মিলিতেছে না, 'নার্ভাস শক' বলিয়া মনে হইতেছে। নার্ভাস শক ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, দেহের স্নায়ুপুঞ্জের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়াছে, তাই তাহারা সাময়িক বিকল হইবার দেখাইতেছে। তারপরে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই—কিছুদিন শুইয়া থাকুন, সারিয়া যাইবে। ডাক্তার বিদায় হইলে ভাবিলাম, ডাক্তারের কথা মিথ্যা নয়,—এ কয় মাস আমাকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। মৃত্যুশোকে আর সকলে যখন কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, আমার বিশ্রামের সময় ছিল না, এমন কি একটু নিরিবিলি বসিয়া একবার যে অশ্রুপাত করি সে অবসরটুকুও পাই নাই। বুঝিলাম যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তখন প্রকাশের সময় ছিল না, এখন অবসর পাইয়া স্নায়ুপুঞ্জ এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, কোন ঔষধের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ এ রোগের কোন ঔষধ নাই, শুইয়া থাকা একমাত্র চিকিৎসা। তাই শুইয়া থাকিলাম, অবশ্য উঠিবার শক্তি ছিল না—ইচ্ছাও বড়

সারাদিন একাকী শুইয়া থাকি, সারাদিন এবং সারারাত। চাকরটা নিয়মিত সময়ে আসিয়া খাদ্য ও পথ্য দিয়া যায়, অন্য সময়ে তাহার বড় দেখা পাই না, তবে পদশব্দে ও গার্হস্থ্য কাজের টুকটাক আওয়াজে বুঝিতে পারি যে, লোকটা নিচের তলাতেই আছে। আমাদের বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়, তিনতলা, চকমিলানো ধরনের সেকেলে বাড়ী। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি অনেকগুলি বাড়ীটিতে। এখন দু'তিনটি ছাড়া সব তালাবন্ধ, সকলে থাকিবার সময়েও সবগুলি খুলিবার প্রয়োজন হয় না।

দোতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে এক দিকে আমার শয্যা। শুইয়া থাকিলে বাহিরের পথে লোক-চলাচলের কতক চোখে পড়ে, রাত্রিবেলায় গ্যাসের আলো কতক ঘরে আসিয়া ঢোকে, আর বসন্ত ও বর্ষাকালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূর্বের জানালা দিয়া হু-হু করিয়া বাতাস করে। অনেকগুলি বালিশ মাথায় দিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া পড়িয়া থাকি। ক্লান্তি যতই বাড়ে একটি করিয়া বালিশ সরাইয়া ফেলি, শেষ একটি বালিশ যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন উপর গড়াইতে থাকি,—গড়াইতে গড়াইতে কখন ঘুমাইয়া পড়ি। এইভাবে রাত্রি কাটিয়া যায়। আর দিন? দিনের বেলায় জাগিয়া ভাবিয়া এবং লঘুধরনের বই পড়িতে চেষ্টা করিয়া কাটি, পথের আনাগোনা দেখি আর জানালা দিয়া বকুলগাছটার পাতায় আলোর চিকিমিকি দেখি, পাখিগুলোর কিচিমিচি শুনি। মাঝে মাঝে চাকরটা আসিয়া পথ্য খাদ্য ও ডাকের চিঠি দিয়া যা

সেদিনটার কথা কিম্বা আরও সঠিকভাবে বলা উচিত—সে রাতটার কথা, কখনও কি ভুলিতে পারিব! আজ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি বলিয়া সকল কথাই বলিতে পারিতেছি। সে দিনের অভিজ্ঞতাকে এখন অপরের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু কখনও ভাবি নাই 'তাহার' হাত হইতে মুক্তি পাইব। অনেকে আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়াছে, ওটা নার্ভাস শকের প্রতিক্রিয়া, আসলে কিছুই নয়!

নার্ভাস শক—ডাক্তার এই যে কথাটা বলিয়াছিল লোকে তাহার বেশী আর অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু আমি তো জানি, আমার অভিজ্ঞতায় 'তাহার' প্রভাব কতখানি সত্য—কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। লোকে যখন নার্ভাস শক বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে, আমি তর্ক করি না, চুপ করিয়া থাকি, কিম্বা বড় দুঃখে হাসি আর ভাবি—একজনের অভিজ্ঞতা অপর একজনকে বুঝানো কত কষ্ট।

সেই প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাকে 'তাহার' আবির্ভাবের সূত্রপাত বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই, আদ্যন্ত ইতিহাস মিলাইয়া লইয়া আজ বুঝিতেছি এবং তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার পরেও শিহরিয়া উঠিতেছি, ভাবিতেছি,—মৃত্যুর কত নিকটেই না গিয়া পড়িয়াছিলাম।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া জানালার দিকে নজর পড়িবামাত্র বুকের রক্ত একবারের জন্য ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিয়া যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গেল। দেখিলাম জানালার ঠিক বাহিরেই অতিকায় একটি মস্তক। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু চোখে হাত দিয়া বুঝিলাম চোখের পাতা খোলা। গায়ে চিমটি কাটিয়া দেখিলাম —লাগিতেছে। সন্দেহমাত্র আর রহিল না যে আমি জাগ্রত। ভয়ে চীৎকার কবিতে চেষ্টা করিলাম—স্বর বাহির হইল না। ঘরের আলো জ্বালিবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু উঠিতে পারিলাম না—এ যেন অপরের শরীর। কালো প্রকাণ্ড মস্তক!! নাক-চোখ-মুখগুলো দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু মস্তক যে তাহাতে সন্দেহ নাই। ওদিকে চাহিয়া থাকা কঠিন, না থাকা আরও কঠিন। সেই শীতের রাত্রে কপালে ঘাম গড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যখন বন্ধ হইবার মুখে—ঠিক সেই সময়ে একখানা মোটরগাড়ী পথ দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাতি হইতে এক ঝলক আলো মুণ্ডটার উপরে পড়িল। মুণ্ড কোথায়? সেই ঝাঁকড়া বকুলগাছটা যে! আবার বুকের রক্ত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত হইল। মনে মনে হাসিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তখনই মনে পড়িল যে, এ কেমন ভ্রান্তি! যে বকুলগাছটাকে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর দেখিতেছি, তাহাকে কেন হঠাৎ অতিকায় মস্তক মনে হইল? তখনই আবার ডাক্তারের কথা মনে পড়িল,—নার্ভাস শক। পুস্তকে পড়িয়াছি বটে যে, নার্ভাস শকের ফলে কত সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যাই হোক গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, জল খাইবার জন্য উঠিলাম। টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। জল খাইল কে? আমিই কি আগে আর একবার উঠিয়া জল পান করিয়াছি? কই, মনে তো পড়ে না! চাকরটার উপরে রাগ হইল, ব্যাটা ফাঁকি দিতে শুরু করিয়াছে। জল পান আর হইল না, ঘরে আর জল ছিল না। শুইয়া পড়িলাম এবং ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

আমার অভিজ্ঞতা শুনিয়া অনেকে শুধাইয়াছে—কিছু দেখিয়াছ কি? স্বীকার করিতে হয় যে, কিছু বা কাহাকেও দেখি নাই। লোকে হাসে, তাহাদের নার্ভাস শকের থিওরিটা আরও পাকা

হয়। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি, কিছু না দেখার চেয়ে কিছু দেখা অনেক ভালো। শরীরীর সহিত বোঝাপড়া চলে—কিন্তু অশরীরীর সহিত তেমন হইবার নয় বলিয়াই তাহা ভয়ঙ্কর। এখান হইতে আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় শত্রুকে 'অশরীরী' বলিয়া উল্লেখ করিব।

পরদিন রাত্রে আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি দেড়টা। তখনই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, সেই কালো মাথাটা নাই তো? আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম বকুলগাছটার পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। স্বস্তি বোধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভীরুতার প্রতি একপ্রকার ধিক্কার বোধ হইল। তৃষ্ণা পাইয়াছিল—জল পান করিবার জন্য উঠিলাম, গেলাসের ঢাকনা তুলিয়া দেখিলাম গেলাস শূন্য। কাল বকুলগাছটাকে কালো মাথা কল্পনা করিবার ফলে মনে হইয়াছিল যে, অশরীরী জল পান করিয়া গিয়াছে। আজ ভয়ের সেই পরিপ্রেক্ষিত ছিল না, মনে হইল চাকরটাই ফাঁকি দিয়াছে। শাসন করিয়া দিবার অজুহাতে (আসল কথা নিজের ভয়টাকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করিবার আশায়) অত রাত্রেই ডাকাডাকি করিয়া চাকরটাকে জাগাইলাম। সে আসিয়া শপথ করিয়া বলিল যে, গেলাসে জল দিয়া একটা পিরিচ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি যখন জল খাইতে যাই, তখন সেই গেলাস পিরিচে ঢাকাই ছিল বটে। আমার ভুল হইয়াছে স্বীকার করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। বিছানায় আসিয়া শুইলাম, কিন্তু চিন্তা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। জল খাইল কে! আমিই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া জল পান করিয়াছি,—এমন অসম্ভব না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব মনে হইল না। ঘুমাইয়া পড়িবার আগে সঙ্কল্প করিলাম,—কাল হইতে ঘুমাইবার আগে প্রচুর জল পান করিয়া লইব, যাহাতে মাঝরাতে জাগিয়া উঠিয়া এরূপ অদ্ভুত সমস্যায় না পড়িতে হয়।

দিনের বেলা আর-পাঁচটা চিন্তায় এসব বিষয় মনে পড়িত না। কিম্বা মনে পড়িলেও হাস্যকরভাবে তুচ্ছ বোধ হইত। সেদিন শুইবার আগে প্রচুর জল খাইয়া লইলাম। রাতে আর জাগিতে হইল না। ভোরবেলা চাকরে চা আনিল। আগের দিন তাড়া খাইয়াছিল—আজ ঘরে ঢুকিয়াই গেলাসটার দিকে তাকাইল, আমিও তাকাইলাম—গেলাস খালি। যে পিরিচখানা দিয়া সে জল ঢাকিত, সেখানা পাশে পড়িয়া আছে, গেলাস একখানা বই দিয়া ঢাকা। বইখানা দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম—Poe-র Mystery and Imagination-এর গল্প। চমকিয়া উঠিলাম—এই বই তো নীচের লাইব্রেরি ঘরে ছিল—এখানে আনিল কে? আর গেলাসই বা খালি করিল কে? চাকরকে আর কি বলিব, নিজের চিন্তাসূত্রে কেবল নিজেই জড়িত হইতে লাগিলাম।

ক্রমে আমার প্রত্যয় জন্মিল যে, রাতের বেলায় কেহ আমার ঘরে ঢোকে। প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতাম,—এমন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি স্বহস্তে ঘরের দরজা বন্ধ করি এবং ভোরবেলা উঠিয়া স্বহস্তে বন্ধ দরজা খুলি। কিন্তু এসব বিষয় বুঝিবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। আমার একটি পিস্তল ছিল, বাক্সের মধ্যে থাকিত, এতদিন পরে সেটা বাহির করিয়া বালিশের তলায় রাখিলাম।

একবার মনে হইত নির্জন বাড়ীর নিঃসঙ্গতা পরিহার করিয়া লোকজনের সঙ্গে মিশিলে হয়তো অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু শরীর এত দুর্বল যে, অন্যত্র যাইবার শক্তি ছিল না। তাছাড়া আমি মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলাম না বলিয়া আমার বন্ধুবান্ধবের

সংখ্যা স্বল্প। যে কয়েকজন আছে, সবাই কাজের লোক, কে আসিয়া সারাদিন আমার সঙ্গে গল্প করিবে? কাজেই সারাদিন একাকী থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্রমে অশরীরীর প্রভাব দিনের বেলাতেও অনুভব করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে হইত পাশের ঘরে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে কিম্বা খুব মৃদু পদসঞ্চারে চলাফেরা কবিতেছে। নিশ্চয় জানিতাম কেহ নাই, তবু একবার দেখিয়া আসিতাম। রেলের এঞ্জিন বাষ্প ছাড়িলে যেমন একপ্রকার ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, কানের ভিতর সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইতাম। আরও একটা ব্যাপার। মনে হইল সহসা আমার শ্রবণশক্তি যেন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। স্বরগ্রামের মাঝখানের অংশটুকুই সাধারণ কর্ণ ধরিতে পারে, খুব নীচু বা খুব উঁচুর দিকে শুনিতে পায় না। আমার শ্রবণশক্তির সীমানা যেন অনন্তবিস্তৃত হইয়াছে। আমি যেন কলিকাতার বাড়ীটিতে বসিয়াই পাড়ার দূরবর্তী বাড়ীগুলিতে কে কি বলিতেছে তাহারও অনেক কথা শুনিতাম। একদিন শিমুলতলার পত্র পাইলাম। তাহারা লিখিয়াছে যে, সকলে একদিন ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়া খিচুড়ি বাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে। উত্তরে লিখিলাম যে, এ আমার অগোচর নয়। আরও লিখিলাম যে, ডাকবাংলার হাতার মধ্যে একটা গাছের ওপরে ঘুঘু ডাকিতেছিল, তোমরা শুনিয়াছিলে কি? সকলে আমার উত্তরকে কবিত্ব মনে করিয়া লিখিল, ঘুঘুর ডাক যদি স্বকর্ণে শুনিতে চাও, তবে এখানে চলিয়া এসো না কেন!

ঘুঘুর ডাক শুনিবার জন্য নয়, সে তো কলিকাতায় বসিয়াই আমি শুনিতে পারি, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গিয়া পড়িলে অশরীরীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, এই আশায় চাকরের উপর বাড়ীর জিম্মা রাখিয়া আমি শিমুলতলায় রওনা হইয়া গেলাম। সকলে আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—এ কী, দুই মাসে যে ছয় মাসের রোগী বনিয়া গিয়াছ,—ব্যাপার কী?

কেহ বলিল,—শরীর অর্ধেক হইয়াছে।

কেহ বলিল,—মুখ ফ্যাকাসে হইয়াছে।

কেহ বলিল,—কতকাল চুল কাটো নাই?

কেহ বা বলিল,—কেবল চোখ দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

সকলে সমস্বরে বলিল,—এখানে কিছুদিন থাকো, সব সারিয়া যাইবে।

শিমুলতলায় একটা পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় বসিলে মনে হয়, থিয়েটারের গ্যালারির উচ্চতম সীটে উপবিষ্ট।—সম্মুখে পাহাড় গড়াইয়া নামিয়াছে, গায়ে গায়ে ছোটবড় বাড়ী, বাগান, বাগানে শীতের মরসুমী ফুল। নিম্নে উপত্যকা, ধানের মাঠ, তখন ধানকাটা হইয়া গিয়াছে। এক দিকে শীর্ণ নদী। এখানে ওখানে দেহাতি লোকের ছোট ছোট গ্রাম। উপত্যকার শেষে বন, বনের মাথার উপর দিয়া দিগন্ত ঘেরিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়—মাথায় শাল ও বাঁশের ঘন বন। সারাদিন বসিয়া থিয়েটারের দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখিতাম। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্তিমান চঞ্চলতার মতো রেলগাড়ী মাঝে মাঝে বেগে চলিয়া যাইত—গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতাম। এখানে আসিয়া আর একটি আবিষ্কার করিলাম। একদিন সকালে আমরা তিনজনে দূরপাল্লার ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। অনেক দূর গিয়া চায়ের তৃষ্ণা পাইল। একটা থলিতে স্টোভ চা চিনি কেটলি প্রভৃতি ছিল। কেবল দুধের অভাব। মাঠের মধ্যে

দুধ পাইবার আশা নাই দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে যাইতেছি, আমি বলিয়া উঠিলাম,—ওই দেখো, দূরে মাঠের মধ্যে গোটাকয়েক গরু ও রাখাল দেখা যাইতেছে—ওখানে গেলে দুধ মিলিতে পারে।

সকলে ভালো করিয়া দেখিল,—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না।

আমি বললাম,—তোমরা কেন দেখিতে পাইতেছ না? ওই তো স্পষ্ট!

তাহারা বলিল,—চায়ের তৃষ্ণায় মরিতেছি, এখন ঠাট্টা ভালো লাগে না।

আর একজন বলিল,—লোকে মাঠের মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকা দেখে, তুমি যে গো-তৃষ্ণিকা দেখিতে লাগিলে!

তৃতীয়জন বলিল,—তুমি কি চোখে দূরবীন লাগাইয়াছ নাকি?

আমি বলিলাম,—অবিশ্বাসে কাজ কি! আমাদের তো যাইতেই হইবে—চলো ওই দিকেই যাই না!

সকলে নির্দিষ্ট দিকে চলিলাম। প্রায় এক ক্রোশ পথ চলিবার পরে সত্যই সকলে সেই গরুর পাল দেখিতে পাইল।

আমার সঙ্গীদেব একজন বলিল,—আশ্চর্য, তুমি একক্রোশ দূর হইতে দেখিলে কিরূপে? তাই তোমার চোখ এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল!

আর একজন বলিল,—আন্দাজে ঢিল লাগিয়াছে। মাঠে গরু চরিবে এ আর বিচিত্র কি!

আর একজন বলিল,—এমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি কিন্তু ভালো লক্ষণ নয়।

সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করিলাম যে, শ্রবণশক্তির মতো আমার দৃষ্টির সীমাও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এখানে আসিয়া অশরীরীর প্রভাব সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলি নাই।

বলিব আর কি, বলিবার আছেই বা কি, আর বলিলেই বা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? ভাবিতাম, অশরীরী এমন করিয়া আমাব কান ও চোখেব সীমানা বাড়াইয়া দিতেছে কেন? অশীরীর প্রভাবের সহিত যে এই শক্তিবৃদ্ধি জড়িত সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না।

এখানে কাহারও কোন কাজকর্ম ছিল না। বাড়ীর টানা বারান্দায় বসিয়া সকলে তাসপাশা খেলিত ও হল্লা করিত। আমি তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া পাহাড়ের উপরে একটি ছাল ওঠা অর্জুন গাছের তলায় গিয়া বসিতাম। এখানে বসিলে দিগন্তের পাহাড়ের অর্ধচন্দ্র ও অরণ্যরেখা দেখিতে পাইতাম। উপত্যকার সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতাম। বনের সমস্ত গাছপালাগুলো স্পষ্ট দেখিতে পাই কিনা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। বনটার দিকে ভালো করিয়া তাকাইলাম। কি আশ্চর্য, আমার চোখে বন আর গাছপালার ঘনীভূত সমষ্টি নয়! প্রত্যেকটি গাছ, তাহার শাখাপ্রশাখা পত্রপল্লব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে যেন দেখিতে পাইতেছি। নিজের শক্তিতে নিজেই ভীত হইলাম। যেন চোখ দুটি ও কান দুটি কোন এক যাদুকরের—আমি হতবুদ্ধি দর্শক মাত্র।

রাতের বেলার উপসর্গ আরও বিচিত্র। বুঝিলাম অশরীরী ক্রমেই আমার বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে, অবশেষে শেষ গ্রাসে দেহটাকে হয়তো আত্মসাৎ করিয়া বায়ুরূপে বায়ুতে মিলিয়া যাইবে। রাতের বেলাতেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাসপাশা ও গানবাজনা চলিত বলিয়া স্বতন্ত্র একটি ঘরে আমার শুইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে ঘরে আর কেহ থাকিত না।

এই ঘরটির একটি দেয়ালে বিহারের পূর্বতন এক ইংরেজ গভর্নরের একখানি ছবি টাঙানো ছিল। এক সময়ে সখ করিয়া টাঙানো হইয়াছিল, এখন খুলিয়া ফেলিলেও চলিত, কিন্তু নিতান্ত অবহেলাতেই খোলা হয় নাই। আমার ইচ্ছা হইল, ছবিখানি খুলিয়া ফেলি, কিন্তু ততখানি উদ্যম হইল না। একবার ভাবিলাম, খুলিয়া না ফেলিয়া ঘুরাইয়া দিই। গভর্নর বিমুখ হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক, তাহাও হইয়া উঠিল না। রাত্রে ঘুমাইলাম কোন বিঘ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভোরবেলা উঠিয়া ছবিখানার দিকে চাহিতেই দেখিলাম, সেখানা ঘুরানো অবস্থায় আছে। চমকিয়া উঠিলাম, এ কাজ করিল কে? আমার মনের বাসনা জানিল কে? ঘরেই বা ঢুকিল কে? ঘরের দরজা তো এখনো বন্ধ! আমিই স্বপ্নে উঠিয়া এ কাজ করিয়াছি? বিশ্বাস হইল না। প্রত্যয় হইল যে, এ সেই অশরীরীর কাজ। ছবিখানা সোজা করিয়া দিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা কাহাকেও প্রাব বলিলাম না। বলিলেও কেহ বিশ্বাস করিত না, ভাবিত—আমি একপ্রকার নূতন ধাপ্পা দিতেছি। আমি সারাদিন আর সকলের হইতে দূরে সেই অর্জুন গাছটার তলায় বসিয়া কাটাইতাম। মন্দ লাগিত না,—মানুষের সঙ্গ আমার বিষাক্ত লাগিত।

এই সময়ে আর একটি নূতন ভাব আমাকে পাইয়া বসিল। আমার মরিতে ইচ্ছা করিত, জীবনের আসক্তি আমাকে একেবারে ত্যাগ করিল। আমার কেবলই মনে হইত, এই যে আমার চক্ষুকর্ণের শক্তির বৃদ্ধি, মৃত্যুর পরে মানুষ যে অসীম শক্তি পাইতে পারে, এ কেবল তাহারই পূর্বাভাস। ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটার কথা মনে পড়িয়া যাইত, সেটাকে হাতছাড়া করি নাই, সঙ্গে আনিয়াছি। আরও একটা কারণে মরিতে ইচ্ছা করিত। মনে হইত—একমাত্র এই উপায়েই অশরীরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, মনে হইত—নিজেও অশরীরী হইয়া একবার শত্রুটার সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া না লই কেন!

রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে কাহার পদশব্দে ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বিদ্যুতের টর্চবাতি টিপিতাম, কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িত, দেয়ালের ছবিখানাকে কে যেন ঘুরাইয়া রাখিয়াছে।

এমনি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। একদিন অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে বাড়ীর সকলের সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, দোষটা সম্পূর্ণই আমার। আমি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে চুনার রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে স্পষ্ট বুঝিলাম অশরীরী আমার সঙ্গ ছাড়ে নাই, সেই গাড়ীতেই সে উঠিল।

কামরাটিতে আর একজন মাত্র ছিল। একটি বার্থে তাহার শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়? স্নানের ঘরে আলো দেখিয়া বুঝিলাম আমার সহযাত্রী সেখানে। আমি একাকী আমার বার্থে বসিয়া রহিলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম আসাতে শুইয়া পড়িলাম। যখন নিদ্রা ভাঙিল মোকামা জংসন ছাড়াইয়াছি। পাশের বেঞ্চিতে সহযাত্রীর শয্যা দেখিতে পাইলাম, কিন্তু লোকটি কোথায়! ভাবিলাম এখনো কি স্নানের ঘরেই আছে? তাহাই সম্ভব—আলো জ্বলিতেছে। ভাবিলাম লোকটা দীর্ঘকাল সেখানে কি করিতেছে? দরজায় কান পাতিয়া শুনিলাম যে, ভিতরে কে যেন গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছে,—আর দরজায় ঘষা কাঁচের উপরে একটা অস্পষ্ট ছায়ার মতোও দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম মানুষ ভিতরে আছে এবং সে আমার সহযাত্রী ছাড়া আর কেহ নয়। কিন্তু লোকটা এতক্ষণ ধরিয়া কি করিতেছে? কৌতূহল বাড়িল। দরজায় টোকা মারিলাম, ভিতরে কে—বলিয়া চীৎকার করিলাম, কিন্তু ভিতর হইতে

কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া দরজায় ধাক্কা দিতে সুরু করিলাম। দরজার ভিতরদিকের ছিটকিনি খট্ করিয়া খুলিয়া গেল, কিন্তু দরজা খুলিল না। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে প্রাণপণবলে দরজা ঠেলিয়া আছে। দরজা খুলিয়া কোন লোককে বিব্রত করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। একবার সাড়া দিলেই আমি নিরস্ত হইতাম। কিন্তু সাড়া না পাওয়াতে এবং দরজার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার রোখ চড়িয়া গেল। আমি দরজা ঠেলিতে লাগিলাম. অবশেষে সেই উদ্যমে কপালে ঘাম দেখা দিল।

এমন সময়ে ছোট একটা স্টেশনে গাড়ী থামিল। একজন যাত্রী উঠিল। সে আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল, কি, খুলতে পারছেন না?

এই বলিয়া সে দরজায় হাত দিতেই অনায়াসে খুলিয়া গেল। ভিতরে না আছে লোক, না আছে আলো। আমি বিদ্যুতের টর্চ লইয়া ভিতরে ঢুকিলাম, কোন লোক যে আজ সারাদিনের মধ্যে ঢুকিয়াছিল তাহার চিহ্ন অবধি নাই। তখনই মনে হইল, একি সেই অশরীরীর কাণ্ড? ওই শয্যার-মালিক কি সেই অশরীরী? আমি ফিরিয়া আসিয়া ভদ্রলোকটির সঙ্গে গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিলাম, কিন্তু বুকের ভিতরের কাঁপুনি কিছুতেই থামিল না। চুনারে নামিবার সময় অবধি বিছানার মালিকের দেখা পাইলাম না।

চুনারে পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। স্টেশনে নামিয়া একজন ওই-দেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিয়া লইলাম। তাহার কাছে সন্ধান লইয়া একখানা এক্কা গাড়ীতে চড়িয়া গঙ্গার ধারে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একজন কেয়ারটেকার দারোয়ান ছিল। তাহাকে শুধাইলাম, এ বাড়ীতে থাকিতে পারা যাইবে কিনা এবং কিরূপ ভাড়া লাগিবে!

দারোয়ানজী বলিল,—আপনার যতদিন খুশি থাকুন, খুশি হইয়া যাহা দিবেন তাহাই যথেষ্ট।

আহারের ব্যবস্থার কি করা যাইবে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—'বর্তন-উর্তন' তাহার কাছেই পাওয়া যাইবে, আর রসুই করিবার জন্য একটা লোকও সে ঠিক করিয়া দিতে পারে। 'লেকিন মছলি উছলি' চলিবে না। আমি ধন্যবাদ দিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম এবং জানাইয়া দিলাম যে মছলি খাইবার ইচ্ছা আমার নাই। তখন দারোয়ানজী সোৎসাহে তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে লাগিয়া গেল।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন, আগেই বলিয়াছি। আধুনিক কৃপণ কল্পনার যুগে এত বড় অনাবশ্যকের আকাশ-ভরা বাড়ী কেহ তৈয়ারী করে না। বাড়ীর ঠিক সম্মুখেই গঙ্গা। এখন বসন্তকালে বাড়ীর কাছে অনেকটা চর পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া নদীর বিস্তৃতি অল্প নয়। গঙ্গার উপরেই প্রশস্ত টানা বারান্দা। আমার ব্যবহারের জন্য দুটি ঘর পাইলাম, একটি বসিবার অপরটি শুইবার। ঘরে পুরু গদিওয়ালা খানকতক চেয়ার ও টেবিল। আর শয়নঘরে একখানা মস্ত পালঙ্ক, পাশে একটা চেয়ার, টেবিল, আলনা। আর আছে ঘরের দেয়ালে মানুষপ্রমাণ পিতলের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা আয়না।

আহার শেষ করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। রাত্রে অল্প কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেকদিন পরে এই আমার বিঘ্নহীন

সুনিদ্রা হইল। ভোরবেলা উঠিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলাম, ভাবিলাম—তবে বোধ হয় অশরীরীর হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম! আজ তিনচার মাসের মধ্যে নির্বিঘ্ন নিদ্রার আরাম আমি পাই নাই, শরীর ভাঙিয়া পড়িবার মতো, মৃত্যু-ইচ্ছার সেটাও একটা কারণ। যেটুকু ঘুম হইত, তাহা যেন ওই অশরীরীর নেপথ্য বিধানের সুবিধার জন্যই হইত। নিদ্রার অবসরে হয় গেলাসের জল ফুরাইত, নয় ছবিখানি ঘুরিয়া যাইত। ঘুম এবং ঘুম না হওয়া দুই-ই আমার পক্ষে সমান আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গতরাত্রের নিশ্চিন্ত ঘুমে তাই প্রফুল্ল বোধ করিলাম।

ভিখু নামে এক ছোকরা ভৃত্যকে দারোয়ানজী ঠিক করিয়া দিয়াছিল। সে কাজকর্ম সব জানে। চা জলখাবার ডালভাত তরকারী রুটি পুরি যাহা প্রয়োজন সমস্ত সময়মতো করিয়া আনিত। ঘর ঝাড়ু দিত, বিছানা পাতিয়া দিত। কোন বিষয়ে আমার ভাবিবার আবশ্যক ছিল না। আমি সারাদিন বসিয়া গড়াইয়া বেড়াইয়া কাটাইয়া দিতাম।

চুনার প্রবাসের দ্বিতীয় দিন বিকালে আমি গঙ্গার তীর বরাবর বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক দূর গিয়া প্রাচীন বয়সের ঝাউগাছে ঘেরা একটি সমাধিস্থল দেখিতে পাইলাম। অনেকগুলি মুসলমানের কবর। কবরগুলি এখনো সুরক্ষিত। পাশেই ছোট একখানা খাপরার ঘরে একজন মুসলমান বাস করে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এই কবরগুলি রক্ষা ও মেরামত করিবার জন্য একটি জায়গীর আছে—সে তার মালিক বা জিম্মাদার। তাহার মুখেই শুনিলাম যে, বহুকাল আগে এখানে হুমায়ুন বাদশার সঙ্গে শেরশাহের জবর লড়াই হইয়াছিল। অনেক মোগল-পাঠান মরিয়াছিল। হুমায়ুন বাদশাহী লাভ করিবার পরে এখানকার কবরগুলির খবরদারির জন্য জায়গীর দান করেন। সেই জায়গীরের ধারা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইতিহাসে শেরশাহ ও হুমায়ুনের লড়াইয়ের কথা পড়িয়াছি বটে। আর ওই যে অদূরে গিরিচূড়ায় চুনার-গড় তাহাও সুবিদিত। গিরিচূড়াবলম্বী সেই গড়ের ছায়াতে চিরনিদ্রিত এই কবরগুলির উপরে প্রাচীনকাল যেন সযত্নে অঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। সমুখে গঙ্গা, পিছনে স্তম্ভিত চুনার-গড়—আর চারদিকে শ্মশানের ধূমের মতো ধূসর ঝাউ গাছ, ইতিহাসের দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাহাদের শাখায় শাখায় নিরন্তর শ্বসিত হইতেছে। স্থানটি আমার মনকে বড়ই টানিল, আমি সেখানে বসিলাম। কতক্ষণ এরকম বসিয়াছিলাম জানি না—যখন হুঁশ হইল, দেখিলাম গঙ্গার ওপারে তৃতীয়ার অস্তমান চন্দ্রকলা গাছের আড়াল দিয়া হুমায়ুনের গুপ্তচরের মতো এপারের পরিপ্রেক্ষিতকে লক্ষ্য করিতেছে। আমি উঠিয়া বাসার দিকে রওনা হইলাম। সমুদ্রের জোয়ারের গর্জনের মতো ওই ঝাউদের একটানা হু-হু শব্দ কান ভরিয়া লইয়া রওনা হইলাম।

পরদিন বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময়ে আমার নূতন জুতাজোড়া পাইলাম না, সন্দেহ হইল—এ ভিখুর কাজ। তাহাকে ডাকিলাম, শুনিলাম সে বাজারে গিয়াছে। অগত্যা আর একজোড়া জুতা পরিয়া বাহির হইলাম। সেই ঝাউ-ঘেরা গোরস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া এক জায়গায় বসিলাম। এমন সময়ে গোরস্থানের রক্ষক সেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। শুধাইলাম, খবর কি? সে বলিল,—বাবুজী, কাল অনেক রাত্রে দুই বাবু এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ বোধ হয় একজোড়া জুতা ফেলিয়া গিয়াছেন!

তারপরে নিবেদন করিল, আমি যেন খোঁজ করিয়া জুতাজোড়া মালিককে দিই। আমি তাহাকে জুতা আনিতে বলিলাম, লোকটা জুতা আনিলে আমি চমকিয়া উঠিলাম,—একি, এ যে আমার জুতা!

আমার বিস্ময় তাহার কাছে প্রকাশ না করিয়া বলিলাম,—কি রকম লোক, আর একবার বলো তো!

সে বলিল,—বাবুজী, আমি অন্ধকার রাত্রে খুব দূর হইতে দেখিয়াছি—কি রকম লোক কেমন করিয়া বলিব? তবে দুইজন লোক তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

তাহার কথায় আমার বিস্ময় বাড়িয়া ত্রাসে পরিণত হইল। আমি খোঁজ করিয়া মালিককে দিব জানাইয়া জুতাজোড়া একটা কাগজে মুড়িয়া লইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিয়া ভাবিলাম, এ কেমন হইল? আমিই কি রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম? স্বপ্নে বা নিশিতে পাইলে লোকে এমন বেড়াইয়া থাকে শুনিয়াছি।—তবে কি আমারও সেই রোগ হইল? কিন্তু সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? সেই অশরীরী নয় তো? তবে কি সেই অজ্ঞেয় সত্তা অশরীরী নয়? নতুবা কবররক্ষক তাহাকে দেখিল কিভাবে? অজ্ঞাতসারে ঘুমের ঘোরে আমি কি তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছি নাকি? এই কথা মনে হইবামাত্র সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে গা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—দেহের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হইয়া উঠিল। সঙ্কল্প হইল, আজ হইতে রাত্রে আর ঘুমাইলে চলিবে না। স্থির করিলাম দিনের বেলা ঘুমাইয়া লইয়া রাতটা জাগিয়া কাটাইব।

রাত্রিটা জাগিবার সঙ্কল্প করিলাম, হঠাৎ বোধ হয় একবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম,—দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। কে?—বলিয়া চীৎকার করিলাম। আর কোন সাড়া নাই। আবার জাগিবার চেষ্টা চলিল—বোধ করি একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—আবার দরজা নাড়ার শব্দ।

বুঝিলাম এ সেই অশরীরীর ক্রিয়া। বুঝিলাম অশরীরী আজও তাহার ভ্রমণসঙ্গীর সন্ধানে আসিয়াছে। কাজেই এবারে আর সাড়া দিলাম না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এমনিভাবে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাতটা কাটিয়া গেল।

তারপরে প্রতি রাত্রে এমনিধারা চলিতে লগিল। জাগরণে ও তন্দ্রায় আমার চোখে মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে—যেমনি একটু তন্দ্রা আসে, অমনি দরজা নাড়ার শব্দ, নতুবা বাহিরে পদধ্বনি শুনিতে পাই। একদিন হঠাৎ পিঠের উপর কাহার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। ঘর নির্জন, কেহ কোথাও নাই!

কয়েকদিন এমনি চলিলে আমার শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল। ভাবিলাম এরকম চলিতে থাকিলে এই বিদেশেই মরিতে হইবে। আমার কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল, এযাত্রা আমাকে মরিতেই হইবে।—ভাবিলাম, মরিতেই হয় তো কলিকাতা ফিরিয়া মরিব—বিদেশে বিভুঁয়ে মরিব কেন? এতক্ষণ বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এবারে কি একটা কাজে ঘরে ঢুকিতেই মনে হইল—আয়নার মধ্যে যেন কাহার ছায়া! আবার তাকাইলাম—শূন্য আয়না ঝক্ঝক্ করিতেছে, ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই।

একবার মনে হইল আমার ছায়া—পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার ছায়া হইতেই পারে না, কারণ আমি যেখানে দাঁড়াইয়া সেখানকার ছায়া আয়নায় পৌঁছায় না। তবে কী দেখিলাম? বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কোন দুর্জ্ঞেয় সত্তার ষড়যন্ত্রের শিকার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া সবে ঘরে ঢুকিয়াছি, দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম, মনে হওয়া বা অনুমান করা নয় যে আয়নার উপরে ছায়া—শুধু এক বিদ্যুৎঝলকের জন্য, শুধু জলে দাগ কাটার মতো, কিন্তু সত্যই যে দেখিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। তখনি মনে পড়িল—ঘর তো অন্ধকার, এখনো আলো জ্বালানো হয় নাই, তবে ছায়া পড়িবে কি উপায়ে? বিদ্যুতের টর্চ টিপিলাম। শূন্য ঘর। ঘরের সেই সুবৃহৎ শূন্যতাকে একটা বিরাট হাঁ-র মতো মনে হইল।

অবশেষে কিভাবে আমার ত্রাস যে রোখে পরিণত হইল সে প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমার নাই। তবে আমার ধারণা এই যে, কোন একটা মনোভাব চরমে পৌঁছিলে তাহা অপর একটা মনোভাবে পরিণত হয়। মানুষের মনের সব ভাবগুলার মধ্যে গোপন চলাচলের একটা পথ আছে বলিয়াই এমন বোধ করি সম্ভব হয়।

আমার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল যে মরিতেই যখন হইবে, মরিতেই যখন বসিয়াছি,—অশরীরীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া মরিব। আর কিছু না পারি তাহাকে শিকারের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া মরিব। মৃত্যু যখন আমার আসন্ন, মনে হইল—এইভাবে মরিলেই আমার মরা সার্থক হইবে। আমি স্থির করিলাম যে, আর দুই-এক রাত্রি অশরীরীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের শেষ চেষ্টা করিব। পারি তো উত্তম, না পারি তো নিজের প্রাণ নিজের হাতে লইব, অশরীরীর শিকারে পরিণত হইব না। এখন হইতে গুলিভরা পিস্তলটা সর্বদা পকেটে রাখিতে লাগিলাম।

সেদিন রাত্রি আমার জীবনের শেষ রাত্রি হইবে যখন ভাবিয়াছিলাম, তখন কে জানিত যে সেই রাত্রিই আমার মোহমুক্তির রাত্রি হইবে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়াছিলাম—বলা বাহুল্য—একাকী। রাত্রি ঘন অন্ধকার। দূরাগত ঝাউগাছের হু-হু শব্দ পরলোকের তীরভূমি হইতে বাহিত দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শ্রুত হইতেছিল। সম্মুখে গঙ্গা—সেখানে অন্ধকার কিছু ফিকা, নতুবা বুঝিবার আর কোন উপায় নাই। বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় মনে হইল, ঘরের মধ্যে কে যেন শিস্ দিতেছে। দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম—আজ আমার মনে আর ভয় ছিল না। অশরীরীকে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা সম্ভব হইলে অবশ্যই করিতাম, কিন্তু মনের ওই অবস্থাতেও বুঝিয়াছিলাম যে তাহা সম্ভব নয়, তাই নিজেই মরিব। অশরীরীর উপস্থিতিতে নিজের হাতেই মরিব, তাহার শিকার ফস্‌কাইয়া যাইবে, সে হতাশ হইবে। সে কি আনন্দ! ঐ এক আনন্দই তখন জীবনে অবশিষ্ট ছিল। উৎকট উল্লাসে হাসিয়া উঠিলাম। অনেক দিন হাসি নাই, এত উচ্চস্বরে কখনো হাসি নাই। নিজের হাসিতে নিজে চমকিয়া উঠিলাম। হঠাৎ সেই ছায়া, ঈষদালোকিত কক্ষের আয়নার উপরে সেই ছায়া—শুধু এক পলকের জন্য। পিস্তল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দরজাটা খোলা ছিল, বন্ধ করিয়া আসিলাম। তখন আমার মুখ দরজার দিকে। আমার ঠিক পিছনে দেয়ালের গায়ে আয়না। পিছনে সেই শিস্ দিবার শব্দ। পিছন ফিরিবামাত্র ছায়াশরীরী অশরীরী—মনে হইল সে যেন আর আয়নার উপরে নাই। আমার দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিবার আগেই পিস্তল

তুলিয়া নিজের মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম, কেবল তড়িদ্‌বেগে মনে হইল, আমার ঠি
পিছনে সে যখন রহিয়াছে, সেও মরিবে। এক গুলিতে শিকার ও শিকারী দুইজনেরই জীবনাবসান

বোধ হয় হাত একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল। শূন্যঘরে পিস্তলের শব্দ মাথা কুটিতে লাগিল
পিছন হইতে একটা নিদারুণ নিষ্ঠুর হাসির খন্‌খন্‌ শুষ্ক আওয়াজ কানে আসিল, মনে হই
অশরীরী আমার ব্যর্থ চেষ্টাকে ধিক্কার দিয়া হাসিতেছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ। ঘরের মে
কাঁপিতেছে, ছাদ ঘুরিতেছে, সমস্ত অন্ধকার।

পরদিন যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যার উপরে শায়িত, ভিখু মাথায় বা
করিতেছে। পায়ের কাছে দারোয়ানজী গম্ভীরমুখে দণ্ডায়মান। শিমুলতলার ঠিকানায় একটা তা
করিতে বলিয়া আবার আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙিল, দেখিলাম যে আমার পরিবারের জনতিনেক কাছে বসি
আছে। তাহাদের বলিলাম, আজই আমাকে এখান হইতে লইয়া চল।

পরদিন প্রাতে শিমুলতলায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

এই ঘটনার পরে পাঁচ-সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক
অশরীরীর স্মৃতি আমার মনে ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সত্য করিয়া বলি, এই রহস্যে
উত্তর আজও পাই নাই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পুরাতন উত্তরই পাইয়াছি—নার্ভা
শক। মনস্তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—সমস্ত ব্যাপারটাই একটা সাব্‌জেকটি
রিঅ্যাকশন। বন্ধুরা বলে—আমি ধাপ্পা দিতেছি। কিন্তু আমি জানি, মর্মান্তিকভাবে জানি, সমস্ত
নিদারুণ সত্য। কেমন করিয়া না-জানি অশরীরীর মোহময় খোলসের মধ্যে আমি ঢুকি
পড়িয়াছিলাম। সেই রাত্রের পিস্তলের গুলি সেই মোহ ভেদ করিয়া দিয়া আমাকে বাঁচাই
দিয়াছিল। অশরীরী নিজের ব্যর্থতায় আত্মধিক্কারের অট্টহাস্য করিয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করি
গিয়াছিল। বন্ধুরা বলে, ওসব তোমার কবিত্ব। যাহাকে ধিক্কারের অট্টহাস্য বলিতেছ, বস্তুত তা
পিস্তলের গুলি লাগিয়া সেই বৃহৎ আয়নাখানা ভাঙিবার শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আ
বুঝাইতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি। ❑



ভূতের গল্প

বনফুল

হঠাৎ মাখন সিং এসে হাজির হল অনেকদিন পর। শিকারী মাখন সিং। কাঁধে বন্দুক। হাতে একজোড়া মরা পিন্‌টেল। পিন্‌টেল অতি সুস্বাদু বুনোহাঁস। মাখন অনেক বুনোহাঁস খাইয়েছে আমাকে। প্রায়ই হাঁস মেরে আনত। হরিণের মাংস, বুনো শুয়োরের মাংস, সজারুর মাংস, খরিকানের মাংস ওর দৌলতেই খেয়েছি। আমার ঘরে বাঘের যে চামড়াটা দেওয়ালে টাঙানো আছে সেটাও মাখনের দেওয়া। খুব বড় শিকারী। পরনে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট, কাইজারি গোঁফ। মাথার চুল কদম ছাঁট।

অনেক দিন পরে এল আজ।

'কি মাখনলাল, এস এস। এতদিন কোথায় ছিলে?'

'নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। ভাবলাম অনেকদিন দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি, দেখা করে আসি। আজ ভাগ্য ভালো, দুটো পিন্‌টেলও পেয়ে গেলাম।'

'বেশ, বেশ। বস। চা খাবে না কফি'?

মাখন রহস্যময় হাসি হেসে বললে—'না, কিছু খাব না। আপনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে আছেন মনে হচ্ছে—'

'হ্যাঁ, মনে মনে কল্পনার দরবারে ধন্না দিয়েছি। একটা ভৌতিক গল্পের প্লটের জন্য।'

'আমার একটা অদ্ভুত ভূতের গল্প জানা আছে। শুনবেন?'

'বেশ, বল।'

মাখন সিং বলতে লাগল ঃ

'গৌড়ের কাছে একটা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলাম। একজন খবর দিয়েছিে সেখানে ভোরের দিকে বড় বড় কালো তিতির পাওয়া যায়। খুব ভোরে বেরোয় তারা। আ ঠিক করলাম রাতে গিয়ে বনের ধারেই শুয়ে থাকব। আমার ছোট একটি বিলিতি খাটিয়া আে সর্বত্র নিয়ে যাওয়া যায় প্যাক করে। তার মাপে মশারিও আছে আমার একটা। ঠিক করল জঙ্গলের ধারেই মশারি খাটিয়ে শুয়ে থাকব রাত্রে।

খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেলাম রাত দশটার পর। সন্ধ্যা থেকেই আমার চাকর শুব বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। আমি গিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে দিলা সে বাসায় চলে গেল। আমি লোডেড্ বন্দুকটি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও চাঁদ ওঠেি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। কিন্তু বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা ফোঁস করে শব্দ হল। মনে হল সাপ নাকি! সঙ্গে টর্চ ছি জ্বেলে দেখি—ও বাবা, সাপ নয়, হাতী। বিরাটকায় একটা হাতী। ঠিক সেই সময়েই আকাশে মেঘটা সরে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের-জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চতুর্দিক। দেখলাম হাতী শ বিরাটকায় নয়, বেশ সুসজ্জিতও। পিঠে হাওদা রয়েছে। আমার মশারির ঠিক পাশে দাঁড়ি শুঁড় নাড়ছে, কান নাড়ছে, আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে মাঝে মাঝে। আর কিছু করছে ন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। চুপটি করে বসে রইলাম। ভাবলাম কোথা থে এসেছে, আপনিই চলে যাবে। এ বুনো হাতী নয়, পোষা হাতী। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গে হাতী কিন্তু নড়ে না। ক্রমাগত শুঁড় দোলাচ্ছে আর কান নাড়ছে। আরও মিনিট দশেক কে গেল। কি করব ভাবছি। এমন সময় হাতীটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সে আকাশে দিকে শুঁড়টা তুলে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শুঁড়টা নামিয়ে আমার মশারির ভিত শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিল। শুঁড়ে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল, সে মালাটি পরিয়ে দিল আমার গলা শুঁড়ের ভিতর থেকে ঠক্ করে কি একটা পড়ল আমার কোলের উপর। তুলে দেখি শ্বেতপাথরে ছোট শিবলিঙ্গ একটি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমি গৌড়ের রা শশাঙ্ক আর এটি হচ্ছে আমার প্রিয় হস্তী মৈনাক।

বললাম, মৈনাক, কি খবর?

সঙ্গে সঙ্গে মৈনাক হাঁটু গেড়ে বসল। আর তার শুঁড়টি বেঁকিয়ে ধরল। আমি তার শুঁ পা রেখে হাওদায় গিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল সে। গজেন্দ্র গমন নয়—ছুটে লাগল মৈনাক। কত মাঠ বন গিরি নদী পার হয়ে গেলাম। রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। মৈনা তবু থামে না। দিনের আলোয় দেখলাম চমৎকার এক দেশ। চারিদিকে প্রাচুর্য, চারিদি সৌন্দর্য। কত মন্দির, কত হর্ম্য, কত জলাশয়, কত বাগান পার হয়ে গেলাম। মৈনাককে দে রাস্তার লোক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়—জয়ধ্বনি প্রকম্পিত হতে লাগল চারিদিক। মৈনাক কিন্তু এক নিমিষের জন্য থামে নি। সে ছুটে চলে সমস্ত দিন ধরে সে ছুটল। তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, অন্ধকার রাত্রি নামল, তখন বিরাট এ

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল মৈনাক। শুঁড় দিয়ে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলল জঙ্গলের ভিতর। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম একটি পরিষ্কার জায়গায় চিতা জ্বলছে। আর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যশ্রী। আমি রাজ্যশ্রীকে ভালবাসতাম কিন্তু তার ভাই রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল, তাই তাকে পাইনি।

বললাম—রাজ্যশ্রী, এখানে কি করছ?

আমি জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করব। তুমি আমাকে বাধা দিও না।

নিশ্চয় দেব।

সঙ্গে সঙ্গে আমি মৈনাকের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বরশা এসে বিঁধল আমার বুকে। দেখি রাজ্যবর্ধনের প্রেত দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ভ্রূকুটিল, চোখে আগুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার পৌত্র হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল।

দাদু, আজ আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ছিল। দেখ, আমি কী সুন্দর রামায়ণ পেয়েছি!

প্রকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণটা সে রাখল টেবিলের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে মাখন সিং যেন উবে গেল। মরা পিনটেল দুটো যেখানে পড়ে ছিল, দেখলাম, সে দুটোও নেই সেখানে। পরদিন খবর পেলাম, শিকার করতে গিয়ে মাখনলালের মৃত্যু হয়েছে। একটা বনের ভিতর তার মৃতদেহটা পড়েছিল। ❑





বুদ্ধির বাইরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের চোখে ভূতের অস্তিত্ব অচল। পাড়াগাঁয়ের ভূতের ভয় থেকে প্ল্যাঁসেৎ, মিডিয়ামতত্ত্ব, রাত-বিরেতে সম্ভব অসম্ভব ছায়ামূর্তি দেখে চমকে ওঠা—এসব অনেক কিছুই তর্কের উপাদান জোগায়। ভৌতিক অস্তিত্বও ঈশ্বরের মতই নানা মতবাদে বিড়ম্বিত—সেখানে আস্তিক, নাস্তিক, স্কেপটিক বা অ্যাগনস্টিক কারুরই অভাব নেই।

সোজা কথায়, যুক্তির জগতে ভূতের জায়গা নেই। ভূত মানতে গেলে চোখ বেঁধে পিছু হটতে হয় একেবারে প্যালিয়োলিথিক আদিম যুগে। অশরীরী তত্ত্বে যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের সঙ্গে আজ আর তর্ক চলবে না—চরম নিষ্পত্তির জন্যে হাতাহাতি করতে হবে।

তবু সবকিছু বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব তর্কের মধ্যেও একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। এমন কতকগুলো প্রশ্ন ওঠে—যাদের উত্তর মেলে না। তার মানে এই নয় যে কোনদিন তাদের উত্তর একেবারেই পাওয়া যাবে না। হয়তো বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি একদা সবকিছুর নিঃশেষ সমাধান করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা আমাদের মনকে নানাভাবে আন্দোলিত করতে থাকে।

এই রকম একটি ঘটনা আমি বলব। এটা ভূতের গল্প কিনা জানি না। চোখ কিম্বা মনের ভুল কিনা, সে সম্বন্ধেও কোন রায় দিতে আমি প্রস্তুত নই। শুধু যা ঘটেছে, সেইটুকুই আমি বলব। যাঁর যা খুশি, তিনি সেই ভাবেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। মাত্র একটি কথা জানিয়ে রাখি—এগুলি ঘটেছে সম্পূর্ণ খোলা এবং অপ্রস্তুত চোখের সামনে—গঞ্জিকা বা মাধ্বীর কোন প্রভাব এসব ক্ষেত্রে ছিল না।

প্রায় বারো-তেরো বছর আগেকার কথা। তখন পশ্চিম বাংলার একটা ছোট গ্রাম থেকে আমি শহরে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতুম। সাইকেলে করে আসতে হত আট মাইল দূরের স্টেশনে। একটা ছোট দোকানে সাইকেল জমা রেখে আমরা ট্রেন ধরতুম, সন্ধ্যের গাড়িতে ফিরে আবার সাইকেল নিয়ে গ্রামে চলে আসতুম।

'আমরা' বললুম এই জন্যে যে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতুম দুজনে। আমি আর প্রিয়নাথ। মুন্সেফ্ কোর্টে চাকরি সেরে পাঁচটা নাগাদ প্রিয়নাথের সাইকেল রিপেয়ারিং-শপে এসে আমি আড্ডা দিতুম, চা খেতুম। তারপর সাতটায় দোকান বন্ধ করে সাতটা বাইশের ট্রেন ধরতুম দুজনে। কোন একজনের বাড়ি ফেরবার খুব বেশি তাগিদ না থাকলে ছিল এই আমাদের দৈনন্দিন প্রোগ্রাম।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রামের প্রায় সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল একটা অনুর্বর কাঁকর মাটির মাঠ—যাকে বলে ব্রহ্মডাঙা। জেলা-বোর্ডের রাস্তাটা ঢেউ খেলানো মাঠের ভেতর দিয়ে চড়াই-উৎরাইয়ে চলে গেছে—কোথাও কোথাও কুড়ি-বাইশ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠেছে দু-ধারের ঢাল জমি ছাড়িয়ে। পথের পাশে দেড় মাইল দু-মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম নেই ; শুধু এলোমেলো ফণী মনসা আর আকন্দের ঝোপ ছড়িয়ে আছে।

এককালে মাঠটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত ছিল। পাঁচশো বছরের ভেতরে ওসব উপদ্রব আর শোনা যায়নি। কিন্তু তবুও একা এ-পথে ফিরতে সন্ধ্যের পরে গা ছমছম করত। দু-একটা ভূতের কাহিনীও যে মাঝে মাঝে কানে আসত না এমন নয়। কিন্তু ও-ভয়টা কোনদিন আমাদের মনে যে এতটুকু ছাপ ফেলেছে, তা নয়। অন্তত সচেতন ভাবে তো নয়ই।

সেদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে কতগুলো সরকারী কাজ সেরে নিতে আমার রাত হয়ে গেল। প্রিয়নাথের দোকানে আসতেই তার ছোকরা চাকরটা জানালে যে আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে যথানিয়মে সাতটা বাইশের ট্রেনই ধরেছে প্রিয়নাথ।

আমার মনটা দমে গেল। শুধু একা ফিরতে হবে বলেই নয়, দিনটাও দুর্যোগের। একটু আগেই মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে আকাশ-চেরা বাজের ডাক। বৃষ্টিটা আপাতত থেমেছে বটে, কিন্তু আকাশ এখনো ঘন-মেঘে একটা আলকাতরার আস্তর দিয়ে মোড়া। যে কোন সময়ে ঝমঝম করে নেমে পড়তে পারে। এরই মধ্যে রাত নটার পরে ওই সীমাহীন কালো মাঠটার ভেতর দিয়ে একা আট মাইল সাইকেলে করে আমায় ফিরতে হবে। কারণ, সন্ধ্যের পরে স্বভাবতই নির্জন পথটাতে এই বৃষ্টি-বাদলের রাতে যে কোন সহযাত্রী মিলবে, এ আশা করাই বিড়ম্বনা।

কিন্তু উপায় নেই, আমাকে যেতেই হবে। ঘন কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম, তারপর স্টেশনে এসে আটটা আঠাশের গাড়ি ধরলুম।

ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই বৃষ্টি নামল। এমন প্রবল বৃষ্টি সচরাচর দেখা যায় না। সারা আকাশটা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছে—অন্ধকার সাদা হয়ে গেছে বৃষ্টির কুয়াশায়। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা আরো থিতিয়ে বসতে লাগল। উঁচু কাঁকরের রাস্তায় জল দাঁড়াবে না, কিন্তু মাঠের ভেতর বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া মিশলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়।

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। আধঘণ্টার মধ্যে আমি স্টেশনে এসে নামতেই দেখি বৃষ্টিও ধরে গেছে। মেঘ হালকা হয়ে গেছে, শুধু অল্প অল্প ইলশেগুঁড়ি পডছে তিরতির করে।

যে মুদিখানায় সাইকেল জমা থাকে, সে লোকটা ঝাঁপ বন্ধ করবার উপক্রম করছিল। আমাকে দেখে হাই তুললে। হেসে বললে, 'এই রাতে ফিরবেন? থেকে যান না আমার দোকানে?'

বললুম, 'সে হয় না, বাড়িতে সবাই দুশ্চিন্তা করবে।' আরেকটা কথা অবশ্য বলা গেল না—সে তাগিদটাই প্রবলতর। অর্থাৎ মাসখানেক আমি বিয়ে করেছি এবং মাত্র তিনদিন আগে স্ত্রী এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

দোকানদার সাইকেলটা বের করে দিলে। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রিয়নাথ চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, উনি তো সাতটা পঞ্চান্নর গাড়িতেই নামলেন। ভেঙে বৃষ্টি আসছিল, বাজ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। ওঁকেও দাঁড়িয়ে যেতে বলেছিলুম, রাজী হলেন না। বললেন, বোঁ বোঁ করে চলে যাবেন।'

বোঁ বোঁ করে চলে যাব—আমিও ভাবলুম। তারপর সেই ঘন কালো অন্ধকারে তিরতিরে বৃষ্টির ভেতরেই সাইকেল নিয়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই মাঠের রাস্তা এসে পড়ল। দু-ধারে নিবিড় কৃষ্ণতার ভেতরে ব্যাঙের ডাক, ঝিঁঝির আওয়াজ আর ছোট বড় নালায় বর্ষার জলের কলধ্বনি। ল্যাম্পের ছোট আলোটিতে সামনের পাঁচ-সাত হাত দূর পর্যন্ত পাঁক-ডোবা রাঙামাটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেটুকুও আর রইল না। ল্যাম্পে তেল ছিল না—খেয়াল করিনি। ক্ষীণ হতে হতে দপ করে নিভে গেল সেটা।

এইবার আমার ভয় করতে লাগল। চেনা রাস্তা—যতই অন্ধকার থাক, ঠিক নির্ভুল ভাবেই চলে যাব। তবু—তবু অন্ধকার, এই নির্জনতা। একবার যদি অসাবধান হই, তাহলে সাইকেল নিয়ে একেবারে দশ-বারো হাত নিচে গড়িয়ে পড়ব!

দু-চোখকে যতদূর সম্ভব তীব্র করে আমি সাইকেল চালাতে লাগলুম। তাড়াতাড়ি যেতে ভরসা হচ্ছে না, তবু উত্তেজনায় আপনা থেকেই দ্রুতবেগে পা ঘুরছিল প্যাডেলে। সেকেলে বি-এস-এ বাইক—আমার মনের শাসন না মেনেই সে যেন শোঁ শোঁ করে উড়ে চলল।

'থামো হে সেন, থামো!'

অন্ধকার ছিঁড়ে যেন তীরের মত স্বর উঠল একটা। প্যাডেলে আচমকা পা থেমে এল আমার। পেছন থেকে পরিষ্কার গলায় ডাকল প্রিয়নাথ: 'অত তাড়া কিসের হে? আমি যে সেই এক ঘণ্টা ধরে মাঠের ভেতরে তোমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি।'

বিস্ময়ে এবং আনন্দে আমি সাইকেল থেকে নেমে এলুম। অন্ধকারেও দেখা গেল, পেছন দিকে প্রিয়নাথ দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

'ব্যাপার কি হে? সেই সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেনে নেমে এতক্ষণ মাঠের ভেতরে কী করছিলে?'

প্রিয়নাথ বললে, 'সে অনেক কথা। ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে একটা।'

'এই বর্ষার রাতে মাঠের ভেতরে কী এমন মজার ব্যাপার হতে পারে? আর তোমার সাইকেলই বা গেল কোথায়?'

অন্ধকারে প্রিয়নাথ এবার অল্প একটু শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'বলছি তো, সে অনেক কথা। গ্রামে ফিরে শুনবে। আপাতত তোমার ক্যারিয়ারে আমায় তুলে নাও।'

'বেশ, উঠে পড় চটপট।'

প্রিয়নাথ কাছে এল : 'দেখেছ কাণ্ড! জলে কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছি। হাড়ের ভেতরটা সুদ্ধ কাঁপছে ঠকঠক করে।'

'পড়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'হুঁ, সে আর বল কেন! আছাড় বলে আছাড়! একেবারে অতল জলের ভেতর। কাদায় প্রায় বসে গিয়েছিলুম। যাক, বাড়ি ফিরেই শুনবে সেসব কথা।'

আমি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরালুম। তড়াক করে প্রিয়নাথ পেছনে উঠে বসল। একটা ঝাঁকুনি লাগল, টের পেলুম, সীটের আংটাটা প্রিয়নাথ আঁকড়ে রয়েছে।

এই ভিজে রাস্তায়, এমন অন্ধকারে আরেকটা মানুষকে ক্যারিয়ারে তুলে নেওয়া যে কী দুর্ভোগ, সে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু অনুভব করলুম, হঠাৎ যেন আমার গায়ে দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। প্রিয়নাথের অতখানি ওজন আমাকে বিন্দুমাত্র কাবু করতে পারল না। সেকেলে মজবুত বি-এস-এ সাইকেল শনশন করে চলতে লাগল। এমন কি, অন্ধকারের সম্ভাব্য বিপদ ভাবনাও মুছে গেল মন থেকে।

প্রিয়নাথ কোন কথা বলছে না—আমিও না। নিঃশব্দে প্রায় পনেরো মিনিট চলবার পর হঠাৎ দূর থেকে জলের একটা উগ্র গর্জন শোনা গেল। আমি চমকে বললুম, 'ওকি—খোয়াইতে বান এল নাকি?'

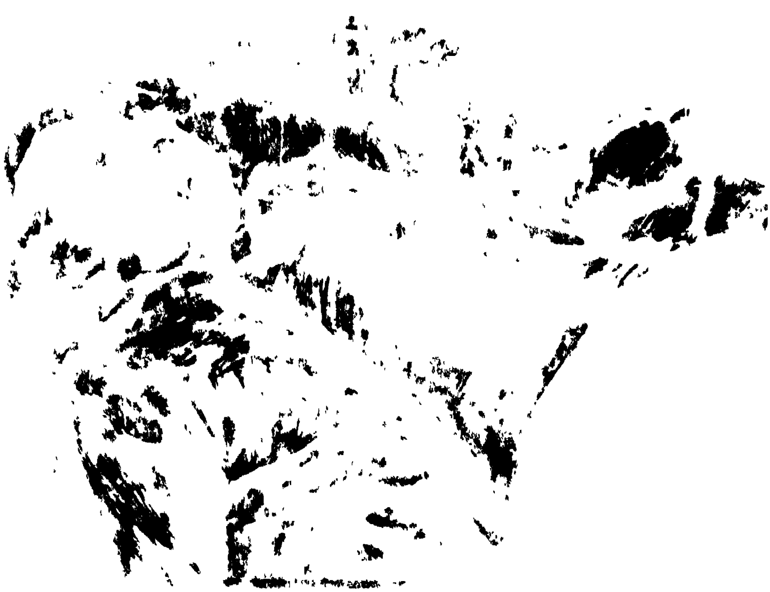
এইবার বিচিত্র ব্যাপার ঘটল একটা। প্রিয়নাথ আমার কথার জবাব দিলে। কিন্তু পেছনের ক্যারিয়ার থেকে নয়। পরম বিস্ময়ে দেখলুম আমার সাইকেল থেকে প্রায় পনেরো হাত সম্মুখে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়নাথ। হ্যাঁ, অন্ধকারেও দেখতে পেলুম প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রিয়নাথ ডেকে বললে, 'নামো সেন, নামো। বানের জলে খোয়াইয়ের পোল কাঠ পুরো ভেসে গেছে। আর এগোলে খাড়া ত্রিশ হাত নিচে আছড়ে পড়বে।'

মুহূর্তের মধ্যে সারা শরীরে আমার বিদ্যুৎ বয়ে গেল। কখন ক্যারিয়ার থেকে নেমে প্রিয়নাথ, কখনই বা এমন করে পনেরো হাত দৌড়ে গেল সে? সাইকেলের গতি মন্দা করতে করতে আবার শুনলাম : 'এখনো নামো সেন, এখনো নামো। নইলে আমার যা হয়েছে, সেই দশা তোমারও হবে।'

ক' সেকেণ্ডের মধ্যে সবটা ঘটল জানি না। দেখলুম, প্রিয়নাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তারপর যেন করোটির কোটর ছেড়ে সে দুটো চোখ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আলোর মত উড়ে এল আমার দিকে! যেন ফরফরাসের দুটো অতিকায় পতঙ্গ!

পরদিন সকালে আমাকে পাওয়া গেল রাস্তার ওপরে, সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম। আর প্রিয়নাথকে পাওয়া গেল ভাঙা পুল থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাত নিচে, আলো তিন চার ফুট জলকাদার তলায়। ওপর দিকে পা দুটো তোলা, আর মাথাটা কাদার মধ্যে গাঁথা। ভাঙা সাইকেলটা খানিক দূরে একখানা বড় পাথরের ওপরে ঝুলে রয়েছে। ❑





তৃষ্ণা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্যাটি মেনডোনসা! এই ঘরে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পারছি। আমি আর যুঝব না, বাধা দেব আমার ক্ষমতা ফুরিয়েছে—তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তাই ভয় হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাঁড়াও, তোমার কাকে ভয়?

ঘরে যে কটি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তারও। রোগের ঘোরে অনেকে অনেকরকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয়। জড়তা থাকে। কিন্তু এ ন কেউ সর্বরকমভাবে হার মেনে ক্লান্ত বিষণ্ণ থমথমে গলায় স্পষ্ট করে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কল। অনেকের কানে সেটা নিজের মৃত্যুঘোষণার মত লাগল।

অসুখের ঘোরে রোগী আগেও অনেকবার ভুল বকেছে, বিকারগ্রস্ত দুই চোখ টান করে অনেকবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর এমন স্পষ্ট হয়ে কানে লেগে থাকেনি কারো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হয়নি। তাতে নিজেকে আগলে রাখার কুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইন্‌জেকশন আর মর ওষুধ দিয়ে তখন রোগীকে ঘুম পাড়িয়েছেন। আজ ছদিন ধরেই তাই করছেন। দেহগত ক্ষণ তিনি সুবিধের দেখছেন না। অথচ আরো দুজন সতীর্থ চিকিৎসকের সঙ্গে সলাপরামর্শ রেও সঠিক রোগের হদিস পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এক একবার ভেবেছেন হাসপাতালে

এনে ফেলা দরকার। আবার মনে হয়েছে এই অবনতির লক্ষণ গোটাগুটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া দরুন। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কোন রোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভয়ের কিছু নেই বো হয়। স্নায়ু সে-রকম বিকল হলে দেহের অন্যান্য লক্ষণও তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

তিনি শুনেছেন রোগীর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এর ওপর বড় রকমের মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি, সম্ভব-অসম্ভবের চিন্তাও তাঁর মাথা আসেনি। সুপ্ত বাসনার একটা বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তিনি। যে রাতের ক শুনেছেন সেই রাতে ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই আজকালকার রোমান্সসর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলেছোকরাদের জানতে বাকি নেই তাঁ যে কারণেই হোক বড রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসি চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জী। বন্ধুদের মধ্যে আরো দুই একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনেছিল। আর সাতদিন আ উৎসবের সেই রাত্রি শেষে একটা মজার প্রহসন তারা স্ব-চক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছিল। কেউ কো অসংযত ঠাট্টাবিদ্রূপে জর্জরিত করেছে নরিসাকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি ন তোর মত হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বা গিয়ে ঘুমোগে যা—।

ঠাট্টা যারা করেছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জীও তাদে একজন।

ফিলিপ নরিসেব এই কণ্ঠস্বর শুনে আব এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজে অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হল, এই কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বারপ্রা বুঝি সত্যই কোন রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জী চোখ যে দিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আল্‌না। আল্‌নার হ্যাঙ্গারে গরম কোট ঝুলছে একটা ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, বিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখছে সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে। বিড়বিড় করে বলছে শোনা যায় না। কিন্তু চ্যাটার্জীর মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা. প্যাট মেনডোন

ঘরের মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জী। এ ছদিনে অনেকবার যে ক মনে হয়েছে, কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে যখন দিয়েই এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন—ভুল হয়েছে ভুল, কেন ভুল চ্যাটার্জীও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরি চ্যাটার্জী নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল—অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ওষুধ খাওয়ালেন, ইন্‌জেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো, এক কাজ করো, উৎস পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প

মেনডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো—এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেনডোনসা হয়ত ডজন দুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাধিয়ে রেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবে'খন দেখে নিও। তোমরা যে ঠিকানায় গেছলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে—সে-তো বে-সামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে!

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে! তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধাঁ লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না হয় মাথার গন্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামত কাগজে বিজ্ঞাপন একটু দিয়ে দেখবে? পর মুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে। না ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কি করে, এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

যাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে সে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধ করি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ-সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্বভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান্ মেয়ে পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ান্‌দের মধ্যে আবার জাতের রেষারিষি আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মিন্-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ান্‌দের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ান্‌দের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মত। এখানে জাত বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সঙ্গতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে, তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল্ এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা। এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণত সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সবজান্তার আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া

উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি। সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতি-বিধি আচার-আচরণ সরল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধববা তার বেশির ভাগই বেপরোয়া, সদা মুখর। কারো টাকার দরকার হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপ নরিসের কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিয়ে দেবে। না থাকলে, আর টাকার প্রয়োজন যার সে প্রিয়পাত্র হলে, ধার করে এনে দেবে। দিয়ে অনুগ্রহ করবে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালো চাকরিই করে, ব্যাচিলর, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকার সঙ্গতি আছে।

তাহলেও ফিলিপ নরিস ক্লাবের প্রথম সারির কেউ নয়। অর্থাৎ চ্যাটার্জীর মত নিজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সভ্য বা সভ্যারা ভালো করে চেনেও না তাকে। তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দরুন সভার আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয় না। তার মত সাদামাটা সভ্যসংখ্যা শতকের ওপর। দু' দশজনের কাছে যেটুকু খাতির সে পায় তাও চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ -তার দরুন। এইজন্যই চ্যাটার্জীর প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে, চ্যাটার্জীর সক্রিয় সহযোগিতায় তার কাগজে নরিসের দুই একটা আবেগমুখর প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। তিরিশ টাকা দক্ষিণা পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খরচ করে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীর ঋণ শোধ হয়েছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ করে। চ্যাটার্জীরও ভালো লাগে ফিলিপ নরিসকে।

ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের রাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয় আলোয় একাকার। ছ'মাস আগে থেকেই এই একটা রাতের প্রতীক্ষা করে থাকে সকলে। এক রাতের উৎসবে কত হাজার টাকা খরচ হয় সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। সভ্য এবং অতিথি অভ্যাগতদের গাড়ির ভিড়ে প্রাসাদসৌধের সামনের দুটো বড় বড় রাস্তার অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত রাতের উৎসব—খাওয়া দাওয়া নাচ গানের ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়ের ঘটনা, বোম্বাই শহর তখন 'ড্রাই' নয়, অতএব বহুরকম রঙিন পানীয়ের ব্যবস্থারও ত্রুটি ছিল না কিছু। রাত বারোটার পরে ডান্স হল্-এ যখন নাচের ডাক পড়ল, নিজের নিজের দুটো পায়ের ওপর তখন অনেকেরই খুব আস্থা নেই।

...সেই মেয়েটির দিকে আবার চোখ পড়ল ফিলিপ নরিসের। এই নিয়ে বারকয়েক চোখ গেল তার দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। এই উৎসবে এই বয়সের সঙ্গীহীন মেয়ে বড় দেখা যায় না। ডান্স হলের দরজার ওধারের দেয়াল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয়, কিন্তু ওই মেয়েটির মত একা কাউকে মনে হল না নরিসের। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড় শুকনো—এক ধরনের বিষণ্ণ ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ-চাউনি। এই পরিবেশ মেয়েটির যেন পরিচিত নয় খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কের মত নাচ দেখছে এক-একবার, আবার শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিরিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে, বিশেষ করে এই সময়ে কারো দিকে কারো চোখ নেই। সকলেই যে যার সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। এই রাতের মত রাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকার কথা নয়'

ফিলিপ নরিসেরও। সে নাচতে একটু-আধটু জানে বটে, কিন্তু গিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায়ই না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে, আর তাইতেই বেশ একটু আমেজের মত লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সহজাত সঙ্কোচে কারো দিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন।

মেয়েটির বিষণ্ণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নরিসের মুখের ওপরেও আটকালো দুই একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেল না মুখ থেকে।

ফিলিপ নরিস উঠে মেয়েটির কাছে এলো একসময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখ-মুখ আরো নিষ্প্রভ বিষণ্ণ মনে হল নরিসের। কেমন এক ধরনের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না...আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নরিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন?

মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নরিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল, না কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো, আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না.. ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে..

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নরিস রীতিমত অবাক। অথচ মেয়েটি যে খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কি নাম?

নরিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট করে মনে করতে পারছে না। স্মরণের চেষ্টা। বেশি মাত্রায় মদটদ খেয়েছে কিনা নরিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দুরনই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা...মার্টিন ডিসুজা...চেনো?

নরিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখখানা বড় অদ্ভুত লাগছে নরিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিসুজা, কি করে তাও স্মরণ করতে পারল না। নরিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড় অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে, তার কাছ থেকেই হয়তো বা বড় রকমের কোন আঘাত পেয়েছে।

নরিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ--বি চিয়ারফুল অ্যান্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে যেন। দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নরিস ভেবে পেল না। তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিস্মরণের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছে।

মাথা নাড়ল। নাচবে।

ডান্স হল্। তারা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ করে নরিসের মনে হয়েছে মেয়েটি—বড় দুর্বল, হয়ত অনেকটা পথ পাব হয়ে নিজের অগোচরে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয় সুরে বলল, আগে কিছু খেয়ে নাও না, এই উৎসব সমস্ত রাত ধরে চলবে।

তার চোখের 'আত্মবিস্মৃত' দৃষ্টি এখন আরো একটু বদলেছে। নাচের ফাঁকে নরিসের মুখখানাই দেখছে ঘুরে ফিরে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেয়েটির তাকে পছন্দ হয়েছে বোঝা যায় মাথা নেড়ে জানালো খাবার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

নরিস...ফিলিপ নরিস। তোমার?

প্যাট মেনডোনসা।...তুমি খুব ভালো...ডিসুজার মতই দরদী, তুমি কি ব্রাহ্মিন্ ক্রিশ্চিয়ান?

নরিস হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝল না।—না, কেন বলো তো?

নয় শুনে প্যাট মেনডোনসার চোখে মুখে খুশির আভাস। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল একটু বাদে বলল, আমার কেমন শীত শীত করছে।

নরিস কি করতে পারে! আধঘণ্টার আলাপে মেয়েটির প্রতি মায়া অনুভব করছে কেন জানে না। আর কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পারে। এ যেন এরই মধ্যে তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু কাছে টেনে আনল, নাচের গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গী এত সদয় বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছ ঘেঁষে এসেছে মন্থর পায়ে নাচছে, আর প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামের জন্য দুজনে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল একটু। আর তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত সুবে বলল, আমার ভয়ানক শীত করছে। আমি আব থাকতে পারছি না...

জামার ওপর তার কাঁধে হাত রেখে নরিস বিচলিত হল একটু। গাটা সত্যি বড় বেশি ঠাণ্ডা। আবার আগের মতই শ্রান্ত আর ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নরিস নিজের দামী গবম কোটটা নিয়ে এসে তাব গায়ে পরিয়ে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না আর রাত না করে তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাও, বাড়ি কোথায়?

বান্দ্রা...।

বেশি দূরে নয় তা হলে! প্যাট মেনডোনসার গায়ে তার নিজের কোটের পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার কবল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তার দিকেই বাড়িয়ে দিল।—তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিয়ে আমি কোটটা নিয়ে আসবখন।

এ-রকম বিদায়টা যেন খুব পছন্দ নয় মেয়েটির, মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নাম বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নরিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনেব লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখ পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল।—ও-দিকটা কি?

বাথ..

অস্ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও—

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নরিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হ্যালক্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীব ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নরিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নরিস। বলে কি! এ কার পাল্লায় পড়ল সে! তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, না না, কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়েছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মত শোনালো। নরিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে! ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই—নাকি এও মানসিক রোগ কিছু! বিস্ময় সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকালো নরিস, বলল, আঃ! কেউ এসে পড়লে কি ভাববে! বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। তারপব আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দবজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নরিসের।..ভালয় ভালয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়।

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আব একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেরোয়নি। বাথরুমের দবজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নবিস পায়চারি কবছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নরিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায় মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আব নরিসের ভয় বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে—ভিতরে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল, না কি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল!

ঘড়ি দেখল! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে একঘণ্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে! বিমূঢ় নরিস কি করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কাঁপল শুধু।

নরিস দৌড়লো হঠাৎ। আধ ভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বার করল। চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাত পায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এলো নরিস। চ্যাটার্জীর পিছু পিছু আর দুই একজন উৎসুক বন্ধুও এলো। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ার টেকার পুলিসে ফোন করল। পুলিস এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

এক সঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নরিস বিভ্রান্ত. বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই একজন ঠাট্টা করল, নরিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানলা দিয়ে নিশ্চয় পাখী হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোন পথ নেই

কেয়ারটেকার বা পুলিসের লোকেরও ধারণা হল, নরিস বেসামাল হয়েছিল, হয়ত. ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যান্ডেলে টানা হেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানা হেঁচড়া করে বা কোনরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে—গবেষণা করার মত ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নরিসকে একদিকে টেনে এনে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, বাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নরিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না। বলল, অভ্যেস নেই—ওটুকুতেই গন্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নরিস, এই দ্যাখো, আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে, নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সঙ্গত মন্তব্যই করল সে। বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে, তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার, তাই—

নরিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে কার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে—বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নরিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়ত কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোনরকম বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টা তিনেক নরিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নরিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে। ঘুম তাড়িয়ে নরিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নরিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

নরিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গত রাতের ফাংশানে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল নরিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভীর। বললেন, আচ্ছা, আপনারা বসুন একটু --

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন দেখুন তো এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কি না।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট দশটি নারী পুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নরিস। বলল, ইনি --

দু চোখ টান করে বৃদ্ধ নরিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নরিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত। এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দুবছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নরিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে? সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মত আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা। মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ মা'র বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিন্ ক্রিশ্চিয়ান-- বিয়ে হতে দিলে না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই হয়ত বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল -- তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটাল নরিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে এ[illegible] ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধি ক্ষেত্র[illegible] খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিকে [illegible] নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোট সমাধি একটা। সমাধির ওপর ক্রস। ক্রস্-এ ঝুল[illegible] সেই কোট। সমাধির গায়ে নামের হরফ—প্যাট্ মেনডোনসা।

[illegible]ই। অভিভূতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সমাধির সামনে হুঁশ নেই

নরিস [illegible] কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো --

[illegible] এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছিল চ্যাটার্জী কিন্তু বলা হয়[illegible]

---

* আখ্যানের বক্তা খবরের কাগজের চ্যাটা[illegible] বলে তার দাবি।



ভূতের যত অদ্ভুত কাণ্ড

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সত্যি, ভূতের সবই অদ্ভুত, তফাৎ কেবল উ-কারে। অদ্ভুত হ্রস্ব উ, ভূত দীর্ঘ ঊ।

তবে আমি যে ভূতের কথা বলছি, সে সত্যিই ভূত কি না জানি না। আর, ভূত বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তাই বা কে জানে?

ভূত কি কেউ দেখেছে? যারা বলে দেখেছি, তারা কেউ কি ভূতের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে, আর, ভূতের গায়ে হাত দেবেই বা কি করে, গা-ই যে তাদের থাকে না। গা মানে দেহটা ছেড়ে দিলে তবেই তো ভূত হয়।

আমি যে সব ভূতের কথা আগে বলেছি, ভূত দেখেছি বলেছি সেও তো সন্দেহজনক দেখা। সত্যি দেখেছি না ভয়ে অমনি মনে হয়েছে তা কি হলফ করে বলতে পারি?

(হলফ্ করানো হয় আদালতে, সাক্ষীদের বলতে হয় ঈশ্বরের নামে বা রাষ্ট্রের নামে — যেখানে ঈশ্বর মানা বেআইনী সেখানে রাষ্ট্রের নামে — দিব্যি গালতে হয়, শপথ করিয়া বলিতেছি আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।)

কেউ কি পারে? সে তো ছায়া, আলো জ্বাললেই মিলিয়ে যায়।

থাক গে, যা বলতে বসেছি তাই বলি।

অনেক, অনেকদিন আগে—ধরো আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর হবে—একবার একটা কাজে বর্ধমান জেলার এক মহকুমা শহরে যেতে হয়েছিল।

তখন হোটেল টোটেল বিশেষ ছিল না ওসব শহরে। কিন্তু লোক মামলা করতে আসত, ভোরে বেরিয়ে এসে ঐসব হোটেলে ভাত খেত, কাছারির কাজ সেরে নিজেদের বাড়ি ফিরে যেত। কদাচিৎ কেউ, বাধ্য হয়ে থাকতে হলে ঐসব হোটেলেই মাথা গুঁজে থাকত। খদ্দের কম বলেই ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তা ছাড়া আমাদের দেশের লোকেরও অনেক নোংরা স্বভাব আছে—ফলে সে সব ঘরগুলোর এমন অবস্থা দাঁড়াত যে নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ থাকত না।

আমি গিয়ে পৌঁছেছিলুম প্রায় সন্ধেবেলা—কোথায় কি আছে তাও জানি না—আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে হয়েছিল নরকেই বাস করছি। কোনমতে প্রায় জেগেই রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়েছিলুম ভালো কোন বাসা বা থাকার জায়গা খোঁজ করতে। আরও দু-তিন জায়গা ঘুরে বুঝলুম তেমন কোন হোটেল এখানে নেই, এখনও হয়নি। বরং যেটায় ছিলুম, এর চেয়ে সেটাই ভাল।

শেষে হতাশ হয়ে ফিরছি—এক ভদ্রলোক সন্ধান দিলেন, আপনি যেমন খুঁজছেন, তেমন জায়গা এক ডাকবাংলো ছাড়া কোথাও পাবেন না। অত পয়সা কার আছে যে ডাকবাংলোয় থাকবে, এক সরকারী অফিসাররা থাকতে পারে—তাদের খরচ লাগে না।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, খরচা কত?

তিনি জবাব দিলেন, তা বেশ। এক টাকা ঘর ভাড়া, আর মেথর আলো জল নিয়ে আরো আট আনা। দৈনিক দেড় টাকা। ওখানে সব আলাদা আলাদা, আলো দেয় একটা কেরোসিনের হ্যারিকেন লণ্ঠন কি টেবিল আলো—তার জন্যে তিন আনা—বুঝুন দিকি ব্যাপার! এক পয়সার কেরোসিনে দুই রাত জ্বলে—তার জন্যে তিন আনা। আসলে বাবুয়ানার মাশুল এটা বুঝলেন না! আপনি অফিসারদের মতো স্টাইলে থাকতে চাইবেন তার জন্যে খরচ করবেন না!

শেষের কথাগুলো আমাকে ঠোক্কর দিয়েই বলা হলো তা বুঝলুম। বেঁটে লোকের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর মতোই আমার অবস্থা। ট্যাঁকে পয়সা নেই যার, তার আবার অত ভালো-মন্দ বাছা কি!

সত্যিই তখন দেড় টাকার দাম ঢের। কলকাতা শহরেও তখন আড়াই টাকা/তিন টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যেত। এক মণ মানে এখনকার সাঁইত্রিশ কেজি।

তবু, আমি মন ঠিক করে ফেললুম, ওখানেই যাবো। খাই না খাই একটু আরামে তো থাকব। না হয় পাঁউরুটি খেয়ে থাকব। হোটেলে ভাত খাব না।

অনেক আশা নিয়ে তো এলুম ডাকবাংলা, কিন্তু সামনে এসে যখন গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, তখন সেখানের অবস্থা দেখে বুক হিম হয়ে গেল।

একি! এ যে পোড়ো বাড়ি। এখানে থাকব কি!

শহরের সীমানা থেকে পাকা দু মাইল পথ, গঙ্গার ধারে। একপাশে শ্মশান আর একপাশে মহকুমা-হাকিমের বাড়ি। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেন না। আশপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে কেউ কোথাও নেই। থানাটা পেয়েছি বটে পথে—সেও এখান থেকে অন্তত এক মাইল হবে। কোন

ছোটখাটো গৃহস্থ বাড়িও নজরে পড়ে না। শুধু ধানের ক্ষেত আর দুচারটে গাছপালা। একটা খড়ের ঘর দেখা যাচ্ছে পিছনে—তবে সেও বহুদূর। এমন কি শ্মশানে একটা চিতা জ্বলছে দেখলুম (ঐ বয়সে ওটাও খুব ভাল লাগার কথা নয়) কিন্তু সেখানে কেউ নেই। চিতা ধরিয়ে দিয়ে সব সরে পড়েছে।

ডাকবাংলোর বাড়ি একতলা, খুব উঁচু পোতার ওপর, বড় বড় জানলা বা দরজা (জানলার গরাদ নেই, তার মানে ইংরেজদের তৈরি, তাদেরই বসবাসের জন্যে সাহেবরা আগে খোলা জানলা রাখত, শেষের দিকে গরাদ বসানো জানলা ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।) বড় বড় তিনখানা ঘর, মাঝেরটা বড় হলঘর—বাংলো প্যাটার্ন বাড়ি বলত ওকে। খোলা বারান্দাও আছে। উঁকি মেরে দেখলুম ফিতের খাট, চেয়ার, টেবিল সবই আছে—বড়ো সরকারী কর্মচারীদের থাকার মতোই বাড়ি—কিন্তু একেবারে খোলা ঢা-ঢা করছে, কোন দরজা জানলাই বন্ধ নেই মেঝেতে আসবাবে ধুলো জমে উঠেছে এক আঙুলের মতো পুরু।

তার মানে অনেককাল কেউ আসেনি, কেউ আসবে বলে মনেও করেনি এর রক্ষক।

হ্যাঁ, রক্ষক একজন থাকার কথা। তাকে বলা হত চৌকিদার। সেই ঘর-দোর ঝাঁট দেবে, খাতায় যাত্রীদের নাম লেখাবে, জল আলোর ব্যবস্থা করবে—এই নিয়ম। অতিথি বা যাত্রী যাই বলো, তারা বললে আর খরচ দিলে বেঁধে দেওয়ারও কথা। এছাড়া এখানে থাকার কথা একজন জমাদারেরও। যে বাথরুম সাফ করবে। তাদের ঘরও পড়ে আছে এক প্রান্তে—সেও খোলা, কোন লোক নেই ; লোক থাকে বলেও মনে হলো না। সেও অমনি পড়ো হয়ে পড়ে আছে, খোলা হা-হা করছে।

তবু 'চৌকিদার' 'চৌকিদার' বলে ডাকলুম অনেকবার।

বেশ চেঁচিয়েই ডাকলুম। পাশে হকিম সাহেবকে দেখা গেল একবার—তাঁকে জিজ্ঞাসা করব কি তিনি সোজা আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অগত্যা মালপত্র ফেলে রেখে যেতে হলো সেই দূরে-দেখা খড়ের ঘরের দিকে। সেখানেও থাকে না চৌকিদার। তবে খবর পাওয়া গেল। সে তখন কার একটা ধান ক্ষেতে মজুরী খাটছে—দৈনিক এগারো পয়সা মজুরীতে। সরকারী মাইনে তো পাবেই, বাড়তি কিছু রোজগার করতে দোষ কি।

শেষ পর্যন্ত চৌকিদারকে পাওয়া গেল। ধমক ধামক করতে, আমি পুলিশে কাজ করি (মিথ্যে কথা, [illegible] উপায় কি?) বলতে সে এল শেষ পর্যন্ত, একটা ঘর ঝাঁট দিয়ে [illegible] আলোয় তেল ঢেলে বিদায় নিলে।

[illegible]

সে [illegible] সেলাম করে বলল, কী হবে হুজুর ভূতের বেগার খেটে, কে বা আসছে [illegible] একটা প্রাণী এলেন—বোধ হচ্ছে গোটা এক মাস পরে।

তা [illegible] যাবার সময় বলে দিলুম, কিন্তু রাত্তিরে তোমাকে এখানে থাকতে হবে। নইলে [illegible] সকালবেলা থানায় গিয়ে রিপোর্ট করব নিজের পরিচয় দিয়ে!

এই [illegible] যক্ষপুরীতে [illegible] একলা থাকলে ঘুম হবে না ভয়ে—সেটা, মুখে যাই বলি, যত সাহসই [illegible] স্বীকার করতে বাধা।

'রিপোর্ট' শব্দটায় তখনও লোকে ভয় পেত। সে আবারও এক লম্বা সেলাম করে বললে, না হুজুর, র‍্যাপোর্ট করতে হবে না, আমি ঠিক আসব। রাত আটটার মধ্যেই এসে হাজির হবো আপনার চরণতলে!

তা এলও লোকটা ঠিক ঠিক। সাড়ে আটটা নাগাদ আমার চরণতলে এসে পৌঁছে গেল। খেয়ে এসেছে বললে, কিন্তু গন্ধে বুঝলুম, সে খাওয়া মানে নেশা করা। এসে একবার মুখটা দেখিয়েই পাশের বড় হলঘরখানায় সেই এক পুরু ধুলোর ওপর পড়ল সটান, আর একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল তার।

তখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, হলঘরের দোর জানলা সব খোলা—গায়েও তার একটা গেঞ্জি ছাড়া কিছু নেই তবু তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটল না।

তার মানে, আমার ভয়ের কারণটা রয়েই গেল। এ লোক আমাকে কি পাহারা দেবে! একা এই প্রায় খোলা ঘরে থাকা—বহুদূরের মধ্যে কোন মানুষ নেই! কিছু বিপদ ঘটলে হাজার চিৎকারেও লোক আসবে না। জানলার গরাদ নেই, ছিটকিনিও তেমন মজবুত নয়। অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত অন্যরকম ব্যবস্থা নিলুম। জানলার পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে বড় বড় ভাড়ি চেয়ার টেবিল টেনে টেনে এনে কপাটে ঠেকিয়ে দিলুম। তিন দিকে দরজা, একটা বাইরের দিকে, আর একটা হলঘরের দিকে। আর একটা বাথরুম। বাইরের দরজায় খাটখানাই ঠেলে লাগালুম। আমাকে না জাগিয়ে কেউ দরজা খুলতে পারবে না।

খাওয়া দাওয়া সন্ধেতেই সেরে এসেছি শহর থেকে। এখানে কিছুই পাবার উপায় নেই। শুধু শুধু একা জেগে বসে থাকি কেন? বেশি আর রাত করলুম না, ভোরে উঠতে হবে, নটা নাগাদই তাই শুয়ে পড়লুম। আলোটা নেভাতে সাহস হলো না। খানিকটা কমিয়ে রাখলুম শুধু। কেরোসিন তেলের গন্ধ হবে ঘরে, তা হোক, শান্তিতে ঘুমুতে পারব তবু। এই অবস্থায় ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে শুতে পারব না।

কিন্তু শান্তিতে ঘুমনো অদৃষ্টে ছিল না।

অল্প বয়স, ভয়-ভয় করলেও শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি, আর সে ঘুমও সহজে ভাঙবার কথা নয়, তবু হঠাৎই কি একটা বিদঘুটে আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

তবু, তখন এত ঘুম, হুঁশ ফিরলেও চোখ খুলতে পারছি না এমনি অবস্থা—তার মধ্যেই আবারও সেই আওয়াজ। মনে হলো কি একটা যেন জন্তু খ্যা খ্যা করে হাসছে।

বাঘটাঘ নয়তো?

শুনেছি হায়নারা অমনি হাসে। হায়না ঘরে ঢুকলো?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। ঘুমও তখন বেশ ভেস্তে গেছে। দেখি শ্রীমান চৌকিদার আমার সামনে বড় টেবিলটায় বসে অমনি বিদ্‌ঘুটে হাসি হাসছে।

অসহ্য রাগ হলো প্রথমটা। তারপরেই ভয়।

দরজা তো একটাও খোলা নেই। যেমন সব বন্ধ ছিল, ভারি আসবাবে ঠেস দেওয়া—তেমনিই আছে। আলোটা শুধু বোধহয় লোকটি বাড়িয়ে দিয়েছে—দেখতে কোন অসুবিধে নেই। তবে লোকটা ঘরে ঢুকল কি করে। হলের দিকের দরজা বন্ধ করে তোলা ছিটকিনি

লাগিয়ে ভারি টেবিলটা ঠেকিয়ে রেখেছিলুম—সে সব তেমনিই আছে, টেবিলের ওপরই ও বসে, তাহলে কোথা দিয়ে এল, কি করে?

বাথরুম দিয়ে?

না, তাও তো বন্ধ। কাঠের ভারি ইজিচেয়ারখানা লাগানো, তার সঙ্গে আমার খাট।

তবে?

এবার লোকটা কথা কইল।

তেমনি আর এক দফা খ্যা খ্যা করে হেসে নিয়ে বলল, আজ্ঞে না বাবুমশাই, দুয়োরটা ঠিক আছে, আমাদের ওসব লাগে না। আমরা এমনিই আসি-যাই। দেখলুম কাল আপনি খুব ভয় পেয়েছেন, তাই একটু রগড় করার জন্যই আরও এলুম। আর বলি, দুটো কথাবাত্তারা কইলে মনে একটু ফুর্তি পাবে!

গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চায় না, তবু অনেক কষ্টে বলি, কিন্তু এলে কোনদিক দিয়ে?

কেন, অসুবিধেটা কি। এই তো দেদার সব খোলা। আপনি তাকিয়ে দ্যাখো কেন্ নাই—

কথা তার মুখেই তখনও, এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস মুখে এসে লাগল। তাকিয়ে দেখি সত্যিই, বাইরের দিকের দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ করছে। অথচ আমার খাট যেমন ছিল তেমনই আছে। হঠাৎ মনে হলো এক ডেলা বরফ আমার গলার মধ্যে দিয়ে নেমে সমস্ত বুকটা অসাড় করে দিল। দেখতে দেখতে সেই শীতের রাত্রেও কপাল ঘেমে উঠল, হাত পা ঠাণ্ডা শুধু নয়, অসাড় বোধ হতে লাগল।

আবারও সেই খ্যা খ্যা হাসি।

না না, বাবুমশায়। ও আপনি কি দেখতে কি দেখেছ, চেয়ে দেখেন নাই কেনে—কপাট আপনার যেমন হুড়কো আঁটা, তেমনিই আছে।

আবারও চাইলুম। অনেক কষ্টে। চাইতেও হলো। দেখি সত্যিই দরজা তেমনি বন্ধ, আমার খাটখানা ঠেস দেওয়া। নেয়ারের খাট, কিন্তু ছত্রি আছে, মাথার দিকে কাজ করা কাঠ খানিকটা। পায়ের তলাতেও রেলিংয়ের মতো, যাকে খাট বলে রীতিমতো তাই, কেবল কাঠের ব্যাটমের বদলে নেয়ারের ফিতে। খাট পুরোদস্তুর ভারি। বাতাসে ঠেলে কপাট খুলে যাবে তা সম্ভব নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কী হচ্ছে?

আমি স্বপ্ন দেখছি এটা, না মাথাই খারাপ হয়ে গেছে!

ভয়ে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না, চিৎকার করে একবার 'চৌকিদার' বলে ডাকতে গেলুম, মুখটা ফাঁক হলো ঐ পর্যন্ত, ডাকা গেল না। মাঝখান থেকে আবার খ্যা খ্যা করে সেই বিদঘুটে হাসি।

বাবুমশাই, চৌকিদারকে ডাকছ কিসের তরে। আমি তো এই সেই মূর্তি এখেনে সটান বসে আছি! সেই আমি, চেয়ে দ্যাখো না।

চেয়ে দেখলুম।

ফলে পাগল হতে যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও আর রইল না বোধ হয়।

সাবেক কালের সাহেব-পছন্দ বাংলো বাড়ি—একতলাই দোতলা সমান উঁচু। আমার ৌকিদারটি তখনও সেই টেবিলেই বসে আছে বটে, তবে তার গলাটা হঠাৎ উঁচু হয়ে মাথাটা ়কেছে ছাদের ভারি কড়িকাঠে। সে লকলকে জিভ বার করে কি যেন সেই কড়িকাঠ থেকে টে চেটে খাচ্ছে। মশা কি পোকা কি মাকড়শা—কে জানে!

এঁ-এঁ—বোধহয় এমনি একটা কান্নার মতো সুর বেরোল আমার গলা দিয়ে। নিজের গলা জেই চিনতে পারি না।

ভয় পেলেন নাকি বাবু, আপনারা শহর বাজারের লোক, কচি বয়েস, লেখাপড়া শিখেছ—খনও ভূতের ভয়। ছোঃ!

বলে আবার এক চোট সেই হাসি।

কিন্তু ততক্ষণে ভরসা করে আধবোজা চোখ মেলে চেয়ে দেখি সেই গলা গুটিয়ে আবার াগের মানুষে পৌঁচেছে। মুখে সেই মস্‌করার হাসি একরকম, যা তার হাসি কথাবার্তার মধ্যে কবারও পালটায়নি। মনে হচ্ছিল যেন ঠোঁটটা কোন অসুখ বিসুখে অমনি বেঁকে গেছে য়ীভাবে।

অভয় দিলেন লোকটি।

না, না, অত ভয় পাবার কোন দরকার নেই। আমি আপনার নফর বটে তো—তাই ঘুমটা তে জমে সেই আমার আহিঙ্কে।

তারপর বলে, আমি বাবু এখেনেই থাকি। দিনে চৌকিদারী করি, মাঠে জন খাটি বটে ন্তু রেতের বেলায় যেন ভূতে পায়। কেমন ইচ্ছে করে বাবু—ভাইদের ভয় দেখাই। কিন্তুক হেব সুবো কি তাদের মেম এলে আমি একেবারে ভাল ছেলে, কিচ্ছুটি করি না। ওরা বড় াঁয়ার বাবুমশাই, ভয় পেলে দেবে গোটা বাড়িটা ভেঙে, অন্য কোথাও বাড়ি করবে। ভাঙবে ংবা আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেবে. আমি যাবো কোথায় বলো!

তারপর একটা হাই তোলার শব্দ করে বললে, নাও এবার নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোও, আমি ার জ্বালাবো না। এই দ্যাখো না, ফুসমন্তরের চোটে তোমার ভূতকে হুশ করে উড়িয়ে চ্ছি!

বলতে বলতেই দুমদাম হড়হড় ছড়ছড় কতকগুলো শব্দ, লণ্ঠনের আলোটা যেন চমকে ঠে নিভে গেল, সেই অন্ধকারেই দেখি—ঘরের সবকটা দরজা জানলা খোলা, তার মধ্যে য়ে হু হু করে শীতের হিম বাতাস ঢুকছে। যেসব চেয়ার টেবিল ঠেস দেওয়া ছিল, তা বোধহয় জেরাই যে যার জায়গায় সরে এসেছে—আর কিছু দেখতে পারলুম না।

আর কিছু মনেও নেই। সবটা যেন একাকার অন্ধকার হয়ে গেল, চোখে তো বটেই, থাতেও।

কতক্ষণ এমনি অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। কিছুই মনে নেই।

জ্ঞান হলো বেশ যেন স্বাভাবিক পরিবেশেই।

কথাটা বলছি বটে, তবে এসব পরে মনে হয়েছে।

কী হয়েছিল, কী দেখেছি, কিছু দেখেছি কিনা—তাও তো ভাবিনি। ভাববার মতো কিছু াছে কিনা তাই বা ভাবব কেন্ন।

যেমন শুয়েছিলুম তেমনিই আছি। হ্যারিকেনটা সেই এককোণে তেমনি জ্বলছে, যেম কমিয়ে রেখে শুয়েছি। দরজা কপাট বন্ধ, চেয়ার টেবিল ঠেকানো।

না, সব ঠিক আছে।

তবু, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে কেন?

যেন শরীরটাও ভাল লাগছে না। দুর্বল দুর্বল লাগছে। মাথাটাও ঝিমঝিম করছে।

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল সব ঘটনাটা।

ওঃ ; কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

স্বপ্ন নিশ্চয়ই। এমন স্বপ্নও মানুষ দেখে!

এত জিনিস থাকতে আমিই বা এমন স্বপ্ন দেখতে গেলুম কেন?

যাক গে, স্বপ্নের ওপর দিয়ে গেছে, সেই ভাল। এখনও রাত অনেক আছে। ঘুমুই একটু—

পাশ ফিরে কম্বলটা গায়ে টানতে যাবো, দূরে—বোধহয় থানা থেকেই—পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজার শব্দ কানে এল। সস্তাদামের পুরনো ঘড়িটা হাতে ছিল, ওটা রোজ খানিকটা করে এগিয়ে থাকে, হ্যারিকেনের আলোতে চেয়ে দেখি সে ঘড়িতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে।

তার মানে ভোর হয়ে গেছে। আজ সাতটার গাড়ি ধরে দাঁইহাট ওকড়শা যাবো কথা আছে—আর ঘুমনো চলবে না।

প্রচণ্ড শব্দ করে একটা হাই (ইচ্ছে করেই অত বড় শব্দ করা, বুকে বল আনার জন্যে) উঠে পড়লুম। আলোটা বাড়িয়ে টেবিলের ওপর তুললুম। এতক্ষণে ঘরটা 'মানুষের মতো' মনে হলো একটু।

আচ্ছা, এতক্ষণ ঘুমোলুম কি করে? সেই তো সাড়ে আটটায় শুয়েছি।

স্বপ্ন দেখে অজ্ঞান হয়ে যাইনি তো?

কথাটা যত ভাবি ততই মনে হয় তেমনিই একটা কিছু ঘটেছিল।

বাথরুম যাওয়া দরকার। ঠিক যেন সাহস হচ্ছে না।

এবার আমিই হড়হড় করে টেবিলটা সরিয়ে এক ঝটকায় মাঝের দরজাটা খুলে ফেললুম।

লোকটা বোধহয় ঘরের দরজাও দেয়নি।

দরজা খুলতেই গুচ্ছের ঠাণ্ডা হাওয়া, সেই সঙ্গে কাক ও অন্যান্য পাখির ডাক। মানে সত্যিই সকাল হয়েছে। বুকে ভরসা এলো একটু, বেশ চড়া গলায় ডাকলুম, চৌকিদার! এই চৌকিদার!

কোথায় কে। আসলে নেশা করে ঘুমোয় তো, ঘুম ভাঙ্গে না।

আলোটা নিয়ে ঘরে ঢুকলুম (তখনও টর্চের চল হয়নি তত)।

কোথায় কে। কারও চিহ্নমাত্র নেই।

'চিহ্ন' কথাটা সহজভাবে বলছি না। সত্যিই কোন চিহ্ন নেই। মানে, অত পুরু ধুলো, তার ওপর যদি একটা মানুষ এসে শোয়—তার পায়ের ছাপ, ধুলোর ওপর শুলে মানুষ-সমান দাগ —এটা পড়বে তো! তেমন কোন ছাপ বা দাগ নেই, মাসখানেক কি আরও বেশি দিনের পড়া ধুলো নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। কোন প্রাণীই তাদের সে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায়নি।

এর মানে! এর মানে কি! এর মানে আমি জানতে চাই!

পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে সেই আলো হাতে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

বেরোতেই দেখি শ্রীমান চৌকিদার—অনন্ত পাডুই আসছে এদিকে।

ততক্ষণে বেশ একটু ফরসা হয়েছে। গঙ্গার ধার থেকে হাড় কাঁপানো হাওয়া আসছে, পাশের বাড়ির হাকিম সাহেবের উনুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল করে—সহজ স্বাভাবিক জীবনের লক্ষণ।

অন্তত তার অভ্যাসমতো ঘটা করে নমস্কার করল একটা, মশাই কি চান করবেন সকালে? ঘটিকা জল লাগবে? না গরম করতে হবে? চা খাবেন নাকি, সে তাহলে আমার ঘর থেকে করে নিয়ে আসতে হবে, এখানে তেমন কোন যোগাড় নাই।

আমি বোমার মত ফেটে পড়লুম প্রায়, তুমি কাল রাত্তিরে শুতে আসনি কেন! বেইমান, বদমাইশ ; স্কাউন্ড্রেল।

এত গালাগালে সে চটল না। তখনকার দিনে (আমি বলছি ১৯৩০/৩১ সালের কথা) চটত না। কিন্তু অবাক হয়ে গেল যে সেটা তার মুখ দেখেই বুঝলুম।

আজ্ঞে বাবু আমার ওপর আপনি রাগ করছ, কিন্তু আমার ঘরের মেয়েরা বললে আপনি গিয়ে তাদের মানা করে এসেছ। বলেছ যে, আর ওকে কষ্ট করে যেতে হবে না। তবে ভোরে যেন যায়, জল লাগবে।

এবার আমার অবাক হবার পালা।

আমি মানা করে এসেছি? আমি?

হ্যাঁ বাবু, মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি, আমার বৌ মা দুজনাই বললে!

ভয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল অনন্ত।

আমারও মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ততক্ষণে। বললুম, ভেতরে এসো তো একটা কথা বলি তোমাকে।

সে কাঁপতে কাঁপতে—শীতে বা ভয়ে—ভেতরে এল, কিন্তু আমার সামনে বসতে রাজি হলো না।

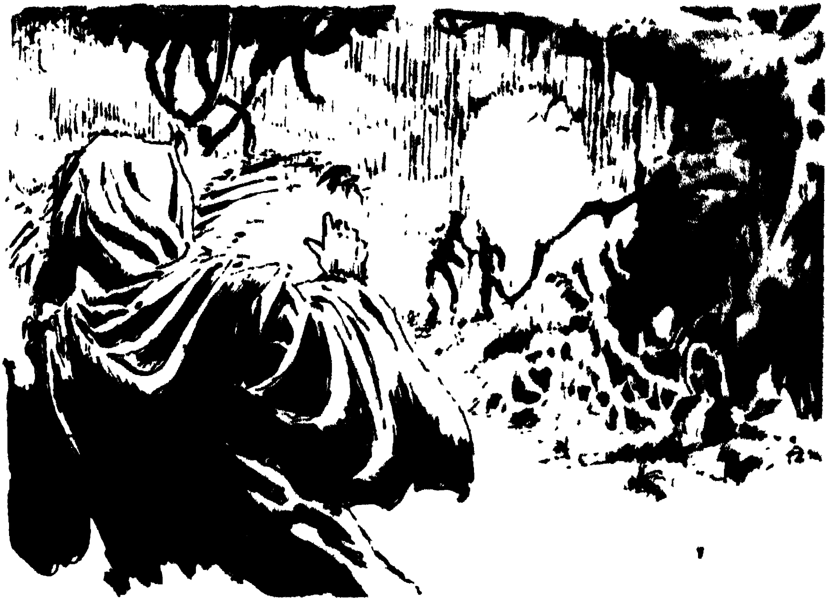
বললুম তাকে কথাগুলো, ভয় পেয়েছি সেটা জানাতে লজ্জা করছিল খুব কিন্তু না বলেও উপায় নেই।

সে সব শুনে হাত তুলে একটা নমস্কার করল, তারপর তিন দফা নাক-কান মলে বলল, হ্যাঁ বাবু, তিনি আছেন। তবে এদান্তে বড় একটা ইসব মসকরা করেন নাই অনেকদিন, তাই আপনাকে কিছু বলিনি। অনেকদিনের কথা বাবু, এখেনে এক চৌকিদার ছিল বীরু ভশ্চায্ বলে,

বামুনের ছেলে, লেখাপড়া শেখে নাই, তাই এ কাজ করতে এয়েছিল। তাকে এক ইদিশ অপিচার একদিন তুশ্চু কারণে জুতো সুদ্ধ লাথি মেরেছিল। সে অপিচার জেতে ছোট, তাতে কি ঘেন্না হলো, ভশ্‌চায্‌ রেতে উই ওধারের যে বটগাছটা দেখছ—শ্মশানের উপুব—ওইখা পরনের ধুতি বেঁধে গলায় দড়ি দিল। তার কেউ ছিল না। ছেলেমানুষ বৌ, কে আর গয়া-ট করবে বলো। সেই থেকে বেম্মদত্যি হয়ে ঐ গাছেই আছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ক্ষেপে গি অমনিতারা করে, তবে সায়েব মশাইদের কিছু বলে না, যত চোট ইদিশী অপিচারদের উপু তবে বাবু, আপনার ফাঁড়া কেটে গিয়েছে—পেরানে মারে না কাউকে, কারুক্ষে দোসরা বার ভয় দেখায় না। এবার আপনি নিশ্চিন্তি হয়ে থাকো।

আমি কিন্তু অত নিশ্চিন্তি হতে পারিনি, সেই দিনই দিন-থাকতে বিদায় নিয়েছিলাম। [





এখানে মৃত্যুর হাওয়া

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রাত ক'টা হল শিবেন?

বঙ্কিম কথাটা—মানে প্রশ্নটা করল বটে শিবেনকে, কিন্তু মনে হল যেন তার গলা দিয়ে স্বাভাবিক স্বরটা বেরোল না।

কেমন যেন চাপা একটা ফিসফিসানির মত গলার আওয়াজটা বঙ্কিমের মনে হল।

ঘরের কোণে ফায়ারপ্লেসের আগুনটা ঝিমিয়ে এসেছে, কেবল রক্তাভা ফায়ারপ্লেসের দেওয়ালে ছড়িয়ে আছে।

বাইরে হিম-ঝরা রাত্রি। সঙ্গে কনকনে বরফের চাবুকের মত হাওয়া। ঘরের ভেতরের বাতাসে কিন্তু একটা উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে।

ঘরের টেবিল ল্যাম্পটায় তো ধনবাহাদুর যথেষ্ট তেল ভরে দিয়ে বলেছিল, সারি রাত বাত্তি জ্বলেগি সাব—

অনেক কষ্টে টেবিল ল্যাম্পটা শেষ পর্যন্ত জোগাড় করে এনেছিল। কারণ বাড়িটায় ইলেকট্রিক কানেকশান ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটায় কেউ থাকে নি বলে ইলেকট্রিক কানেকশান কেটে দেওয়া হয়েছিল।

অথচ একটা আলোর ব্যবস্থা না হলে রাত্রিবাসই বা কি করে করা যাবে?

ঘরগুলোও তেমন পরিষ্কার বাসোপযোগী ছিল না।

ধনবাহাদুর বলেছিল, তিন সাল এ কোঠি খালি পড়া হ্যায় সাব। হামারা সাব আনে সে ভি হোটেলমে রহতা হ্যায়, উসি লিয়ে—

বিরূপাক্ষ বলেছিল, ঠিক হ্যায়—ঠিক হ্যায় ধনবাহাদুর, তোম হামলোগনকে লিয়ে স্রিফ একঠো কামরা সাফ কর্ দেও।

লেকেন বিস্তারা তো নেহি হ্যায়, কম্বলভি নেহি হ্যায়! এতনা ঠাণ্ডি রাত—আপলোগন রহিয়েগা কেইসে?

ফিকর মাৎ করো ; হামলোগনকে সাথ বিস্তারা-কম্বল হ্যায়।

বড় বেডরুমটা তখন ধনবাহাদুর সাফ করে দিয়েছিল—দুটো খাটিয়া পাশাপাশি পেতে শয়নের ব্যবস্থা হয়েছিল—খাটে কেবল মাত্র কয়ারের গদি ছিল, সেই গদিই সাফ করে ধুলো ঝেড়ে বিছানা পাতা হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে দার্জিলিং 'কেবল' করে আমাকে শুধিয়েছিল, শিশির, দু-দিনের জন্য দার্জিলিং-এ যাব। যাবি?

হঠাৎ এই পৌষ মাসের শীতে দার্জিলিং? ঠাণ্ডায় যে জমে যাবি!

শীতের সময়ই তো শীতের দেশে যেতে হয়।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ। শীতটাকে তাহলে পুরোপুরি উপভোগ করা যায়। যাবি তো বল—

সত্যি ব্যাপারটা কি বল তো? এই সময় দার্জিলিং—

ব্যাপার আবার কি, স্রেফ একটা অভিজ্ঞতা অর্জন।

বলাই বাহুল্য বিরূপাক্ষর কথা আমি বিশ্বাস করি নি। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে দার্জিলিং চলেছে এই সময় বুঝেছিলাম কিন্তু জানতাম সে-উদ্দেশ্য সে ব্যক্ত করবে না। তবে এও বুঝেছিলাম, নির্ঘাৎ কোন রহস্যের হাতছানি আছে ; তাই রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য দুই বন্ধু শিবেন এবং বঙ্কিমও যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

প্লেনটা লেট ছিল। বাগডোগরা থেকে ট্যাক্সিতে যখন দার্জিলিং এসে পৌঁছলাম, সন্ধ্যা তখন আসন্ন প্রায়।

শৈলপুরীতে পৌষের এক কনকনে শীতের রাত্রি নামছে।

হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটা যে কোন এক অজ্ঞাত রহস্যের হাতছানি—বুঝলাম যখন কার্ট রোড ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমাদের ট্যাক্সিটা একটা ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বললাম, এ কোথায় এলি বিরূ, বাড়িটা যে পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে! haunted house!

জ্বলন্ত চার্মিনারে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বিরূপাক্ষ জবাব দেয়, বল তো, সত্যিই কি এখানে মৃত্যুর হাওয়া বইছে না?

মানে? বঙ্কিম শুধোল।

মানে সত্যিই নাকি এখানে রাত্রি নিশীথে মৃত্যুর হাওয়া বয়।

বঙ্কিম আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যেমন বিরাট চেহারা, তেমনি খায় প্রায় চারজনের খাদ্য। বুদ্ধিটাও আকার সদৃশ, আর ভয়ও তেমনি—যাকে বলে রীতিমত ভীতু।

বঙ্কিমের আরো একটা গুণ আছে—অত্যন্ত সরল প্রকৃতির বলে যে যা বলে, তাই বিশ্বাস করে নেয়।

শিবেন ঠিক উল্টো। রোগা লিকলিকে চেহারা, ভয়-ডর কিছু নেই, মারামারিতে সিদ্ধহস্ত আর আহার পাখির আহার। আমার এবং বিরূপাক্ষ সেনের পরিচয় তো সকলেরই জানা আছে, কারো কাছে নতুন নয়।

সন্ধ্যার কনকনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, দূরে কালো আকাশপটে শহরের দীপালোকমালা জোনাকির মত জ্বলছে। ট্যাক্সিওয়ালা কোন মতে আমাদের মালপত্র নামিয়ে দিয়েই ভাড়া নিয়ে কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল! ঠিক চলে গেল বললে ভুল হবে—মনে হল যেন পালিয়ে বাঁচল।

ডাকাডাকি করতে করতে ওই বাড়ির কেয়ার-টেকার ধনবাহাদুর একটা টর্চ হাতে সামনে এসে দাঁড়াল।

কলকত্তাসে আপলোগন আতা হ্যায় সাব?

হ্যাঁ। বিরূপাক্ষ বললে, তোমার সাহেবের চিঠি পাও নি?

জী। লেকেন এহি কোঠিমে আপলোগন রহিয়েগা?

হ্যাঁ।

লেকেন সাব—

কেয়া বাৎ হ্যায়?

তিন সাল হো গিয়া এ কোঠি খালি পড়া হ্যায়।

ঠিক হ্যায়, চল অন্দর—

লেকেন সাব, ইলেকট্রিক কনেকশন তো নেহি হ্যায়!

একঠো বাত্তি মিলেগা তো?

তা মিল সেকতা।

তারপর ধনবাহাদুরই সব ব্যবস্থা করে রাত পৌনে আটটা নাগাদ চলে গিয়েছিল। রাত ন'টায় হোটেল থেকে খাবার পৌঁছে দিয়ে, ফের পরের দিন সকালে আসবে বলে বিদায় নিয়েছিল।

রহস্যের কিছুটা উন্মোচন করল বিরূপাক্ষ রাত দশটায়—আহারাদির পর।

জানিস শিশির, তোর সিনেমার একটা চমৎকার প্লট হয়তো পেয়ে যাবি এখানে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। এ বাড়িটা সুবীরের বাবা কিনেছিলেন এক মেমসাহেবের কাছ থেকে। তারপর রিনোভেট করে কিছুদিন ছিলেন—

তারপর?

কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় চলে যান মাসখানেক বাদে। কলকাতায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর বছর চারেক খালিই পড়ে ছিল বাড়িটা। বছর তিনেক আগে সুবীর দিন দশেকের জন্যে আসে এখানে থাকবার জন্যে। কিন্তু পারল না থাকতে, পরের দিনই চম্পট দিল। তারপর থেকে এ বাড়ি খালিই পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে সুবীরের দু-একজন বন্ধু এসেছে কিন্তু এক রাত্রির বেশি এখানে কেউ কাটাতে পারে নি।

কেন?

ওই যে বললাম, এখানে মৃত্যুর হাওয়া—

পরিষ্কার করে বল। বললাম।

রাত্রে নাকি—মানে রাত ঠিক একটায় নাকি এক বস্ত্রাবৃতা রহস্যময়ী নারীর আবির্ভাব ঘটে।

বঙ্কিম বললে, সত্যি বলছিস বিরূ?

তবে কি মিথ্যে? আর মিথ্যে যে নয়, সেটা তো রাত ঠিক একটা বাজলেই জানতে পারবি।

বঙ্কিম আমার পাশে একটু সরে এল।

আমার আসার কারণ, সেই রহস্যময়ী বস্ত্রাবৃতা নারীর সঙ্গে মোলাকাৎটা যদি হয়ে যায়—

বললাম, তুই বিশ্বাস করিস?

কেন করব না, তোর মত নাস্তিক তো আমি নই! বিরূপাক্ষ বললে।

রাত কটা হল শিবেন?

আবার বঙ্কিমের কাঁপা কাঁপা প্রায়-বুজে আসা গলার প্রশ্ন।

আশ্চর্য! ঘরের আলোটা যেন নিভে আসছে ধীরে ধীরে। অথচ ধনবাহাদুর তো বলেছিল বাতিতে তেল ভর্তি, সারারাত জ্বলবে!

শিবেন তার রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির ডায়ালের দিকে চেয়ে বললে, একটা বাজতে আর ঠিক দশ মিনিট আছে—

মা—মাত্র দশ মিনিট! বঙ্কিমের গলার স্বরটা যেন প্রায় বুজেই আসে। বিরূপাক্ষর গলা শোনা গেল ঃ শিশির, এবার তাহলে সেই রহস্যময়ী আসছেন—

জানালা-দরজা সব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেন একটা প্রচণ্ড শৈত্য অনুভব করছিলাম আমরা।

বা—বাতিটা যে নিভে যাচ্ছে শিশির! বঙ্কিম আবার বললে।

বিরূপাক্ষ বললে, বাতি তো একদিন—এক সময়ে নিভবেই! নেভার জন্যই তো জ্বলা।

বঙ্কিমের গলা আবার শোনা গেল ঃ দরজা-জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ হয়েছিল তো শিশির?

আমি মৃদু হেসে বললাম, সব তো তুই নিজের হাতেই বন্ধ করেছিস ধনবাহাদুর চলে যাবার পর।

হ্যাঁ, তা তো করেছিলাম—

তবে?

যদি না বন্ধ হয়ে থাকে ঠিক ঠিক—

বঙ্কিমের কথা শেষ হল না, সহসা দড়াম করে যেন একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে যেন ছুটে এল অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

বাতিটাও সেই মুহূর্তে বার দুই কেঁপে দপ্ করে নিভে গেল। বরফের মতই একটা ঠাণ্ডা কঠিন স্তব্ধতা। কোন শব্দ নেই।

আবছা আবছা অন্ধকারে কেবল দেখতে পাচ্ছি, একটু আগে খুলে যাওয়া দরজার পাল্লা দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে এদিক-ওদিক করছে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ হল বিরূপাক্ষর কণ্ঠস্বরে ঃ যেই এসে থাকুন, ঘরে আসুন। ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিন, বেজায় ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—

কোন সাড়া নেই কারো।

বিরূপাক্ষ পুনরাবৃত্তি করল তার কথাটার।

দরজাটা তেমনি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে এদিক ওদিক করছে।

বিরূপাক্ষ উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আবার ফিরে এসে বসল। দু' মিনিটও গেল না, খুট করে একটা শব্দ......আবার দড়াম করে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। মনে হল, কেউ যেন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

এই মাঝরাত্রে রসিকতা করছেন কেন? ভেতরে আসতে হয়, আসুন।

কারো কোন সাড়া নেই।

বিরূপাক্ষ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এবারে উঠে পড়ল। হাতের টর্চটা নিয়ে বাইরে চলে গেল। মিনিট পনের বাদে ফিরে এল, না, কেউ নেই।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল বিরূপাক্ষ।

বাকি রাত আর দরজা খুলল না।

ভোর হতেই আমি আর বিরূপাক্ষ বের হলাম। বাইরে সবে আলো ফুটেছে। হঠাৎ বারান্দার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিরূপাক্ষ ঃ শিশির, দেখ!

কি?

রেখে গেছে দেখ পদচিহ্ন।

সত্যিই তো! সারা বারান্দায় পায়ের ছাপ। পায়ের নয়, জুতোর ছাপ। অনেকগুলো। মনে হয়, কোন লাল ভিজে মাটির ওপর দিয়ে জুতো পায়ে কেউ এসে বারান্দায় জুতোর ছাপ ফেলে গেছে।

এ যে দেখছি, জুতোর ছাপ! বললাম।

হ্যাঁ। তাহলে কাল রাত্রে কেউ এসেছিল। কারণ যে রকম জুতোর ছাপ পড়েছে, আমাদের কারো পায়ে ওই ধরনের জুতো নেই। অর্থাৎ—

কি অর্থাৎ? প্রশ্ন করলাম।

কোন অশরীরী নয়—রীতিমত শরীরী। বিরূপাক্ষ বললে।

সারাটা দুপুর বিরূপাক্ষ বাড়িটার আশেপাশে ঘুরেই বেড়াল। বঙ্কিম ভোর হতেই চলে গেছে হোটেলে। আমরা তিনজন আছি।

ধনবাহাদুরকে দিয়ে নিজে সামনে বসে বাতিতে তেল ভরালো বিরূপাক্ষ। এবং সন্ধ্যার পর নিজের হাতে আলোটা জ্বালাল।

কিন্তু রাত ঠিক একটায় আগের রাত্রের মতই দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে বয়ে এল ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা।

বিরূপাক্ষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। প্রস্তুত হয়েই ছিল। বুঝলাম, টর্চটা হাতে ঘর থেকে একপ্রকার যেন ছুটেই বের হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এল। দরজায় ধাক্কা দিতে আমরা দরজা খুলে দিলাম। বিরূপাক্ষর ফিরতে দেরি দেখে আমরা দরজা আবার বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

কি হল? কিছু পেলি?

না। বসতে বসতে বললে বিরূপাক্ষ, ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।

তারপর ঘণ্টা দুই বিরূপাক্ষ গোটা বারো সিগারেট ধ্বংস করল—চার্মিনার। বুঝলাম, গভীরভাবে কিছু সে ভাবছে।

অশরীরী বা প্রেত আমিও কখনো বিশ্বাস করি না। তাই ব্যাপারটা কি ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

বলা বাহুল্য, তৃতীয় রাত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এবং বিরূপাক্ষ দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বাইরে চলে গেল। ফিরে এল ঘণ্টা দুই বাদে। আমরা দরজা খুলে দিলাম।

ব্যাপারটা কি, কিছু বুঝতে পারছিস, বিরূ?—আমিই দুপুরে একসময় শুধাই।

একেবারে যে বুঝি নি, তা নয়। তবে...

তবে?

পরিষ্কার হয়েও, যেন একটা জায়গায় এসে পরিষ্কার হচ্ছে না। চল শিশির। বাড়ির পেছনের বাগানটা দেখা হয়নি। একবাব ঘুরে আসি—

দুজনে বের হয়ে পড়লাম।

শিবেন ঘুমচ্ছিল।

বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে বাগান। ফল-ফুলের গাছ একদা ছিল, এখন আর নেই। এখন কেবল চোখে পড়ে আগাছা—ফার্ন জাতীয় কিছু...গোটা চারেক ইউক্যালিপটাস গাছ...আর এখানে ওখানে খোঁড়া।

কে যেন সারা বাগানটা খুঁড়ে বেড়িয়েছে।

বিরূপাক্ষ কেমন যেন অন্যমনস্ক।

বললাম, কি ভাবছিস?

কিছু না। চল।

ফিরে এলাম ঘরে দুজনে।

সন্ধ্যার দিকে কথা হচ্ছিল। বিরূপাক্ষ বলছিল, তিন রাত ধরে কেবল দরজাই খুলল। বস্ত্রাবৃতা রহস্যময়ীর তো কোন দর্শন পাওয়া গেল না। অথচ শুনেছিলাম সুবীরের মুখে, কোন এক বস্ত্রাবৃতা রহস্যময়ীর আবির্ভাব ঘটে প্রতি নিশিরাত্রে এই বাড়িটায়। দেখা দিতে মনে হচ্ছে যেন সরম হচ্ছে রহস্যময়ীর।

যা হোক, এল আবার চতুর্থ রাত্রি।

আর ঠিক রাত একটায়—

দড়াম করে খুলে গেল দরজার পাল্লা দুটো, যেন প্রবল এক ধাক্কায়। তারপরই ওকি—সামনে দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে—সত্যিই তো, বস্ত্রাবৃতা এক নারী!

ঘরের মধ্যে আলোর শিখাটা কমানো থাকায়, একটা আবছা আলোকআঁধারী যেন থমথম করছে।

তুমি যেই হও, সামনে এস—নিজেকে উন্মোচন কর, নচেৎ গুলি চালাব!—বিরূপাক্ষ বললে।

কোন সাড়া নেই। মূর্তি স্থির অকম্পিত।

চার গুণব—তারপরই কিন্তু গুলি চালাব। এক—দুই—তিন—চা—চাব। সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রাবৃতা রহস্যময়ী অপসৃত—চক্ষের নিমেষে যেন সাঁৎ করে ওপরে উঠে গেল। কেউ দরজার সামনে নেই। পাল্লা দুটো কেবল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করছে, আর সেই সঙ্গে ঘড়ঘড় একটা শব্দ মাথার ওপরে। মনে হল, সবটাই কি দেখার ভুল—দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র! না স্বপ্ন। কিন্তু শব্দটা?

বাইরে ততক্ষণে ছুটে বিরূপাক্ষ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি বাতির শিখাটা বাড়িয়ে দিলাম। শিবেন হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

অলৌকিক কিছু কোনদিন বিশ্বাস করতে মন চাইলেও, সত্যি বলতে কি, বিশ্বাস তো করি নি আজ পর্যন্ত। কিন্তু ক্ষণপূর্বে জাগ্রতাবস্থায় যা দেখলাম, সেটা কি সত্যিই কোন কিছু অলৌকিক একটা ব্যাপার?

শিশির—

শিবেনের ডাকে ফিরে তাকালম।

কিছু বলছিস শিবেন?

তুই দেখেছিস?

হ্যাঁ।

আমার মনে হয়, এখানে আর থাকা আমাদের হয়তো উচিত হবে না। কি জবাব দেব শিবেনের কথায়, সত্যিই যেন বুঝতে পারি না।

সত্যি, যা এইমাত্র চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলাম, সেটাকে অস্বীকার করিই বা কি করে?

ঘণ্টাখানেক বাদে বিরূপাক্ষ ফিরে এল ঘরে।

আজ আর তাকে কোন প্রশ্ন করলাম না।

৩

বেলা সাতটা নাগাদ সকালে ধনবাহাদুর এল।

বাহাদুর!

জী।

চা'কা পানী হুয়া?

আভি লাতা হুঁ সাব। সাব্—

কেয়া হুয়া? শুধালাম।

আপলোগনকো ডর নেই লাগতা তো?

নেহি তো!

বাহাদুর চলে গেল।

বিরূপাক্ষ চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল। সে যেন রীতিমত চিন্তান্বিত।

আধঘণ্টা পরে বাহাদুর চা নিয়ে এল। চা, টোস্ট ও ডিমসিদ্ধ।

বাহাদুর!

বিরূপাক্ষর ডাকে বাহাদুর সাড়া দিল...ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল...ট্রে'টা নামিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়িয়ে ঃ জী!

একঠো মই মিলে গা?

মই। উ কেয়া হ্যায় সাব?

বাঁশের সিঁড়ি।

ইধার মই কেইসে মিলেগা।

বিরূপাক্ষ আর কোন কথা বলল না।

আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ বিরূপাক্ষ বের হয়ে গেল। ফিরল বেলা দশটার পর—সঙ্গে একটা নেপালী কুলী, তার কাঁধে একটা কাঠের মই। কিছু পেরেক আর একটা হাতুড়ি।

বললাম, মই দিয়ে কি হবে রে, বিরূ? আর ওই হাতুড়ি—পেরেক?

স্বর্গে যাব। বিরূপাক্ষ বললে, যাবি? আর হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকব।

কোথায়?

স্বর্গের দরজায়।—তারপরই মৃদু হেসে বললে, তোর গল্পের খোরাক জোগাড় করতে। এবার মনে হচ্ছে, তোর ছবির কাহিনীটা সত্যিই thrilling—রীতিমত রোমাঞ্চকর হবে।

আমি কোন কথা বললাম না।

বাহাদুরকে ডেকে বিরূপাক্ষ টাকা দিয়ে বাজারে পাঠাল, এক ঝুড়ি কমলা লেবু, কিছু এলাচ ও গোটা তিনেক মুরগীর জন্য।

বাহাদুর চলে যাবার মিনিট কুড়ি পরেই বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল ঃ চল শিশির।

কোথায়?

আয় না!

বাড়ির পেছনে এলাম। বিরূপাক্ষ মইটা নিয়ে এল সঙ্গে। মই লাগিয়ে প্রথমে বিরূপাক্ষ ও পরে আমি ছাদে উঠলাম।

ছাদটা বেশ পরিষ্কার, কোন ময়লা-টয়লা নেই—কেবল একধারে একটা ড্রাম উপুর করা পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ ছাদে ঘুরে বেড়ালো। তারপরই একটা মোটা তার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়ল আমাদের। ছাদের এক জায়গায় একটা কাঠের তক্তা পাতা। সেটা সরাতেই একটা গর্ত চোখে পড়ল।

এখানে এই গর্তটা কিসের, ছাদে? প্রশ্ন করলাম আমিই।

অশরীরীর যাতায়াতের পথ।—বিরূপাক্ষ বললে।

তারপরই এগিয়ে গিয়ে ড্রামটা উল্টে দিল বিরূপাক্ষ।

ড্রামটা শূন্য। কি যেন কিছুক্ষণ ভাবল বিরূপাক্ষ। তারপর বললে, চল। নিচে নেমে মইটা এনে আমাদের ঘরের খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল।

দেখতে দেখতে আবার রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল শৈলপুরীতে।

মনে মনে যতই ব্যাপারটা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি না কেন, মনের কোণে একটা কিন্তু কিন্তু তখনো থেকেই গিয়েছে।

বাহাদুর রান্না করে দিয়ে চলে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। বিরূপাক্ষ তার চেয়ারে বসে একটা চার্মিনার ধরিয়ে টানছিল।

হঠাৎ বিরূপাক্ষ বললে, অদ্যই এখানে শেষ রজনী আমাদের, শিশির।

মানে?

কাল চলে যাব।

চলে যাবি?

হ্যাঁ।

বাইরের দরজায় নক পড়ল।

বিরূপাক্ষ বললে, সুবীর এল বোধ হয়, দরজাটা খুলে দে শিশির।

সত্যিই, সুবীর হাজরা—বিরূপাক্ষর বন্ধু। যার ওই ভূতুড়ে বাড়ি।

হঠাৎ কি ব্যাপার রে, জরুরি ট্রাঙ্ককল করে নিয়ে এলি? সুবীর বসতে বসতে বললে।

বোস সুবীর।

সুবীর বসল।

তোর বাবা বিশ্বম্ভর হাজরার কোন গুপ্তধন এখানে লুকোন ছিল।

সত্যি বলছিস!

হ্যাঁ। আর তাঁর মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয়। তবে—

কি তবে?

হয়তো তিনি এ বাড়িরই কোথাও সেসব লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সেসব তুই পাবি কিনা জানি না। সত্যিই তোর বাবার সেরকম কিছু ছিল নাকি? আমার যেন ধারণা—

তা জানি না ভাই। তবে—

কি?

বাবা স্মাগলিং করতেন।—কথাটা বলতে বলতে সুবীর হাজরা মাথা নিচু করল।

স্মাগলিং?

হ্যাঁ। তাঁর মৃত্যুর পর জানতে পারি।

কেমন করে?

মা'র মুখ থেকে।

হুঁ! তাহলে তো দুয়ে দুয়ে চার মিলেই যাচ্ছে। স্মাগলিং ও অশরীরী।

বিরূপাক্ষ বললে।

বাইরে বেশ রাত্রি তখন ঘনিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা হিমশীতল রাত্রি।

বিরূপাক্ষ আর কিন্তু কিছু বলল না। সিগারেট টানতে লাগল—কটুগন্ধী চার্মিনার।

হঠাৎ আবার বিরূপাক্ষর প্রশ্ন, সুবীর, বাহাদুর এখানে কতদিন আছে?

তা বছর আষ্টেক।—সুবীর বললে।

তোর বাবা মারা গেছেন কবে?

বছর চারেক—হ্যাঁ...চার বছর। আচ্ছা, বিরূ—

কি?

তখন তো ফোনে কিছু বললি না! কিছু, সত্যিই দেখেছিস, এ বাড়িতে?

দেখেছি।

কি? বস্ত্রাবৃত—

দেখেছি।

রাত ঠিক একটা।

আজ কিন্তু দড়াম করে দরজাটা খুলল না। বিরূপাক্ষ দরজার খিলটা রাত্রে পেরেক ঠুকে এঁটে দিয়েছিল ভেতর থেকে।

দরজা না খুললেও সবাই বসে আছি চরম কিছুর প্রতীক্ষায়। একটু পরে—

হঠাৎ গত রাত্রের মত ছাদে ঘড়ঘড় শব্দ শোনা যেতে লাগল। কিছু যেন গড়িয়ে ছাদের একধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত—

তারপরই সেই বস্ত্রাবৃত অশরীরীর আবির্ভাব ঘরে।

হঠাৎ ছুটে গিয়ে বিরূপাক্ষ সেটা জাপটে ধরল। তারপরই টানাটানি।

শিশির, কুইক! ধর—এটা কার!

ছুটে গেলাম আমিও। একটা কাপড়—দু-হাতে জাপটে ধরলাম!

বেশ শক্ত করে ধরে থাক।—বলে বিরূপাক্ষ দরজার পেরেক হাতুড়ির মাথা দিয়ে টেনে খুলে ফেলে, দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কাপড়টা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। মনে হল ছিঁড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। তারপরই পরপর দুটো গুলির আওয়াজ রাত্রির স্তব্ধতাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল।

সবিস্ময়ে দেখি তার একপ্রান্তে একটা তার জড়ানো।

আমি তো সত্যি বলতে কি রীতিমত হতভম্ব।

৪

পরের দিন হোটেলের ঘরে।

আমাদের সেদিন যাওয়া হয় নি। পরের দিন সকালের প্লেনে যাব।

ঘরের মধ্যে আমি, বিরূপাক্ষ, সুবীর হাজরা ও শিবেন।

বিরূপাক্ষ বলছিল, ব্যাপারটার মধ্যে যে কোন ভৌতিক বা অলৌকিক কিছু নেই, সেটা আমি প্রথমেই অনুমান করেছিলাম। আমি অনুমান করেছিলাম, সবটাই কোন এক জীবন্ত মানুষের কাজ।

তোর বাবার হাতে সত্যি কিছু চোরা কারবারের ব্ল্যাক মানি ছিল সুবীর। এবং সেসব তিনি হয়তো এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত বাহাদুর সেটা জানতে পেরে গিয়েছিল।

বাহাদুরকে তো ধরতে পারলি না।

না, পারি নি ; তবে জখম হয়েছে কাল আমার গুলিতে। এখানকার এস-পি-কে সব বলেছি, পালাতে পারবে না।

কিন্তু তুই বুঝলি কি করে যে গুপ্তধন ছিল?

দুটো কারণে। প্রথমত, এ বাড়িটাকে ভৌতিক করে তুলে কাউকে এ বাড়িতে না আসতে দেওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, বাগানের মধ্যে খোঁড়া গর্তগুলো।

বাহাদুরকে কি তুই প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলি?

হ্যাঁ।

প্রথমত, সে তোর বাবার আমলের চাকর। দ্বিতীয়ত, এই ক'বছর এখানে তার কেয়ার-টেকার হিসেবে থাকা। আমরা একটা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলাম—

কি?

তৃতীয় দিন দরজা খুলে যাবার পরই ছুটে তার বাড়িতে যাই। সকালেই তার বাড়িটা দেখে রেখেছিলাম। যাই হোক, তার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করতেই বৌ বললে, তার স্বামী নেই, কার্সিয়াং গেছে—সকালে আসবে। বিশ্বাস হল না কথাটা, অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরে দেখি, বাহাদুর আসছে দ্রুত পায়ে তার বাড়ির দিকে।

সত্যি?

হ্যাঁ। আর তার কাঁধে কি ছিল জানিস?

কি?

একটা বাঁশের মই।

মই!

হ্যাঁ। যে মইয়ের সাহায্যে সে ছাদে ওঠে রাত্রে। ছাদের ওপরে যে তক্তা ঢাকা গর্তটা ছিল, সেই গর্তের ভেতর দিয়ে একটা কাপড় তারের সাহায্যে ঘরের মধ্যে নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে দোলাত। সবার মনে হত, কোন বস্ত্রাবৃত অশরীরী।

বলিস কি!

তাই। যা হোক, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তার পরদিন সকালে তোকে ফোন করি আসবার জন্য। আর ঘড়ঘড় শব্দের ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারছিস, ওই ছাদের ড্রামটা এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে শব্দ তুলত।

তাহলে...

বিরূপাক্ষ বললে, তবে আমার মনে হয়, বাহাদুর গুপ্তধনের সন্ধান আজও পায় নি। পেলে সে কাজ ছেড়ে দিত। ওই সামান্য মাহিনায় তোর বাড়ির কেয়ার-টেকারের কাজ করত না।

সে গুপ্তধন তাহলে কোথায়? সুবীর হাজরা শুধোল।

জানি না কোথায়। বিরূপাক্ষ বললে, তবে ব্ল্যাক আউট হয়েই থাক। চোরাই সম্পদের ওপর লোভ করিস না।

না, সে লোভ আমার নেই। আচ্ছা. বিরূ—

কি?

তুই কি প্রথম থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলি ব্যাপারটা?

নিশ্চয়ই। ভূত বা প্রেত সত্যি কিছু আছে কিনা জানি না, তবে যা আমরা দেখি বা শুনি, তার বেশির ভাগই নার্ভাস মনের দৃষ্টিবিভ্রম বা কোন শয়তানের শয়তানী। তোর ওই বাড়িটা সম্পর্কে শেষোক্ত কথাটাই মনে হয়েছিল বেশি করে আমার, তাই এসেছিলাম এখানে। তারপর বাহাদুরকে দেখে সন্দেহটা আরো বেশি করে মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে।

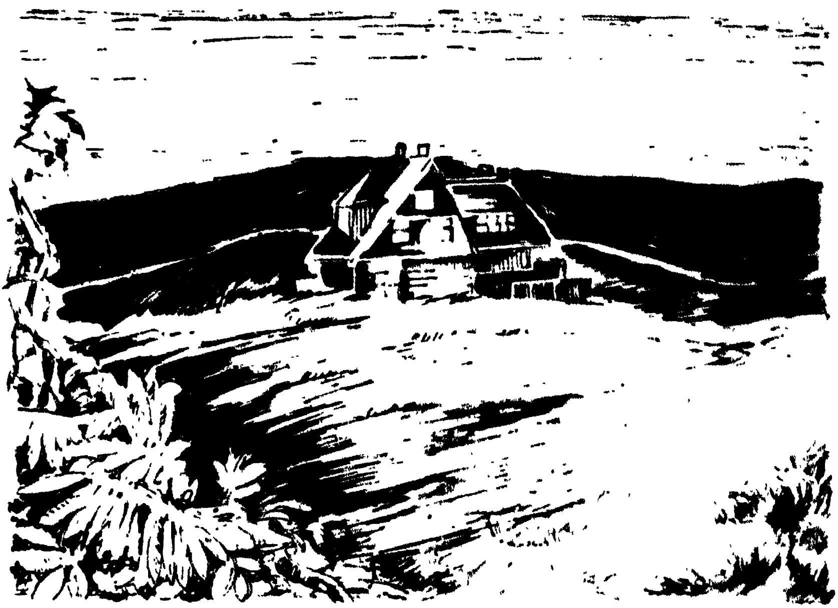
কেন?

ওর চোখে ছিল শয়তানের দৃষ্টি। ও-দৃষ্টিকে আমি কখনো ভুল করি নি চিনতে। যাক, রাত হল, এবার শুয়ে পড়া যাক, কাল আবার ভোরে উঠতে হবে।

বিরূপাক্ষ একটা হাই তুলল।

বাইরে শৈলপুরীতে হিমঝরা রাত্রি! শান্ত—স্তব্ধ—নিদ্রাভিভূত। ❑





উত্তর সিকিমের ভূতবাংলো

সমরেশ বসু

এবার আমি তোমাদের গোগোলের গল্প শোনাতে পারলাম না। তাই ঠিক করেছি, এ বছরে, আমার নিজের চোখে দেখা একটা ভূতুড়ে ঘটনার কথা তোমাদের শোনাব। ভূতুড়ে ঘটনাটা সত্যি ভূতের কাণ্ডকারখানা কিনা, সেটা তোমরাই বিচার করবে।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে আমি প্রথম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটককে বেড়াতে গিয়েছিলুম। কোথায় কোন হোটেলে উঠব, সে-সব আগের থেকেই ঠিক করা ছিল। কিন্তু সেখানে কারোকেই চিনি নে। আমি একলা মানুষ। গল্প করার কথাবার্তা বলার লোক নেই। একমাত্র হোটেলের মালিক আর তার মেয়ে বউ ছাড়া। হোটেলের মালিক ছিল একজন বাস্তুহারা তিব্বতী। চীনারা যখন তিব্বত দখল করে নিয়েছিল, তখন দলাই লামার সঙ্গে হাজার হাজার তিব্বতী ভারতবর্ষে চলে আসে, আর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখনও সেই সব তিব্বতীরা আমাদের দেশেই থেকে গিয়েছে।

গ্যাংটক শহরের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হল, প্রায় দু কিলোমিটার জায়গা অনেকটাই সমতল। শহরের বাজার, দোকান-পাট, হোটেল রেস্টুরেন্ট, সবই সেই সমতল রাস্তার দুধারে। আর এই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে, নীল আকাশের গায়ে সব সময়েই দেখতে পেতাম, কাঞ্চনজঙ্ঘার

বেশ বড় একটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙঘার রঙও বদলাতে থাকত। সেই দিকে তাকালে, বাকিটা সবই নীচের পাহাড়ী অঞ্চল, গাছপালায় নিবিড় সবুজ আর নীল দেখাত। আবার অন্য দিকে পাইন দেবদারু নানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, পুলিশের ব্যারাক, সরকারি অফিসগুলো দেখা যেত। সমতল পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যেতাম, এককালের রাজা ছগিয়ালের প্রাসাদের দিকে। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখতাম, তিব্বতী লামা ও ভক্তরা গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। আর একটি অনির্বাণ প্রদীপ সব সময়েই জ্বলছে। অনির্বাণ প্রদীপ মানে হল, যে-প্রদীপ একবার জ্বালালে আর কখনও নিভবে না। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে এ অনির্বাণ প্রদীপ খুবই পুণ্যের জিনিস।

দু দিন বাদেই এক বাঙালী ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা। জিজ্ঞেসা করলুম, 'কী করে জানলেন আমি এখানে এসেছি?'

সাংবাদিক ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমাদের কাছে কোন সংবাদই চাপা থাকে না কলকাতার এক খবরের কাগজের সাংবাদিক বন্ধু আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, আপনি গ্যাংটক বেড়াতে এসেছেন। খবর পেয়েই হোটেলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানলুম, আপনি এই হোটেলে উঠেছেন। তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম।'

আমিও ভদ্রলোককে পেয়ে খুশি হলুম। তিনি ওঁর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের একটি চার পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গেও আমার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। সে আমাকে গ্যাংটকের অনেক গল্প শোনাত। সাংবাদিক ভদ্রলোক গ্যাংটকের যা কিছু দেখবার, সবই আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, মিলিটারি ক্যাপটেন টি. কে. বাসুর সঙ্গে। টি. কে. বাসু অর্থাৎ তাপসকুমার বসু।

গ্যাংটকের মত জায়গায়, একজন বাঙালী মিলিটারি ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ হওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ক্যাপটেন বাসু একদিনের আলাপেই আমার এমন বন্ধু হয়ে গেলেন, পরের দিনই তিনি আমাকে তাঁদের মিলিটারি মেসে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, 'আপনি হোটেলেই তৈরি হয়ে বসে থাকবেন। আমি নিজে না আসতে পারলে. গাড়ি পাঠিয়ে দেব। মিলিটারি ড্রাইভার আপনার খোঁজ করে আপনাকে নিয়ে যাবে।

গ্যাংটকের মত জায়গায়, এরকম একজন ক্যাপটেনকে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হল। পরের দিন একজন মিলিটারি পোশাক পরা সর্দারজী অর্থাৎ শিখ ড্রাইভার বেলা এগারটায় হোটেলে এলেন। আমি হোটেলের নীচের তলায় রেস্টুরেন্টে বসেছিলুম। ড্রাইভার সর্দারজী হোটেলের মালিককে আমার নাম বলতেই, তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সর্দারজী আমাকে একটি ছোট চিরকুট দিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'দাদা, ড্রাইভার যশোবন্ত সিং আপনাকে নিয়ে আসবে। আপনি এর সঙ্গে চলে আসবেন। ইতি, তাপস।'

আমি যশোবন্ত সিংয়ের সঙ্গে একটা জীপে চেপে বেরিয়ে পড়লুম। সমতল পাহাড়ী পথে গিয়ে, মিলিটারি মেসে যেতে আমার রীতিমত ভয় হয়েছিল। মেসটা ছিল একটা পাহাড়ের

াথায়। রাস্তাটা এমন উঁচু আর খাড়া, একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে সোজা যমালয়ে লে যেতে হবে।

যাই হোক, মেসে পৌঁছলুম। সামনে লন। একটা গাড়ির পক্ষে পুরোপুরি পাক খাবার মত ায়গাও নেই। মেস রুমটা বেশ বড়। ক্যাপটেন টি. কে. বাসু ছাড়াও আরও বেশ কিছু দ্রলোক, ভদ্রমহিলা ছিলেন। ভদ্রলোকেরা সকলেই নানা স্তরের অফিসার। এবং যিনি মিলিটারি াক্তার ছিলেন, তিনি একজন ওড়িয়া। ক্যাপটেন বাসু ছাড়া আর কোন বাঙালী না থাকলেও, কলের সঙ্গেই আমার খুব ভাব হয়ে গেল।

অনেক রকম রান্না হয়েছিল। সবই দেশীয় রান্না। মাংসের বিরিয়ানি, কাবাবের কোন লনা ছিল না। খাওয়া-দাওয়া মিটতেই প্রায় বেলা তিনটে বেজে গিয়েছিল। ক্যাপটেন বাসুই লেন মেসের ইনচার্জ। আর মেসের গায়েই ছিল তাঁর ছোট দুই কুঠরির থাকবার ঘর। সেখানে শ্রাম নেবার সময়েই ক্যাপটেন বাসু আমাকে বললেন, 'উত্তর সিকিম হল মিলিটারির হাতে। সখানে সাধারণ মানুষ, এখান থেকে যেতে পারে না। বিশেষ অনুমতি লাগে। আর উত্তর িকিমে যারা বাস করে, তারাও কেউ এদিকে আসতে পারে না। এই সীমান্ত অঞ্চলে, সামরিক ড়াকড়ি খুব বেশি। তবে আপনি যদি উত্তর সিকিমে বেড়াতে যেতে চান, আমি তার ব্যবস্থা রতে পারি। আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার কোন অনুমতির দরকার হবে না।'

আমি তো শুনে খুবই খুশি। তখনই রাজি হয়ে গেলুম।

দুদিন পরেই, সকাল বেলা একটা জোংগা জীপে চেপে আমরা উত্তর সিকিমের পথে ওনা হলুম। জোংগা জীপ এমন গাড়ি, যা খাড়া পাহাড়ী পথে চলতে পারে। ক্যাপটেন বাসু াড়া, আমি, আর, ডাক্তার মেজর মোহান্তি, এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন। গাড়ির চালক ছিলেন সেই শোবন্ত সিং।

উত্তর সিকিমের পথটা গিয়েছে তিস্তার উৎসের দিকে। অর্থাৎ তিস্তা যেখান থেকে, বরফ লে, পাহাড় থেকে নেমে, শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে সমতলে নেমেছে। আমরা সেই ওপরে ঠেছিলুম। আব আস্তে আস্তে পাহাড় পর্বতের দৃশ্যও বদলে যাচ্ছিল। খুব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে, াড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের জীপ চলছিল। আর তিস্তাকে একটা সরু নীল ফিতের মত নেক নীচে দেখা যাচ্ছিল। গাছপালা কমতে কমতে, আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম বরফের াজত্বে। চারদিকের পাহাড়ই অধিকাংশ বরফে ঢাকা।

রাত্রে আমরা যেখানে থাকব, সেখানে রান্নার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু দুপুরের খাবার সঙ্গে নওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, একটা বাংলোয় আমরা দুপুরের খাবার খাব। সেখানেই একটু শ্রাম করব। বাংলোটা মিলিটারির অধীনেই ছিল। কিন্তু ডাক্তার মেজর মোহান্তির স্ত্রী মিসেস মাহান্তি ভয় পেয়ে বললেন, 'আমি শুনেছি, ওটা ভূত বাংলো। আমি ওখানে ঢুকব না।'

মিসেস মোহান্তির কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। ক্যাপটেন বাসু বললেন, 'দিনের বলা সেখানে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তা ছাড়া, বাংলোটা মিলিটারি পাহারা দয়। বাইরের ঘরে অফিসাররা মাঝে মাঝে অফিসের কাজ নিয়েও বসেন। দুটি খুব ভালো শাবার ঘর আর বাথরুম আছে। আমরা আছি, আপনার কোন ভয় নেই।'

প্রায় বেলা একটার সময় আমরা সেই বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকেই বরফে আবৃত পাহাড়। উত্তরে, আকাশের গায়ে তুষার ঢাকা পর্বত ছাড়া কিছু নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। এমন কি একটা পাখির ডাকও শোনা যায় না। বাংলোর গেটেই দেখা গেল, বন্দুক হাতে একজন সিকিমি সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। আমাদের আসার সংবাদ নাকি আগেই দেওয়া হয়েছিল সিকিমি সৈনিক মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে, বাংলোর দরজার তালা খুলে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকলুম।

বাংলোর বাইরের ঘরটা বেশ বড়। সোফা-সেট ছাড়াও রয়েছে মস্ত বড় একটা টেবিল অনেকগুলো চেয়ার। টেবিলের ওপর রাখা জলভরা কাচের জাগ। অনেক প্লেট থাকে থাকে সাজানো। আর ডজন খানেক জলের গেলাস।

আমি বাংলোর ভিতরের অন্যান্য ঘরগুলো দেখে এলুম। সত্যি বেশ সুন্দর সাজানো ঘর খাটের বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার মোহান্তি নিজেই মিসেস মোহান্তিকে নিয়ে একটি শোবার ঘরে ঢুকলেন। ক্যাপটেন বাসু ড্রাইভারের সাহায্যে গাড়ি থেকে খাবার নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজালেন। ডাক্তার মোহান্তি বাইরের ঘরে এসে বললেন, 'আমার স্ত্রীর ভয় কেটে গেছে। উনি বাথরুমে গেছেন। এখন বেশ খুশি।'

আমার খুব শীত করছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে একটা শোবার ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। এই সময়ে হঠাৎ মিসেস মোহান্তির একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল। তিনি ছুটতে ছুটতে বাইরের ঘরে এলেন। দেখলাম, তাঁর দু চোখ ভয়ে ও আতঙ্কে বিস্ফারিত। মুখে বোধহয় জল দিয়েছিলেন। মুখটা ভেজা। আমরা সবাই তাঁকে একটা সোফায় বসিয়ে দিলুম। তিনি প্রথমে কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। তারপর কোনরকমে যা বললেন, তা, হল, বাথরুমের জানলাটা নাকি হঠাৎ যেন বাতাসের ঝাপটায় খুলে যায়। জানলায় কোন গরাদ ছিল না। জানলায় দেখা যায় বিকট দর্শন একটা মুখ। মাথায় লম্বা লম্বা চুলে বেণী পাকানো অথচ মুখে ঝুলের মত গোঁফ দাড়ি। সে হাসছিল না কী করছিল বোঝা যায় নি। কেবল তার মস্ত লাল জিভ আর বোগড়া বোগড়া বড় দাঁত দেখা গিয়েছিল। সে অদ্ভুত শব্দ করে, মিসেস মোহান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তখনই তিনি কোনক্রমে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসেন।

সব শুনে ক্যাপটেন বাসু তৎক্ষণাৎ সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন। ডাক্তার মিসেস মোহান্তির পাশে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন। আমি মনে মনে অবাক হচ্ছিলুম। আশেপাশে কোন মানুষের বসতি নেই। ওরকম অদ্ভুত মূর্তি এই বরফে ঢাকা পাহাড়ে কোথা থেকে এল?

মিসেস মোহান্তি আবার বললেন, 'ক্যাপটেন বাসু আমার সব কথা না শুনেই চলে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে, আমি যখন ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ মূর্তিটার চেহারা বদলে গেল। দেখলাম, একটা মাথায় এলোনো চুল পাহাড়ী মেয়ে খিলখিল করে হাসছে। তার গলায় অনেক রঙের পাথরের মালা। সে তার এমন লম্বা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, ছিটকিনি না খুলতে পারলে সে আমাকে নির্ঘাৎ ধরে ফেলত। তোমরা কি সেই বিকট হাসি শুনতে পাওনি?'

ডাক্তার মোহান্তি মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি কিছুই শুনতে পাই নি।'

মিসেস মোহান্তি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বললুম, 'না, আমিও কিছু শুনতে পাইনি।'

প্রায় পনর মিনিট পরে ক্যাপটেন বাসু ফিরে এসে জানালেন, কোথাও কিছু দেখতে পাননি। কাছে পিঠের মধ্যে বাংলোর পিছনে, পাহাড়ের ওপরে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেখানে একটি আলাদা কাঠের বাড়িতে একটি তিব্বতী পরিবার রয়েছে। সেখানে ওরকম কোনো মানুষের মূর্তি দেখা যায়নি, তা ছাড়া, ক্যাপটেন বাসু সিকিমি সৈনিকটিকে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গিয়েছিলেন, কেউ পালাতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন। তা ছাড়া সিকিমি সৈনিকটি বলল, পিছনের পাহাড়ে তিব্বতী পরিবারটি খুবই ভালো। তারা এই পাহাড়ে খুব কষ্ট করে কিছু ফসল করে, আর তা খেয়েই, বুদ্ধের সেবা করে বেঁচে আছে।

যাই হোক, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। খিদেও পেয়েছিল সকলেরই। বাইরের ঘরের বড় টেবিল ঘিরে আমরা সবাই খেতে বসে গেলাম। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে বাইরে, ওপারের পাহাড়ে বরফের ওপর রোদের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছিল। পরোটা, আলুর দম, শুকনো করে রান্না মাংস আর মিষ্টি ছিল দুপুরের খাবার। আর বড় ফ্লাস্কে ছিল গরম কফি।

ক্যাপটেন বাসুকে বলে আমি ভিতরে একটি শোবার ঘরে গেলুম। জোংগা জীপে অনেকটা পথ এসে, আর পেট ভরে খেয়ে, আমার যেন শীতটা আরও বেশী লাগল। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের দরকার ছিল না। ঘুম আসছিলও না। আমি একটু আরাম করতেই চেয়েছিলুম। শুয়ে শুয়ে মিসেস মোহান্তির দেখা ঘটনার কথা ভাবছিলুম।

ভাবতে ভাবতেই আমার যেন একটু তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মধ্যে যেন কেউ পায়চারি করছে। তারই তালে তালে ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে। আর আমার নাকে আসছে একটা মিষ্টি সুগন্ধ। আমার তন্দ্রা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকালুম। দেখলুম, একটি অদ্ভুত দেখতে মেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমের দরজাটা খোলাই রইল।

দরজাটা কি খোলাই ছিল? মনে করতে পারলুম না। হয়তো স্বপ্নই দেখছিলুম তন্দ্রার ঘোরে। কোনরকমে কম্বলের ঢাকা খুলে, খাট থেকে নেমে, বাথরুমের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম। দিয়েই আবার গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এর পরেও আমাদের অনেকটা পথ যেতে রাত্রি হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ী পথে রাত্রে চলাটা নিরাপদ নয়। কোথায় যে রাস্তায় ধস নেমে আছে, কেউ বলতে পারে না। আর আমরা এমন একটা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে চলেছি, যে-কোনো সময়েই বিদেশী সৈনিকের গুলি ছুটে আসতে পারে।

আবার বোধহয় আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল। শুনতে পেলুম, ঘরের মেঝেয় কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম, গলা থেকে হাঁটু অবধি লাল পোশাক পরা একটি লোক ঘরের একটা জানলার কাছ থেকে দরজা অবধি হেঁটে বেড়াচ্ছে। পায়ে মোজা আর জুতো। মাথায় টুপি পরা থাকলেও, লম্বা চুল বেরিয়ে পড়েছে। আর তার ফরসা মুখে গোঁফ দাঁড়িও রয়েছে। আশ্চর্য! এ কোথা থেকে এল? আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে আপনি? এ ঘরে এলেন কেমন করে?'

লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য! সত্যিই ভূতবাংলো নাকি? আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। পায়ে জুতো গলিয়ে, বাথরুমের দরজা খুললুম। কেউ কোথাও নেই। কেবল বড় জানলার কাচের পাল্লা দুটো খোলা। জানলার বাইরে জংলী ঝোপ ঝাড়। আমি এগিয়ে গিয়ে জানলায় উঁকি দিতে গেলুম। তৎক্ষণাৎ দরজাটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা ধরে টানলুম। কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চিৎকার করে ডাকলুম, 'ক্যাপটেন বাসু, দরজাটা খুলে দিন।'

তখনই জানলার কাছে খিলখিল হাসি শুনতে পেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি, চুল এলো করা একটা পাহাড়ী মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। মুখটা তার মোটেই খারাপ নয়। গলা থেকে তার বুক অবধি নানা রঙের পাথরের মালায় ঢাকা। তাকে আমার পাগলী ছাড়া কিছুই মনে হল না। আমি তার দিকে তেড়ে গেলুম। সে ভয় না পেয়ে তার একটা হাত ভিতরে বাড়িয়ে দিল। আমি সে হাতটা ধরতে গেলুম। অমনি সে হাতটা সরিয়ে নিল। আমি ওর এলো চুল ধরবার জন্য হাত বাড়ালুম। সে পেছিয়ে গেল, আর খিলখিল করে হাসতে লাগল।

আমি এমনই ক্ষেপে গেলুম, বড় জানলাটায় উঠে বাইরে লাফ দিয়ে পড়লুম। মেয়েটি বোধহয় ভাবতে পারেনি, আমি এমন একটা কাণ্ড করতে পারি। সে দৌড় দিল। আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটলুম। কিন্তু জংলী ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে যে কোথায়, দেখতে পেলুম না। অথচ তার হাসি শুনতে পেলুম। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে আমিও জংলী ঝোপে ঢুকে পড়লুম। এ নিশ্চয়ই কোন মতলববাজ মানুষদের ব্যাপার। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে, হঠাৎ এক সময়ে আমি বাংলোর সামনে পাহাড়ের খাদের ধারের রাস্তায় এসে পড়লুম। তখন আর হাসি শোনা যাচ্ছে না। জংলী ঝোপও নেই।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আর একটু হলে আমি হাজার হাজার ফুট নীচে পড়ে যেতুম। উত্তরের আকাশে তুষারাবৃত পর্বতের গায়ে রোদে নানা রঙ খেলছে। আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম সিকিমি সৈনিকটি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে দেখলুম, ডাক্তার মেজর মোহান্তি আর ক্যাপটেন বাসু দুটো ছোট সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। মিসেস মোহান্তি বড় সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে ক্যাপটেন বাসু চোখ মেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মধ্যে আবার বাইরে গেলেন কখন?'

বললুম, 'ঘর থেকে এসে বলছি।'

আমি যে-ঘরে শুয়েছিলুম, সে-ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা দেখলুম। অবাক কাণ্ড! সত্যি বাইরে থেকে বাথরুমের দরজাটার ছিটকিনি বন্ধ। কে বন্ধ করতে পারে?

আমি শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলুম। ক্যাপটেন বাসুকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে গিয়ে সব কথা বললুম। তিনি শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন, 'আমরা কেউ আপনার শোবার ঘরে ঢুকিনি। কোন মেয়ের হাসিও শুনতে পাই নি।'

আমরা দুজনেই দুজনের মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলুম।

এ ভুতুড়ে ব্যাপারের কোন ব্যাখ্যাই আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা, ওখানে এমন কিছু লোক হয় তো আছে, যারা চায় না, বাংলোয় এসে কেউ থাকুক। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সিকিমি সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে কখনও কিছু দেখেছে কিনা। সে পরিষ্কার বলল, 'না, সেরকম কিছু দেখলেই আমি গুলি চালিয়ে দিতুম।'

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে বন্দুক বা রিভলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ক্যাপটেন বাসু আর ডাক্তার মেজর মোহান্তির কাছে রিভলবার ছিল, সেইজন্যই কি ভূতেরা তাঁদের দেখা দেয়নি? কে জানে।.....❑





লাল চুল

মনোজ বসু

ছ' মাস ধরিয়া বিয়ের দিন সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল ত বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনেরো বাকী, ২৮।৮ নীলমাধবের চিঠি আসিল-- কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড় জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস ; চিঠি লইয়া সেই-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষ কালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা ত, যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জলজঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ান ছাড়া আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে ; জমিদারের ছেলে ঐ একটি মাত্র। অতএব এই ছ' মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়ি শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকারের চেহারাটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃদকম্প উপস্থিত হইল।

অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।—ঐ তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবোই—বারবার এই রকম গোছগাছ করে শেষকালে যে—না হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল......

কিন্তু অতবড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্ত সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদারবাবু এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়ীটা তিনি কয়েকদিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইঁট কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতালায় দরদালানে সত্তর আশীজন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুর গাড়ী বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে আটটায়।

রাণী বলিল—মাসিমা, হিরনের বিয়ের বেলায় আপনি বড় অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু—

মিনুর মা হাসিলেন।

—না, সে হবে না, মাসিমা। আমরা সমস্ত রাত বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় ত বলুন, এক্ষুনি ফের গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসি।

রসুই ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার ওপর কে জ্বলন্ত কাঠ ঠেস দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের ; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য করিতেছিল—বিনা অপরাধে তাহার গুরুদণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিনদিনের মধ্যে সে কলিকা একেবারে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল—খবর কি? খবর কি?

শীতল কহিল—খবর ভাল। বর, বরযাত্রী সব ওঁদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজান হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল—একশ' বরকন্দাজ গাঙের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আটদশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল—যাওয়া ভাই, অনর্থক। ছাত থেকে কিচ্ছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে ; ঠাট্টাতামাসা—ছুটা-ছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ ; তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে?

রাণী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল—ঐ, ঐ—বর—দেখ—

—মরবি যে এক্ষুনি প'ড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয়নি দেখেছিস্? বলিয়া আর একটি মেয়ে রাণীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল—কই? ও রাণী, বর দেখলি কোন দিকে।

—গলায় ফুলের মালা—ঐ যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি! সেজদি বলিল—মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুথুড়ে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুর দাদা। বর এতক্ষণে কোনকালে আসনে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসন নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা। নিরু বলিল—বলেছি ত অনর্থক। তার চেয়ে নীচে গোলকুঠুরীর জানলা দিয়ে দেখিগে চল্।

—চল্ চল্।

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা...। সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙীন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ, উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

—ঘুমিয়ে কে রে? মিনু? ওমা মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই ; পালিয়ে এসে চিলে কোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রাণী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল—আহা সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নীচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—গিন্নীপনা রাখ্ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রাণী?

বিশেষ করিয়া রাণীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল! রাণী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিতে লাগিল—মিনু ভাই, জাগো—আজকে ঘুমোতে আছে? উঠে বর দেখতে এস। তারপর মিনুর এলো চুলে হাত পড়িতে যেন শিহরিয়া উঠিল—দেখেছ? সন্ধ্যাবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকোনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায়? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম? নীচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরাণী, শুভা ওদের সব গলা।

—চল্—চল্—

—চুল বাঁধতে হবে—ওঠ্ মিনু, শীগগির উঠে আয়—বলিয়া মিনুর এলোচুল ধরিয়া জোরে একটান দিয়া রাণী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রাণীরা নামিয়া গিয়েছে, ছাতে কেহ নাই। ঘুমচোখে ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙ্গার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে ; ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।...সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে...। হঠাৎ নীচের দিকে কোথায় দপ্ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।—জল, জল....মোটর আনো, ভিড় করবেন না মশাই সরুন—ফাঁক করে দিন....আহা-হা কি করো, মোটরে তোল শীগগির। গামছা কাঁধে কোন দিক হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

জজ বাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুন চৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পূর্বদিক ছোট লাল চাদরের নীচে চারিটা কলাগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশে রক্ত গড়াইয়াছে—মেঘের মত খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা—বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্যে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষীমাণিক রাজরাণী মা—নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন—হাত পা গুটিয়ে বসে আছ যে—

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহগনি-পালিশ খাট কজনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণে বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মধ্যে কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাঁচের মত স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দুটির দিকে নিষ্পলক চাহিয়া চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—একবার ভাল করে চা দিকি...চোখ তুলে চা—ও কী,....

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারবার বলিতে লাগিলেন—ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ দিনরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথাও কয়নি। ও খুকী আর বকব না—চোখ তুলে চা' একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমরা? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে আটটায় লগ্ন ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠল, যেন শুভ লগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।...ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পালাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল ; সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে, পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মতো সে বলিয়া উঠিল—চালাও এক্ষুণি—

গাড়ী চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ, একবোঝা কোট কামিজ, তার উপর সৌখীন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষ্যে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম। বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোড়ে চালাও গাড়ী—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

—যেখানে খুশী। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীর বেগে গাড়ী ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মত বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণুধর শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দুধারের বাড়িগুলির দরজা-জানালা বন্ধ, ছোট সহর ইতিমধ্যেই নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা।...সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি মৃদু অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর—বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো—

আশেপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ীগুলির ছাদের উপর, আমবাগিচার এখানে সেখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহল-ভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটা বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদীর সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা, মানবী নয়। এই গাড়ীতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল ; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত হয়ত গাড়ীর গদীতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ী ছুটিতেছে ; চারিদিকে নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এইদিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি— জনশূন্য মাঠ— কোনদিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী

মৃতসুরূপা তার বধূ। লাল বেনারসীতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া খানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার স্থান হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতায়—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরণের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকী ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল ভরা মাথাটি—মাথার চারি পাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলো চুল উড়ে,—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল!

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ী চলিতে লাগিল। খানিকপরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীর অনেকে মেল ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাহারা খুব নিকট আত্মীয়—বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মতো শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভারী ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুর বাড়ীতে বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল—বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম—

—বলে যাওয়া উচিত ছিল—বলিয়া নীলমাধব চুপ করিল।

ছেলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল, মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্টগন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মতো ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে ; কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপ বাক্সের আবডাল নিবিড় কালো বড় বড় চোখদুটি অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহত ভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিন ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।...

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল।

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নেই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল—বুদ্ধি শ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাব দেখা দেখতে গিয়ে আপনি বল্লেন, আমার মা নেই, একজন মাকে খুঁজতে এসেছি। আপনা কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নীচু করে রইল—

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—থামো শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুজনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ; জীবনকালের মধ্যে কোনদিন যাহাকে দেখে নাই মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাগি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার ঘরখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথ খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; জানালা খোলা, শেষরাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয় ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয় রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি অন্যায় হইয় যাইতেছে....হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল....কে আসিয়া কতবার ডাকাডাকি করিয় বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে ; তাহার তন্দ্রা-বিব মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক্-ঠক্-ঠক্

খিল-আঁটা কাঠের কপাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোনে কান্না জমিয়াছে। এ আবদারের কথা কহিলে একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিস্‌ফি করিয়া বধূ বলিতেছে দুয়ার খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার ; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয় কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজি নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছে উপরেব লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িতেছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসে। আম বাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা পাখীর কলরব...(ঘর হইতে কে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে...। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মত একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম গম্ভীরভা গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল—সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—চা-টা তোমরা থেকে খেয়ে নাও—

—বাড়ী যাওয়া হবে না?

—না—বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল—কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি ছিল, তিনিই জানেন—ক্ষণকালে মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন—শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে ত বলা যাচ্ছে না।

অনতি পরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকী রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আর পারে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ; কিন্তু ইদানিং কৌলীন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল—কশাই তোমরা সব।

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। ওঠ ছুড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো? কাকার যেমন কাণ্ড—

একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হন-হন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে দিল—পাকাপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘণ্টা দুই তিন আগে বেরুলে—কোন খবরাখবর দেওয়া নেই। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটি থাবা মারিয়া কহিল—এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয় বাবু, চল্লিশবছরের পেশা এই আমার। কিছুতেই রাজি হয় না—হেনো তেনো কত কি আপত্তি। ফুসমন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম। বলিয়া শূন্যে মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল—আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল—তাই কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মী ঠাকরুনের মতো মেয়ে...ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসী বাঁদির যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল—কিন্তু আমি যা বলার বলে দিয়েছি শীতল, তুমি বাবাকে আমার হয়ে বলো—

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন—শুনলাম, বিয়েয় তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন—তা হলে আমায় আত্মহত্যা করতে বল?

কোন প্রকারে মরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল—কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কি রকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমায়—বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। এক মুহূর্তে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন—আর এদিকের সর্বনাশটা ভাবো একবার। বাড়ীসুদ্ধ কুটুম্ব গিস্‌গিস্ করছে, সতের গ্রাম নেমনতন্ন। বউ দেখবে বলে সবাই হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেদাজেদীর বিয়ে—আর চৌধুরীদের সেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের সেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্দ্ধ দেরী না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে এক হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল—মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে?...

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন ; না বেণুধর বউ না নিয়ে বাড়ী ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ ত, মাঝে এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভালো হয়ে যাবে।...

বারোয়ারীর মাঠে যাত্রা আসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা সুরু। বেণুধর সমবয়সী জন দুই তিনকে পাকড়াইয়া বলিল—চল যাই।

বিজয় বলিল—আমার যাওয়া হবেনা ত বিস্তর জিনিস পত্তোর বাঁধাছাঁদা করতে হ'বে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

—কেন?

—গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটোদিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমি যাও বিজয়।

—গাড়ী সেই কোন রাতে—আমরা থাকব বড় জোর এক ঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা চল চল—বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল?

—হ্যাঁ—

—পরশু রাত্রে?

তাছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণ ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল—রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, ঐ অপঘাতে মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে—

আবার একুট স্তব্ধ থাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল—মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ আহ্লাদ ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুরিয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি। বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল—তুমি এসব কথা বলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

—ভয় করে? তবে বলব না। বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল—কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয়নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল।

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশী হইল। ফিরিবাব পথে কথায় কথায় এমন হাসি বহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাশুদ্ধ তাহার অনেক ডাল ভাঙিয়া লইল। বলিল—খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেবো—

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল— ফুলশয্যার দেরী আছে হে—

—কোথায়? বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল—এ পক্ষের দিন রয়েছে ত কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যের দিন করেছে কবে?

বিজয় রীতিমত রাগিয়া উঠিল—ফের ঐ কথা? এ পক্ষ—ও পক্ষ—বিয়ে তোমার কটা হয়েছে শুনি?

—আপাততঃ একটা; কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি। বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল—ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্ল ভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়ীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিক নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের সাধনা কাহাব উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে পায়চারী করিতে লাগিল। খণ্ড চাঁদ ক্রমশঃ আম বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।...আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কে যেন কোথায় পালাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খস্ খস্ করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নতুন কোরা কাপড় পরিয়া খস্ খস্ করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আঙটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দুটোদিন সময়ের মধ্যেই তাহার মন আশ্চর্যরকম ভালো হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক

ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা দেখিয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মত নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধুর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুণ-কাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মত খিলান করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বই পড়িতে লাগিল...একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মত পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গীতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভালো করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষকালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালার খিল আটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের ওপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা করা তালের গাছ....একটা মুখের আধখানা...ঝুটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুটি চাপিয়া ধরিয়া আছে...ঝুল কালি ও মাকড়সা জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক আটক হইয়া রহিয়াছে...

চোখ বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ের মত মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। সবার কি সংকেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ জঙ্গল আনাচ-কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙিনার ধূলার কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

—ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরাণী মা—

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ঘুলঘুলির পাসে তন্বী কিশোরীটি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।...

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা ও চেনা-জানা সকল আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্দ্ধ দেরী করিল না ; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে শুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া যাইতেছে

—এসো

—উঁহু—

—এসো

—না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্নিরীক্ষে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায় ; তবু সে যুক্ত করে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল—মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না ; আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক, অনেকক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝনঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপ্ত মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মত বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল। ❑



রাত তখন এগারোটা

বিমল মিত্র

ঘটনাটি ঘটল রাত এগারোটার সময়।

কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছি। দেশ বলতে যেখানে আমি জন্মেছি। কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

সকাল পাঁচটায় একটা ট্রেন আছে। তাতে গেলে মাজদিয়া রেলস্টেশনে সকাল আটটা-সাড়ে আটটা বেজে যায়। স্টেশনে নেমে আরও পাঁচ ক্রোশ হাঁটা। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলেও তাতে সময় লাগে আরও দুঘণ্টা।

তারপর আর একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে সকাল নটায়। তারপর দুপুর দুটোয়। তারপর সন্ধ্যে ছটায়।

সন্ধে ছটার ট্রেনে গেলে রাত নটায় পৌঁছতে পারা যায় মাজদিয়া স্টেশনে। কিন্তু তাতে গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত এগারোটা বেজে যায় বলে সাধারণত সে ট্রেনে যাই না।

তখন আমি কলকাতার একটা মেসে থেকে পড়াশুনা করি। প্রত্যেক শনিবার দিন দুপুর দুটোর ট্রেনে বাড়ি যাই। তাতে সুবিধে খুব। ট্রেনে ভিড়ও কম থাকে। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়িতে পৌঁছনো যায়।

কিন্তু সব সময়ে সে ট্রেনে যাওয়ার সুবিধে হয় না। লেখা-পড়া ছাড়া ফুটবল খেলার নেশা ছিল। রবিবার দিনটায় দেশে না কাটিয়ে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাতে বেশি ভাল লাগে।

কোনও শনিবার বাড়িতে না গেলে বাবার চিঠি আসে। লেখেন—'তুমি গত শনিবারে বাড়ি আস নাই কেন? আমরা তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। তোমার শরীর খারাপ হইল কিনা ভাবিয়া খুবই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ উত্তর দিবে.....', ইত্যাদি ...

আমি বাবার একই সন্তান। বাবার বয়স হয়েছে। আমাকে নিয়েই তাঁর যত ভাবনা-চিন্তা-স্বপ্ন সব কিছু। আমি বড় হব, আমি মানুষ হব, আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করব।

কিন্তু ততদিনে আমারও একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছে। দেশের চেয়ে কলকাতার আকর্ষণই আমার কাছে বেশি। আমার জন্যে বাবা মোটা হাত খরচ পাঠান। সেই টাকা দিয়ে আমি ময়দানে ফুটবল খেলা দেখি, ক্রিকেট খেলা দেখি, আবার কখনও-কখনও বা সিনেমা দেখতে যাই। কলকাতার জীবন গ্রামের জীবনের মতো একঘেয়ে নয়। সেখানে চারদিকে এঁদো পানা-পড়া পুকুর আর কেবল ক্ষেত-খামার আর বন-জঙ্গল। আমাদের মতো যাদের অবস্থা ভাল নয় তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কেবল বারোয়ারি-তলায় বটগাছের ছায়ায় হারু মুদির দোকানের মাচায় বসে আড্ডা মারে। তাস খেলে। আর আমি গেলে তারা আমার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। কারোর কোনও কাজ নেই। বাড়ির অবস্থা খারাপ বলে তারা কলকাতায় আসতে পারে না। সে-পয়সা তাদের নেই। তাই আমাকে তারা একটু-একটু হিংসেও করে। আমার চাল-চলন, জামা-প্যান্ট দেখে তারা অবাক হয়ে যায়!

আমার জুতো, আমার চুল-ছাঁটা, আমার সাবান-মাখা দেখে তাদের তাক লেগে যায়। কারণ আমাদের গ্রাম এমন এক গ্রাম যেখানে শহরের কোনও সভ্যতা ঢোকবার সুযোগ পায়নি।

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন নসুকাকা। আসল নাম বোধহয় ছিল নৃসিংহ ভট্টাচার্য। বাবা তাঁকে নসু বলে ডাকতেন। তিনি গ্রামে গ্রামে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে পুজো করে বেড়াতেন। বড় ভাল লোক। আমি দেশে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বলতেন, "কি রকম লেখা-পড়া হচ্ছে বাবা? ভাল তো?"

আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। বলতাম, "হ্যাঁ।"

তিনি বলতেন, "হ্যাঁ, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করবে বাবা। এখন দিন-কাল খুব খারাপ আর কলকাতা শহরে যে-রকম গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-বাস শুনেছি, খুব সাবধানে চলাফেরা করবে।"

নসুকাকা আমাদের দেশের নামকরা পুরুতমশাই। তিনি না হলে কারোরই কোনও পুজো-আচ্চা হত না। কেউ হাতেখড়ি দেবে তাতেও যেমন তাঁর ডাক পড়ত, আবার তেমন কারও বাড়িতে ছেলের অন্নপ্রাশন হবে তাতেও তাঁকে চাই। তারপর আছে বারোয়ারিতলার দুর্গাপুজো থেকে আরম্ভ করে তিন ক্রোশ দূরে জমিদারবাবুদের বাড়িতে যত উৎসব, যত বিয়ে, ব্রত-উদ্‌যাপন, সবেতেই তাঁর ডাক পড়ত।

তা এই আবহাওয়াতেই আমি মানুষ। কিন্তু এই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েও যে ঘটনাটা ঘটল তার কথাই বলি।

কলকাতায় তখন আমার স্কুলের পরীক্ষা চলছিল। তিন সপ্তাহ দেশে যেতে পারিনি বাবাকে সে-কথা লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি তিন সপ্তাহের জন্যে দেশে যেতে পারব না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল সেদিন শনিবার। মেসে এসে ভাবলাম দুটোর ট্রেন ধরব। কিন্তু কয়েকদিন ধরে রাত জেগে পড়বার পর বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। আধঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম দেয়াল-ঘড়িতে বেলা সাড়ে তিনটে। আমার বন্ধু, যে আমার পাশের বিছানায় শুত, সেও দেখলাম অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

মনে হল, সর্বনাশ! দুটোর গাড়ি তো কখন ছেড়ে দিয়েছে। এর পরে তো সেই সন্ধে ছটার আগে দেশে যাবার আর কোনও গাড়ি নেই। সে-গাড়িতে গেলে দেশের বাড়িতে পৌঁছতে তো সেই রাত এগারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়তেই সেদিন কেন জানি না আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম ট্রেনটা হয়তো একটু দেরি করেই মাজদিয়াতে পৌঁছবে। তার মানে যখন পাঁচ ক্রোশ হেঁটে বাড়ি পৌঁছব তখন রাত বারোটা বেজে যাবে।

বাবা হয়তো বকাবকি শুরু করে দেবেন। বলবেন—দুপুর দুটোর ট্রেনে আসতে পারলে না?

কিন্তু না, ট্রেনটা ঠিক সময়েই মাজদিয়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। এদিককার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে টিকিট দেখিয়ে গেট পার হলাম। গেটের বাইরেই বাজার। অত রাত বলেই বাজারে লোকজনের ভিড় পাতলা। তাড়াতাড়ি বাজার ছাড়িয়ে বড়-রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। ভেবেছিলাম একটা সাইকেল রিক্শা ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছব।

কিন্তু কোনও রিক্শাওয়ালাই অত দূরে যেতে চাইল না। বেশি টাকার লোভ দেখিযেও কাউকে রাজি করাতে পারলাম না।

সবাই-ই এক কথা বললে—অত দূরে সওয়ারি নিয়ে গেলে ফিরে আসতে রাত একটা বেজে যাবে।

আমি বললাম—আমি তোমাদের ডবল ভাড়া দেব।

তবু কেউ যেতে রাজি হল না।

অগত্যা হাঁটতে শুরু করলাম। হাতে অনেক জিনিস ছিল আমার। বাবা কাশির ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে লিখেছিলেন। শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছবার আগে ওষুধের দোকান থেকে তা কিনে নিয়েছিলাম। মা'র জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম হাজার মলম। মা'র পায়ে হাজা হয়েছিল। তারপর গামছা কিনেছিলাম একটা বাবার জন্যে। আরও অনেক খুচরো-খুচরো জিনিস কিনেছিলাম—যা যা বাবা কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

রাস্তা দিয়ে একলা-একলা হেঁটে চলেছি। চারদিকে নিশুতি অন্ধকার। রাতে গ্রামের লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ ভোর-ভোর উঠতে হয় সকলকে। বড় বড় গাছগুলোকে দূর থেকে অন্ধকারের পাহাড় বলে মনে হচ্ছে!

খানিকদূর গিয়েই পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গেল। অমাবস্যার রাত। আকাশে শুধু তারাগুলো জ্বলছে মাথার ওপর। মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া কানে আসছে। দু একটা কুকুর আমাকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল। কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে আবার চুপ করে গেল। তবু আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। কিন্তু কিসের সে ভয় বলতে পারব না।

একটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে কয়েকটা বড়-বড় বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে জায়গাটিকে ঢেকে রেখেছে। শনি-মঙ্গলবার ও-জায়গাটায় হাট বসে। হাট বেলাবেলি শেষ হয়ে গেছে। চারদিকে দুচারটে ছোট-খাট দোকান। তারাও দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন যে-যার বাড়ি চলে গেছে।

বহুদিন আগে ওই বটগাছের ডালে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সে ছোটবেলাকার ঘটনা। কিন্তু তখন থেকেই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালেই দিনের বেলাতেও কেমন গা-ছমছম করত। আর তখন তো রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

মনে পড়ল, বাবা-মা বোধহয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে রাত হয়ে গেল। তাঁরা ভাবছেন আমি আর আসব না। মা আমার জন্যে ভাত রান্না করে বসে ছিলেন।

বাবা বলছেন—আর কেন বসে আছ, খোকা আজকে বোধহয় এল না, তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো।

মাও বোধহয় তখন খেয়ে নিয়েছেন। তারপর আমার কথা ভাবতে-ভাবতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিযে পড়েছেন।

এই সব কথা ভাবতে-ভাবতেই হেঁটে চলেছি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। রাস্তাটা গিয়ে নলগাড়ির নাবালে গিয়ে মিশেছে। আগে এখানে একটা নদী ছিল। আগে যখন নদীতে জল ছিল তখন খেয়া নৌকোয় এপার-ওপার করতে হত। কিন্তু এখন নদীটা শুকিয়ে গিয়েছে। সেখানে ঢালু জমিতে এখন চাষ-বাস হয়। তারই একপাশ দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা হয়েছে। বর্ষার পর গরম পড়াতে রাস্তায় আবার ধুলো জমেছে। এখানকার লোক তাই ও-জায়গাটার নাম দিয়েছে, 'নলগাড়ির নাবাল'।

আমি ঢালু রাস্তায় নামতে লাগলাম। তারপর সামনের দিকে নজর পড়তেই যা দেখলাম তাতে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে এল।

দেখলাম ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা দাড়িওয়ালা মূর্তি ঢালু রাস্তা দিয়ে আমার দিকে নেমে আসছে। রাস্তায় তার পা নেই, শুধু হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমি আর এগোলাম না। এগোতে ভয় করল। ও কি তবে সেই লোকটার মূর্তি যে একদিন বটগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল? তখন কত লোকের মুখে শুনতে পেতুম যে, সে নাকি এই অঞ্চলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমি নিজের চোখে কখনও দেখিনি।

হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে মূর্তিটা কথা বলে উঠল। বলল, "কে ওখানে?"

আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু একটু থেমে বললাম, "আমি।"

"আমি কে?"

বলতে-বলতে মূর্তিটা আমার দিকে আরও এগিয়ে আসতে লাগল।

সামনে মুখের কাছে এসে বললে, "কে, কে তুমি?"

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি তখন। কিছুই জবাব দিতে পারলাম না সেই মুহূর্তে।

মূর্তিটা জিজ্ঞেস করলে, "ও, তুমি! বিমল! ধীরেশদার ছেলে?"

আমার তখন যেন জ্ঞান ফিরে এল। চিনতে পারলাম মূর্তিটাকে। আমার নসুকাকা।

বললাম, "নসুকাকা, আপনি?"

নসুকাকা বললেন, "হ্যাঁ, আমি। তা তোমার আসতে এত দেরি হল যে?"

বললাম, "দুপুরে দুটোর ট্রেনটা ধরতে পারিনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই সন্ধে ছটার ট্রেন ধরে আসছি।"

নসুকাকা বললেন, "তা আজকে এই অমাবস্যার রাতে না এলেই পারতে! এই রাত-বিরেতে কি আসা ভাল? আমাদের গাঁয়ে যে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল। তারপর কদিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—।"

বললাম, "তা আপনি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছেন?"

নসুকাকা বললেন, "জমিদারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর বড় ছেলের খুব অসুখ, আমাকে সেখানে গিয়ে শান্তি-সস্তেন্ করতে হবে। যত রাতই হোক আমাকে যেতেই হবে। তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা। তাই খেয়ে নিয়েই দৌড়চ্ছি। আমাকে যে ডাকতে এসেছিল তাকে বলেছি, তুমি এগিয়ে যাও, আমি খেয়ে উঠেই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে রাস্তায় কোনও লোকের দেখা হয়নি?"

আমি বললাম, "কই, না তো—"

নসুকাকা বললেন, "তা রাত্রির বেলা হয়তো ঠাহর হয়নি তোমার। তা তুমি বাবা একলা এত রাত্তিরে এসে ভাল করোনি। চলো, আমি তোমাকে গাঁ পর্যন্ত পৌঁছে দিই।"

বললাম, "আপনি আবার কেন এত কষ্ট করতে যাবেন। আর আপনারও তো তাড়াতাড়ি আছে।"

নসুকাকা বললেন, "সে কী কথা! এই এত রাতে তোমাকে কি এই অবস্থায় একলা ছেড়ে দিতে পারি? শুনলে ধীরেশদা যে আমার ওপর রাগ করবে। বলবে, তুমি খোকাকে ওই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে চলে গেলে?"

কী আর করা যাবে। ওদিকে জমিদারবাবুর বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের এখন-যায়-তখন-যায় অবস্থা, আর তিনি কিনা নিজে আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে চান?

রাস্তায় যেতে-যেতে নসুকাকা বলতে লাগলেন, "তুমি তিন সপ্তাহ বাড়ি আসনি, সেজন্যে ধীরেশদা খুব ভাবছিলেন। কলকাতায় থাক তুমি, তোমার বয়েস হয়েছে। তোমার যত পড়াশোনাই থাক, হপ্তায় একদিনের জন্যে বাবা-মাকে দেখতে আসতে পার না? তুমি যখন বড় হবে, আর নিজে বাবা হবে, তখন বুঝবে ছেলেকে দেখতে না পেলে বাপের মনে কী কষ্ট হয়।"

আমি নসুকাকার কথা শুনে কোনও-জবাব দিতে পারলাম না, চুপ করে নসুকাকার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। তারপর যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছি তখন নসুকাকা বললেন, "ওই দেখ, তোমাদের বাড়ি, এবার আর কোনও ভয় নেই, আমি চলি, আমার খুব তাড়া আছে।"

বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি আমাদের বাড়ির সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতে লাগলাম, "বাবা, বাবা, বাবা!"

বাবা আমার ডাক শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছেন। মা-ও জেগে উঠেছেন।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়ে আমাকে দেখে বললেন, "খোকা. তুমি এসে গেছ? কোন্ ট্রেনে এলে? দুপুরের ট্রেনে আসতে পারলে না?"

বললাম, "দুপুরবেলা পরীক্ষা দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই—"

বাবা বললেন, "তা বলে সন্ধের ট্রেনে আসতে হয়? জানো বাড়ি পৌঁছোতে রাত এগারোটা বেজে যাবে। তা ছাড়া গাঁয়ে পরশুদিন বাঘ বেরিয়েছিল, তা জানো? কদিন আগে বাবুদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল—"

আমি বললাম. "আমি তো তা জানতুম না। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল নসুকাকার সঙ্গে, তিনিই আমাকে নিজে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন।"

"নসু? নসুকাকা?"

বললাম, "হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে নলগাড়ির নাবালে দেখা হয়ে গেল। তিনি জমিদারবাবুদের বাড়ি যাচ্ছিলেন, তাদের বড় ছেলে মরো-মরো, তাই তিনি শান্তি-সস্তেন্ করতে সেখানে যাচ্ছিলেন।"

বাবা আমার দিকে হতবাকের মতো চেয়ে রইলেন।

মা-ও অবাক।

বাবা বললেন, "তুমি ঠিক দেখেছ? তোমার নসুকাকা? তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন? তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছ?"

আমি বললাম, "বা রে, আমি ভুল দেখব কেন? আমি নসুকাকাকে চিনতে পারব না?"

বাবা বললেন. "কিন্তু তোমার নসুকাকা যে পরশুদিন মারা গিয়েছেন, আমরা যে নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর সৎকার করে এলুম—" ❑

